# একক ১ ❑ অপরাধ ও বিচ্যুতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ অপরাধের সংজ্ঞা
১.৩.১ অপরাধের কারণ
১.৪ অপরাধজনিত আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
১.৪.১ ধ্রুপদী তত্ত্ব
১.৪.২ জৈবিক তত্ত্ব
১.৪.৩ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব
১.৪.৪. সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব
১.৫ ভদ্রলোকের অপরাধ
১.৬ কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা
১.৬.১ কিশোর অপরাধ ঃ ভারতবর্ষের ছবি
১.৬.২ কিশোর অপরাধের কারণ
১.৭ সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা
১৮. সারাংশ
১.৯ অনুশীলনী
১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

## ১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, তা হল—

- অপরাধ কেন সংঘটিত হয়?
- অপরাধমূলক আচরণের পেছনে কী কী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে?

- ভদ্রলোকের অপরাধ বলতে কী বোঝায়?
- কিশোর অপরাধ কাকে বলে?
- কোন কোন কারণের জন্যে কিশোর অপরাধ ঘটে?
- অপরাধজনিত সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়?

## ১.২ প্রস্তাবনা

প্রতিটি সভ্য সমাজেই 'সামাজিক সমস্যার' অস্তিত্ব হয়োত একটি আবশ্যিক দিক। সমস্যার মাত্রা-ভেদে তা কম বেশি হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর উন্নত বা অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশে আমরা এমন কোন সমাজের কথা ভাবতে পারি না যেখানে 'সামাজিক সমস্যা' নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ কাকে বলব সামাজিক সমস্যা? বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। সেইসব সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায়—সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হয় এমন পরিস্থিতিতে, যা মানুষের অভিপ্রেত বা কাঙিক্ষত নয় এবং এই পরিস্থিতি ''Social ideal'' বা সামাজিক আদর্শ থেকে অবশ্যই এক ধরনের deviation বা বিচ্যুতি।

দারিদ্র্য, শিশু অপব্যবহার, অপরাধ প্রবণতা ও বিচ্যুতি, মাদক ও উত্তেজক ওযুদপত্র গ্রহণে আসক্তি, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা—এমন নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে আমরা অতিমাত্রায় পরিচিত। এছাড়াও আমাদের সমাজে রয়েছে পরিবেশের সমস্যা, বয়স্ক মানুষের সমস্যা, এবং অবশ্যই মহিলাদের সমস্যা। মহিলাদের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক হিংসাত্মক আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে নানা ঘটনায়—তা আমরা জানতে পারছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। গণমাধ্যমের অন্যান্য দিকগুলিও সম্প্রতিকালের সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে যথেষ্ট সোচ্চার। সমাজের নানা স্তরে বিদ্যমান এইসব নানামাত্রিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষকে যেমন পীড়িত করেছে, তার থেকে বেশি এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকদের। তারা তাই অন্বেষণ করেছেন এইসব সমস্যার উৎসগুলির, জানতে চাইছেন সমস্যাগুলির প্রকৃতি এবং অবশ্যই অনুসন্ধান করছেন সমস্যাগুলি নিরসনের উপায় কিংবা সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের পুনর্বাসনের পদ্ধতি। ফলে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় 'সামাজিক সমস্যা' বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমরা তিনটি সামাজিক সমস্যার বিষয়ে জানব, যেমন—অপরাধ ও বিচ্যুতি, শিশু অপব্যবহার এবং যুব সমস্যা। আলোচ্য পর্যায়ে স্বতন্ত্র তিনটি পর্যায়ে এই তিনটি সমস্যা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

## ১.৩ অপরাধের সংজ্ঞা

'অপরাধ' এই শব্দের মধ্যে এমন একটি দ্যোতনা আছে, যা দিয়ে বোঝা যায় আইনবিরুদ্ধ কিংবা অ-সামাজিক কাজকর্মকে। কেউ কেউ আবার 'অপরাধ' বলতে সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকে বোঝেন। তবে যে কোন ধরনের বিচ্যুতি, কিন্তু, অপরাধমূলক কাজ নয়। তাহলে 'অপরাধ'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? এই বিষয়ে হল জেরোমের (Hall Jerome; 1947) বক্তব্য শোনা যেতে পারে। জেরোম বলেছেন অপরাধ হচ্ছে ''legally forbidden, and intentional action, which has a harmful impact on social interests, which has a criminal intent, and which has legally prescribed punishment for

it.'' অর্থাৎ অপরাধ হচ্ছে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক স্বার্থকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া, অপরাধের পেছনে কার্যকরী উদ্দেশ্যটিও অপরাধমূলক এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আইন—নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা আছে। থর্সস্টেন সেলিন (Thorsten Sellin; 1970) অপরাধকে বলেছেন ''violation of conduct norms of the normative groups'', অর্থাৎ 'আদর্শনিষ্ঠ গোষ্ঠীর আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতি'। তারও আগে Mowrer (1959) অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোন জটিলতার অবতারণা না করে সরাসরি একে বলেছেন ''Crime is an anti-social act'' অর্থাৎ অপরাধ হচ্ছে একটি অ-সামাজিক কাজ।

### ১.৩.১ অপরাধের কারণ

অপরাধ কেন ঘটে? কেন মানুষ এমন আচরণ করে যা দেশের, সমাজের প্রচলিত আইনকে লঙঘন করে?—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, মানুষের, বিশেষ করে কিছু মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অপরাধ প্রবণতা—এরই প্রতিফলন ঘটে নানা ধরনের কাজে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা যখন অপরাধ ও বিচ্যুতির তত্ত্বগুলিকে জানব, তখন হয়তো মনস্তাত্ত্বিকদের মতের সমর্থন খুঁজে পাব। এছাড়াও, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, কর্মহীনতা কিংবা অতিমাত্রায় লোভ, বিলাসবহুল সুখী জীবন যাপনের আকাঙক্ষা থেকেও মানুষ অপরাধের পথে পা বাড়ায়। অপরাধ বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে অপরাধের নানা কারণ খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে থাকে ব্যক্তিগত কারণ ও সামাজিক কারণ। সাধারণত আমাদের সমাজে তিন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়—হিংস্র বা চরম অপরাধ (Violent Crimes), অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধ (Property Crimes) এবং ভদ্রলোকের অপরাধ (White-collar Crime)। ভদ্রলোকের অপরাধ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে, এছাড়া অপর দুটি ধরনের অপরাধের মধ্যে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ (হিংস্র বা চরম অপরাধ), চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি (অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ)। প্রতি বছরে প্রায় ২১/২২ লক্ষ অপরাধের ঘটনার অনুসন্ধানের দায়িত্ব হাতে নেয় পুলিশ, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ অপরাধ নথিভুক্ত হয় Indian Penal Code (IPC) বা ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে আর বাকি ৭০ শতাংশ স্থানীয় ও বিশেষ বিধির অধীনে (under the local and special laws)। অপরাধের পরিসংখ্যান বিষয়ে Indian Penal code-এর বিন্যাসে জানা যায় যে গত শতকের নয়ের দশকে হিংস্র অপরাধ ঘটেছিল ১৪.৪ শতাংশ, অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ২৬ শতাংশ, ভদ্রলোকের অপরাধের সংখ্যা ৩.১ শতাংশ এবং uncategorized বা অ-শ্রেণীভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫৬.৫ শতাংশ। আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচীতে কত ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়, এ সম্পর্কে যদিও কোন আলোচনার অবকাশ নেই—তবুও অপরাধের শ্রেণীবিভাজন বিষয়ে জানা দরকার এই জন্যে যে এর মাধ্যমে নানা ধরনের অপরাধের পেছনে সক্রিয় কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, নিউ দিল্লি (National Crime Records Bureau, New Delhi) গত শতকের নব্বইয়ের দশকে যে তথ্য প্রকাশ করে তাতে দেখা যাচ্ছে হিংস্র অপরাধের তুলনায় অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ ঘটেছে বেশি অর্থাৎ হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির তুলনায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-জনিত অপরাধের ঘটনা বেশি ঘটেছে। ১৯৬৬ সালে বেকার (Becker) প্রদত্ত পরিসংখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকায় ৭৭ শতাংশ অর্থনৈতিক অপরাধ ঘটেছে ও ২৩ শতাংশ অপরাধ ঘটেছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। NCRB (জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো) জানিয়েছে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। প্রতিটি ১০০ জন অপরাধীর মধ্যে যেখানে ৯৬ জন পুরুষ অপরাধী, সেখানে মহিলা অপরাধীর সংখ্যা মাত্র ৪ জন (১৯৯৪ সালে)। বিভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে

অপরাধের হার বেশি, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অপরাধের প্রবণতা আছে—তবে তা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় কম। তাছাড়া, ১৮-৩০ এই বয়ঃসীমার মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫১ শতাংশ); ৩০-৩৫ বয়ঃসীমার মধ্যে পড়ছে ৪১ শতাংশ অপরাধী, ৫০+ বয়সী মানুষের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ আর মাত্র ১ শতাংশ অপরাধী রয়েছে ১৬-১৮ এই বয়ঃসীমায়। ভারতবর্ষে সংঘটিত অপরাধের এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে দারিদ্র্য, লোভ, ধনী হবার আকাঙ্ক্ষার কারণে বেশিরভাগ মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে; তাই গৃহ-ডাকাতি বা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি ধরনের অপরাধ ঘটে। হত্যা বা খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ক্রোধ বা হিংসা, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে। অবশ্য অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণের জন্যেই হত্যার মতো নৃশংস অপরাধ ঘটে। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো অপরাধ আমাদের সমাজে নারীর নিষ্ক্রিয় সামাজিক অবস্থানের ছবিটিকেই স্পষ্ট করে তোলা। অপহরণের ঘটনাও ঘটে সাধারণত অর্থের লোভের জন্যেই; কারণ গত কয়েক দশক ধরে অপহরণের যেসব ঘটনা ঘটেছে আমাদের সমাজে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অপহৃত ব্যক্তির জীবনের বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।

নারীর তুলনায় পুরুষদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি, এর কারণ হিসাবে বলা যায় নারী সমাজ-অনুমোদিত আচরণ-বিধিকে হয়তো লঙ্ঘন করতে দ্বিধাগ্রস্ত। পুরুষরা আচরণ-বিধি থেকে বিচ্যুত হবার ব্যাপারে অনেক বেশি সাহসী। এছাড়া নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার (১৮-৩০ কিংবা ৩০-৩৫) মানুষের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা বেশি থাকার কারণ তারুণ্য থেকে যুবক অবস্থায় মানুষ অনেক বেশি সক্রিয় থাকে, তাই সামাজিক আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে 'অপরাধে'র মতো আইন-লঙ্ঘনকারী কাজে লিপ্ত হয়। এরপর আমরা অপরাধ সংঘটিত হবার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে—তার ওপর আলোকপাত করব।

## ১.৪ অপরাধজনিত আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, প্রতিটি সমাজেই অপরাধ ও বিচ্যুতি ঘটে থাকে। 'অপরাধ' ও 'বিচ্যুতি' এই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত তেমন ফারাক নেই। 'অপরাধ' হল আইন লঙ্ঘনকারী কাজ আর 'বিচ্যুতি' হল সমাজ অনুমোদিত আদর্শ আচরণবিধি (Norms)-কে অনুসরণ না করা (Non-conformity)। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা 'অপরাধ' কথাটিই ব্যবহার করব। উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে 'অপরাধ' একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। কেন সংঘটিত হয় অপরাধ?—এর কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ, অপরাধবিজ্ঞানী থেকে সমাজতত্ত্ববিদেরা। এই কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস থেকেই এরা যেসব তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন, সেগুলিকে আমরা চারটি ভাগে বিভাজিত করতে পারি ঃ

(১) ধ্রুপদী তত্ত্ব (Classicist theory)

(২) জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব (Biological view)

(৩) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological view) এবং

(৪) সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological theory)

### ১.৪.১ ধ্রুপদী তত্ত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপরাধ সংক্রান্ত ধ্রুপদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

অপরাধীর বিচার ও শাস্তির নামে যে নির্মম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাজনৈতিক সংস্কারকগণ ও জ্ঞানদীপ্ত (enlightened) চিন্তাবিদ্‌রা। এই সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্‌দের ভাবনার প্রতিক্রিয়া রূপেই অপরাধ বিষয়ক ধ্রুপদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ধ্রুপদী তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন বেকারিয়া (Beccaria, 1764) নামে একজন ইতালীয়। তিনি প্রভাবিত ছিলেন জন হাওয়ার্ড (John Howard) এবং বেন্থাম (Bentham)—এর মতো পণ্ডিতদের রচনা দ্বারা। বেকারিয়া তাঁর ''ধ্রুপদী তত্ত্বে'' যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছিলেন, তা হল—(১) মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত হয় আত্ম-স্বার্থ ও যুক্তির মাধ্যমে, (২) সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক চুক্তি এবং ঐক্যমত্য, (৩) অপরাধ বলতে সমাজ অনুমোদিত আদর্শ আচরণকে বোঝায় না; অপরাধ হচ্ছে আইনী বিধি (legal code) লঙঘন করা; (৪) ব্যক্তির যুক্তিসংগত প্রেষণার (motivation) কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় এবং পরিশেষে (৫) দোষী বা অপরাধীর শাস্তিদানের ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রণে'র নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা দেখা উচিত।

## ১.৪.২ জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব

জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যার নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তিনি হলেন ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানী সিসারে লমব্রসো (Cesare Lombroso)। পেশায় চিকিৎসক এবং অপরাধ-নৃতত্ত্ববিদ্যার (Criminal Anthropology) অধ্যাপক লমব্রসোকে বলা হয় 'অপরাধবিজ্ঞানের জনক'। তিনি ১৮৭৬ সালে 'Theory of Born Criminals' বা ''Theory of Physical Criminal Type'' নামে একটি তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি দাবি করেন যে অপরাধী ও অপরাধী নয় এমন দুজন মানুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অপরাধীর চেহারায় কিছু বিকৃতি থাকবে; যেমন অস্বাভাবিক বড় কান, লম্বা বাহু, চ্যাপ্টা নাক, খুঁতযুক্ত চোখ, ব্যথা ও কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীনতা এরকম ধরনের কতগুলি বিকৃতি।

পরবর্তীকালে চার্লস গোরিং (Charles Goring; 1913)—যিনি ছিলেন ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ্ তথা দার্শনিক—লমব্রসোর ''Theory of Born Criminals'' (জন্মগত ভাবে অপরাধীর তত্ত্ব)-কে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, কোন অপরাধীর শরীরে এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না যা দিয়ে তাকে 'অপরাধী' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। গোরিং অপরাধ-প্রবণতার কারণ হিসাবে বংশগতির (heredity) প্রভাবের কথা বলেন। আর দুজন অপরাধবিজ্ঞানী ফেরি এবং গ্যারোফেলো (Ferri and Garofalo) লমব্রসোর তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে তাঁরা এই তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে সামান্য সংশোধন করে বলেন যে সব অপরাধীই কিন্তু 'জন্মসূত্রে অপরাধী' নয়।

অপরাধের জীববিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নতুন মাত্রা পেল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ''Physical Anthropologist'' (শারীর নৃতত্ত্ববিদ) হুটন-কৃত (Hooton) গবেষণায়। ১৯৩৯ সালে তাঁর সুদীর্ঘ বার বছর ব্যাপী গবেষণার ভিত্তিতে হুটন (Hooton) বলেন যে, অপরাধের প্রাথমিক কারণ হল 'biological inferiority' বা 'জৈবিক হীনম্মন্যতা'। এই জৈবিক হীনম্মন্যতা হচ্ছে বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য।

১৯৪০ সালে (Sheldon) শেলডন অপরাধ প্রবণতার এক নতুন জৈবিক ব্যাখ্যা দেন। মানুষের শরীরের গঠন অনুসারে তিনি ব্যক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাজিত করেন, যেমন—Endomorphic, Ectomorphic এবং Mesomorphic। এই বিভাজনের ভিত্তিতে তিনি অনুমান করেন যে মানুষের শারীরিক গঠন ও অপরাধ প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং অপরাধী ব্যক্তি নিরাপরাধ ব্যক্তির তুলনায় তার শারীরিক গঠনের দিক থেকে অনেক বেশি

''mesomorphic''। বলা বাহুল্য, (Sheldon) শেলডন-এর বই ব্যাখ্যা একেবারেই সমর্থন লাভ করেনি, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানীদের; কারণ তাঁদের মতে, অপরাধ হচ্ছে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। অপরাধপ্রবণ আচরণ কখনোই জৈবিকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত থাকতে পারে না।

### ১.৪.৩ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

অপরাধ-প্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে দোষী বা অপরাধী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকাই সংগত। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে তিন ধরনের তত্ত্ব দেখা যায়—সাইকোজেনিক (মন-সংক্রান্ত), সাইকোলজিক্যাল (মনস্তাত্ত্বিক) এবং সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল (মনসংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী)। সাইকোজেনিক (Psychogenic) তত্ত্বে জোর দেওয়া হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান কোন ত্রুটির ওপর যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সাইকোলজিক্যাল (Psychological) তত্ত্বে বলা হয় অপরাধীর মানসিক দুর্বলতা বা কম বুদ্ধ্যঙ্ক-এর অধিকারী হওয়ার কথা (Low Intelligence Quotient or IQ) আর সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল (Psycho-analytical) তত্ত্বে অপরাধ-প্রবণতার কারণ হিসাবে দায়ী করা হয় অ-বিকশিত 'ইগো' (undeveloped ego) কে। এখানে উল্লেখ্য, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে এই তৃতীয়টি অর্থাৎ সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল নামক তত্ত্বটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই জনপ্রিয়তার জন্যে যাঁর অবদান স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud), ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফ্রয়েড তাঁর এই তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এ কথা ঠিক ফ্রয়েড সম্পূর্ণভাবে কোন 'অপরাধ-তত্ত্ব' নির্মাণ করেননি, কিন্তু মন-বিশ্লেষণের আলোচনায় ইড্, ইগো ও সুপার-ইগোর (Id, Ego and Super-ego) ধারণার উপস্থাপন করে ফ্রয়েড স্বতন্ত্র একটি ব্যাখ্যা দেন, যা মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্দেশে সক্ষম হয়েছিল। (Id) ইড্ হচ্ছে মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা আকাঙক্ষা, (Ego) ইগো হচ্ছে বাস্তব আর সুপার-ইগো (Super-ego) হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিক বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েডের মতে, সুপার-ইগো সবসময়েই মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা 'Id' কে দমন করতে চায়; আর ইগো (ego) ইড্ (Id) (Super-ego) মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে চায়। ইড ও সুপার-ইগো হচ্ছে মূলত ব্যক্তিত্বের অ-সচেতন অংশ আর ইগো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সচেতন (Conscious) অংশ। তাই অপরাধ হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দিকে অ-সচেতন বা unconscious অংশের প্রতিফলন। এছাড়া মানুষের মধ্যে যে মূল প্রবৃত্তিগুলি (drives) আছে তার দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতেও অপরাধ-প্রবণতা প্রকাশ পায় ও অপরাধ ঘটে। ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যা যাঁদের প্রভাবিত করেছিল, তাঁরা হলেন অ্যাডলার (Adler), এ্যাব্রাহামসেন (D. Abrahamsen), ফ্রায়েডল্যান্ডলার (Friedlander) প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, শুধু ডেভিড এ্যাব্রাহামসেনের (David Abrahamsen: 1952) ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার, এই জন্যে যে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অপরাধ প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ্যাব্রাহামসেন একটি ফর্মুলা (formula) গড়ে তোলেন; $C = \frac{T+S}{R}$। এখানে 'C' হলো অপরাধ, 'T' হচ্ছে 'প্রবণতা' 'S' নির্দেশ করছে 'পরিস্থিতি' এবং 'R' হলো 'প্রতিরোধ'। সুতরাং

$$\text{অপরাধ} = \frac{\text{প্রবণতা} + \text{পরিস্থিতি}}{\text{প্রতিরোধ}}$$

এ্যাব্রাহামসেনের মতে ব্যক্তির যখন দৃঢ় অপরাধ প্রবণতা থাকে, পরিস্থিতিও তার অনুকূলে থাকে এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা যদি দুর্বল হয়, তাহলে'অপরাধ' ঘটবেই। বলা বাহুল্য, সমাজতাত্ত্বিকেরা ফ্রয়েডের বা এ্যাব্রাহামসেনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি, তাই অপরাধ-প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঁরা এইসব তত্ত্ব গ্রহণ করেননি।

## ১.৪.৪ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি যখন সমাজে সংঘটিত অপরাধের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারল না তখন সমাজতাত্ত্বিকেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন। অবশ্য, জৈবিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উদ্ভবের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তবে অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমাজতত্ত্বেই, কারণ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্যে অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক কারণ (বিভিন্ন সমীক্ষায় যা দেখা গেছে) দায়ী থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক কারণগুলিই সক্রিয় থাকে। অপরাধ সম্পর্কে সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল যে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক অনুসরণ (Conformity) এবং বিচ্যুতির মধ্যেকার সম্পর্ক। এখানে উল্লেখ্য যে আধুনিক সমাজেও ভিন্ন ভিন্ন উপসংস্কৃতি (Subculture) আছে এবং কোন এক উপসংস্কৃতির নিয়ম-বিধি অন্য উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি (deviance) বলে গণ্য হতে পারে।

(ক) অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় এডউইন এইচ সাদারল্যান্ড (Edwin H. Sutherland) প্রণীত 'Differential Association Theory' বা 'পার্থক্যমূলক সংঘ বিষয়ক তত্ত্বের' (১৯৩৯) কথা। এই তত্ত্বের মধ্যে তিনি দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন—(১) পরিস্থিতি বা পরিবেশগত (Situational) এবং (২) বংশগত (genetic)। সাদারল্যান্ডের ধারণাটি অনেকটাই স্বচ্ছ। প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন কোন পরিবেশ মানুষকে অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রতি আকর্ষণ করে এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী অপরাধীর জীবনের অভিজ্ঞতা বা বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই অপরাধ-প্রবণতার উৎস লুকিয়ে থাকে। অপরাধমূলক আচরণ বিশ্লেষণ করার সময় সাদারল্যান্ড নিজে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন।

সাদারল্যান্ডের মতে, সারা জীবন ধরে মানুষ নানা ধরনের সামাজিক প্রভাবের মধ্যে দিয়ে চলে এবং এমন অনেক মানুষের সাহচর্যে আসে—যারা অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে মানুষের শেষ পর্যন্ত অপরাধ-প্রবণতা জন্ম নিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে সাদারল্যান্ড বলেছেন ''পার্থক্যমূলক সংঘ''। তাঁর ধারণায়, অপরাধমূলক আচরণ অনেকাংশেই হল প্রাথমিক গোষ্ঠী অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শেখা। এই শেখার মধ্যে থাকে অপরাধ সংঘটিত করার পদ্ধতি ও কৌশল। অনুকূল বা প্রতিকূল আইনি-বিধির সংজ্ঞা থেকে মানুষ তার উদ্দেশ্য, তার আচরণ বা যৌক্তিকতার নির্দিষ্ট গতি সম্পর্কে জানতে পারে। আইন-লঙঘন করার যে সংজ্ঞা তার পছন্দ হয় তার ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি অপরাধী বা দুষ্ক্রিয় হয়ে যায়। একেই সাদারল্যান্ড বলেছেন ''differential association'' বা পার্থক্যমূলক সংঘ। এই তত্ত্ব অন্যান্য মানুষের সঙ্গে অপরাধীর মানসিক প্রভেদকে নির্দেশ করে, এবং আইন মেনে চলা মানুষের মতো অপরাধীদেরও একই ধরনের চাহিদা ও মূল্যবোধের কথা বলে।

সাদারল্যান্ডের এই তত্ত্বকে সামান্য পরিমার্জনা করেন অপর একজন তাত্ত্বিক, তাঁর নাম ড্যানিয়েল গ্লেসার (Daniel Glaser; 1956)। গ্লেসার সাদারল্যান্ডের ''Differential Association'' বা 'পার্থক্যমূলক সংঘ' নামক তত্ত্বকে পরিবর্তন করে তার নাম দেন ''Differential Identification Theory'' (পার্থক্যমূলক পরিচিতি তত্ত্ব)। গ্লেসারের মতে, সাদারল্যান্ডের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ছিল। অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে গেলেই কোন মানুষ যে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। গ্লেসার (Glaser) তাঁর নতুন তত্ত্বে বললেন, কোন মানুষ অন্য মানুষের অপরাধমূলক আচরণকে ততক্ষণ পর্যন্তই অনুসরণ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ বাস্তব বা কাল্পনিক মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারবে। এই মানুষটির দিক থেকেও প্রথম মানুষটির অপরাধ-প্রবণ কাজকর্মকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে।

(খ) অপরাধের জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজতত্ত্ববিদ্ রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) ''আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউ'' (American Sociological Review) নামক পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত একটি আলোচনা পত্রে অপরাধমূলক আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। মার্টন তাঁর তত্ত্বকে আরও সংশোধন ও বিস্তৃত করে Anomic বা বিধিশূন্যতার তত্ত্ব নামে অপরাধ ও বিচ্যুতির একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এখানে উল্লেখ্য anomic বা বিধিশূন্যতার ধারণাটি কিন্তু মার্টনের উদ্ভাবন নয়, এই ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ এমিল দ্যুরখাইম (Emile Durkheim)। দ্যুরখাইম তাঁর বিখ্যাত ''suicide'' এর তত্ত্বে বিধিশূন্যতার কথা বলেন। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে আচরণকে পরিচালনা করতে যদি সুস্পষ্ট কোন মানদণ্ড না থাকে, তাহলে anomic বা বিধিশূন্যতা বিরাজ করে। এরকম অবস্থায় জনগণ দিশাহারা হয়ে পড়ে। ফলে বিধিশূন্যতা হল এমন একটি সামাজিক অবস্থা যা মানুষকে আত্মহননে প্রবৃত্ত করে। মার্টনের মতে, যখন গৃহীত নিয়মনীতির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন ব্যক্তির আচরণে হৃদয়হীনতা সৃষ্টি হয় এবং তার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে অপরাধ-প্রবণ করে তোলে। প্রতিটি সমাজে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত সমাজে মানুষের বস্তুগত সাফল্যের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সাফল্য অর্জন করার জন্যে সমাজ-অনুমোদিত আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছক প্রতিটি সমাজের আদর্শ-কাঠামো এমনটাই চায়। কিন্তু সমস্যা হল, এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সমাজ-অনুমোদিত উপায় বা সুযোগ-সুবিধা সকলের কাছে সমানভাবে সুলভ নয়। এই অবস্থায় লক্ষ্য (goal) ও উপায়ের (means) প্রাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন তা ব্যক্তির মনের ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি করে এবং বিধিশূন্যতা বা Anomic সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যক্তি যে কোন উপায়ে বা অ-বিধিসম্মতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। মার্টনের মতে, এই সময় মানুষ অপরাধ বা বিচ্যুতির পথ বেছে নেয়। তাই বিচ্যুতি বা অপরাধকে সমাজে বিদম্যান অসাম্য বা inequality-র ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে।

মার্টন (১৯৬৮) সমাজ-অনুমোদিত লক্ষ্য, এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার সীমাবদ্ধ উপায়ের ফলে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তার পাঁচটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন অনুসরণ (Conformity), উদ্ভাবন (innovation), রীতিসিদ্ধতা (ritualism), পশ্চাদপসরণ (retreatism) এবং বিদ্রোহ (rebellion)।

(গ) মার্টনের পর অপর দুজন সমাজবিজ্ঞানী এ. ক্লোয়ার্ড এবং লয়েড ই. ওহলিন (A. Cloward and Lyod E. Ohlin) অপরাধমূলক আচরণের একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এই তত্ত্বকে বলা হয় ''পার্থক্যমূলক সুযোগ''-এর তত্ত্ব (Theory of Differential Opportunity ; 1960)। প্রকৃতপক্ষে, এই তত্ত্ব হচ্ছে সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্বের সমন্বিত রূপ। ক্লোয়ার্ড এবং ওহলিন সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বৈধ ও অবৈধ উপায়ের পার্থক্যের কথা তাঁর তত্ত্বে বলেন। ১৯৬০ সালে অপরাধপ্রবণ শিশু নিয়ে তিনি যে সমীক্ষা-নির্ভর গবেষণা চালান, তাতে এঁরা দেখেন যে দুর্বৃত্ত বা অপরাধীরা গড়ে ওঠে মূলত সমাজের উপসংস্কৃতি (sub-culture) থেকে। বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে যেখানে মানুষের সাফল্য লাভের সুযোগ কম, সেখানে কিছু মানুষ বৈধভাবে লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, আবার কিছু মানুষ অবৈধ উপায় অবলম্বন করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে চান। তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে ক্লোয়ার্ড ও ওহলিন তিন ধরনের বিচ্যুতিমূলক উপসংস্কৃতিকে (delinquent subculture) চিহ্নিত করেছেন, যেমন—criminal (অপরাধী), Conflictory (সংঘাতকারী) এবং Retreatist (পশ্চাদপসরণকারী)।

(ঘ) অপরাধ সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল বেকারের (Becker : 1963). 'Labelling Theory' বা 'চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব'। বেকারের আগে এডউইন লেমেন্ট (Edwin Lement : 1951)

ও এরিসন (Erikson : 1962) 'সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিভঙ্গী'' বা ''Social Interaction Approach'-র মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে বেকারের তত্ত্ব কখনোই এই প্রশ্ন উত্থাপন করে না কেন একজন মানুষ অপরাধী হল? বরং কেন সমাজ একজন মানুষকে অপরাধী বা দুষ্ক্রিয় বলে চিহ্নিত করছে— চিহ্নিতকরণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সেটাই। বেকার তার তত্ত্বের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কাজ বা দুষ্ক্রিয়তা ততটা বিবেচ্য বিষয় নয়; তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সামাজিক অনুমোদন (Sanction) ও নিয়ম-নীতির নিরিখে এই বিষয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়া। সমাজতত্ত্বে ''চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব'' বা 'Labelling theory' একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে, যদিও এই তত্ত্ব এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতার জন্যে বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

## ১.৫ ভদ্রলোকের অপরাধ (White-Collar Crime)

আগের অনুচ্ছেদেই আমরা জেনেছি আমাদের সমাজে সাধারণত তিন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়; যেমন হিংস্র বা চরম অপরাধ (Violent Crime), অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধ (Property Crime) এবং ভদ্রলোকের অপরাধ বা বাবু-অপরাধ (White-Collar Crime)। অপরাধের শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে তৃতীয় বা শেষ ধরনের অপরাধকে ''ভদ্রলোকের অপরাধ'' বলে নির্দিষ্ট করা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে 'White-Collar Crime' এই শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এডউইন এইচ. সাদারল্যান্ড (Edwin H. Sutherland) ১৯৪৫ সালে। বাংলাভাষায় অপরাধের এই ধরনটিকে আমরা 'বাবু-অপরাধ' বা 'ভদ্রলোকের অপরাধ' বলে অভিহিত করি। সাদারল্যান্ড 'White-Collar Crime' বলতে বড় বড় বাণিজ্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অসত্য বিজ্ঞাপন, কপিরাইট লঙ্ঘন করা, অসাধু প্রতিযোগিতা, প্রতারণা, অন্যায়ভাবে কাজ করানো এবং অবশ্যই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া। সাদারল্যান্ড-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ভদ্রলোকদের অপরাধ' আমরা আমাদের সমাজেও প্রায়ই দেখতে পাই। তবে তার মধ্যে শুধু বৃহৎ বাণিজ্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরাই ''ভদ্রলোক অপরাধী'' বলে চিহ্নিত হন না। প্রতারণা, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ঘুষ নেওয়া, অবৈধ উপায়ে নিজের সম্পত্তি বাড়ানো এই সমস্ত কাজে যারা লিপ্ত থাকেন, তারা আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। শিল্প-সংস্কৃতি-খেলাধূলা ও বিশেষভাবে রাজনৈতিক জগতের অনেক মানুষকে 'ভদ্রলোকের অপরাধ' নামক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকতে দেখা যায় ও সংবাদপত্রের পাতায় এদের নাম আমাদের চোখেও পড়ে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এই 'বাবু' বা 'ভদ্রলোকের অপরাধ' কি অন্য অপরাধের মতো একই শ্রেণীভুক্ত? এর উত্তরে বলা যায়, অনেকে মনে করেন এই অপরাধ সাধারণ অপরাধের সমগোত্রীয় নয়। তবে আইন লঙ্ঘনকারী যে কোন কাজই হচ্ছে অপরাধ। তবে সাধারণ অপরাধ ও ভদ্রলোকের অপরাধের মধ্যে তিনটি পার্থক্য অবশ্যই নির্দেশ করা যায় ঃ

(১) সাধারণত ভদ্রলোকের অপরাধ সংঘটিত হলে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ-হানি না ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়;

(২) ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি চরম বা হিংস্র অপরাধের (Violent Crime) প্রকৃতি থেকে ভদ্রলোকের অপরাধের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; এবং

(৩) চরম বা অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধের মতো ভদ্রলোকের অপরাধের প্রভাব সমাজস্থ ব্যক্তিদের ওপর তেমন প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

## ১.৬ কিশোর অপরাধ (Juvenile Delinquency)

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'কিশোর অপরাধ' বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে কিশোর অপরাধ ও তজ্জনিত সমস্যা অতীতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিগত শতকের কয়েক দশক ধরে সংঘটিত কিশোর অপরাধের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে দারিদ্র্য, অভাব বা মনস্তাত্ত্বিক কারণের ফলেই কিশোররা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে না। অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াও এইসব কিশোর অপরাধের ঘটনা ঘটছে তাই, আধুনিক সমাজে সমাজতাত্ত্বিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। কেন ঘটছে কিশোর অপরাধ এবং এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই বা কী—এই বিষয়ে আলোচনা প্রবেশ করার আগে আমাদের জানা দরকার 'কিশোর অপরাধ' কাকে বলে?

সাধারণত, পরিণতবয়স্ক নয় এবং যাদের বয়সসীমা ৭ থেকে ১৬ কিংবা ১৮-এর মধ্যে, তারা যখন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তাদেরকেই 'কিশোর অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই বিষয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। ১৯৮৬ সালের "Juvenile Justice Act" অনুসারে বলা হয় কিশোর অপরাধীর বয়স হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। কিন্তু এর আগে "Children Act" অনুযায়ী এই বয়সসীমার অনুপাত সব রাজ্যে সমান ছিল না। যেমন উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে কিশোর-অপরাধীর বয়স-সীমা ছিল ১৬ বছর এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ছিল ১৮ বছর। কর্ণাটক, অসম ও রাজস্থানে ছেলে অপরাধীর বয়স সীমা ছিল ১৬ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। অবশ্য অপরাধের প্রকৃতি ছিল একই রকম।

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে Juvenile delinquency বা কিশোর অপরাধ হল এক প্রকার বিচ্যুতিমূলক আচরণ, যা সমাজব্যবস্থার সর্বজনীন বৈধ ও প্রত্যাশিত আচরণের বিরোধী। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার কিশোররা যখন এমন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যা সমাজ-অনুমোদিত আদর্শ-আচরণকে লঙঘন করে, তখন আমরা তাকে 'কিশোর অপরাধ' বলে অভিহিত করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, এগুলি হল কিশোর অপরাধ।

### ১.৬.১ কিশোর অপরাধ ঃ ভারতবর্ষের ছবি

আজকের ভারতীয় সমাজে কিশোর অপরাধ অন্যান্য সামাজিক অপরাধের তুলনায় ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করছে। নব্বই দশকে সমীক্ষিত "ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া"র (Crime in India) রিপোর্টে প্রকাশ ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code) আওতায় কিশোর অপরাধের যেসব ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, তার বেশির ভাগ ঘটেছে অর্থনৈতিক কারণে, যেমন—চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এই একই ধরনের অপরাধের সংখ্যা বয়স্ক দুষ্কৃতী-কৃত অপরাধের তুলনায় কিশোর অপরাধীর মধ্যে বেশি মাত্রায় ঘটেছে। সংখ্যাগত হিসেবে তা ৯.৭ শতাংশ বেশি। ঐ একই দশকের সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক কারণ জনিত কিশোর অপরাধ ছাড়াও ৭.৪ শতাংশ কিশোরকে দাঙ্গা বাধানোর কারণে, ৩.৪ শতাংশকে খুনের জন্যে, ২.১ শতাংশকে ধর্ষণের কারণে এবং ২ শতাংশকে অপহরণের দায়ে 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আশির দশকে কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে কিশোরীদের তুলনায় কিশোরদের সংখ্যা বেশি ছিল। কিশোর-অপরাধীর বয়সগত সীমারেখার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হওয়ার পর নব্বই দশকে কিশোরী অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

'Crime in India'-র ১৯৯৪ সালে প্রদত্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধি কালের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১২-১৪ বছরের মধ্যে কিশোর অপরাধের হার বেশি।

দ্বিতীয়ত, কিশোর অপরাধ প্রধানত একটি নগর-কেন্দ্রিক ঘটনা। তাই গ্রামের তুলনায়, এমনকি ছোট শহরগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে কিশোর অপরাধের ঘটনা বেশি ঘটে, যেমন—দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পুনে, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শহরে।

তৃতীয়ত, পরিবার-বিচ্ছিন্ন কিশোরদের তুলনায় পরিবারে পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাসকারী কিশোরদের মধ্যে, দেখা গেছে, অপরাধ প্রবণতা বেশি।

চতুর্থ, 'Crime in India'-র রিপোর্টে আরও দেখা গেছে অশিক্ষিত কিশোরদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। যেমন—২৯.৬ শতাংশ কিশোর একেবারে নিরক্ষর, ৪৩.৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, ২১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং মাত্র ৫.৫ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করেছে।

পঞ্চমত, ভারতবর্ষে কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খারাপ অবস্থা।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-দুষ্কৃতীর (gang delinquents) সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু আমেরিকায় এই ধরনের কিশোর অপরাধের হার, তুলনায়, অনেক বেশি। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—আমাদের দেশেও কিশোর অপরাধের ঘটনার পেছনে অনেক বড় বড় চক্রের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকে।

## ১.৬.২ কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে, নানা গবেষণায় ও সমীক্ষায় দেখা গেছে, নানা কারণ সক্রিয় থাকে। এই কারণগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ব্যক্তিগত কারণ এবং (২) সামাজিক কারণ।

১। ব্যক্তিগত কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় তার মধ্যে অনেকগুলি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান নিহিত হয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটি কিশোর কোন কিছুর প্রভাবে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া, কোন কিশোর আত্মবিশ্বাসের অভাব, আবেগের সংঘাত, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা অথবা প্রচণ্ড ক্রোধ, লোভ, অভিমান বা স্নেহ-ভালবাসা-নির্ভরতার অভাবের কারণে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে। এরকম ঘটনা খুব কম হলেও, দেখা যায় নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বা adventure-এর লোভে কিশোররা অপরাধের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

২। সামাজিক কারণের মধ্যে দেখা যায় পরিবারের ভূমিকা, সঙ্গীসাথীদের এবং প্রতিবেশীদের প্রভাব এবং চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের প্রভাব—কিশোর অপরাধীর মানসিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় পরিবার একটি বড় ভূমিকা পালন করে। পরিবারের এই গুরুত্বের জন্যে মানব-জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারকে 'প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ' বলা হয়। শিশুর মানসিক বিকাশ ও সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় 'পরিবার'-এর মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু নগরায়ন ও শিল্পায়নের পথ ধরে যে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবার-ব্যবস্থাকে গ্রাস করছে, তার প্রভাবে পরিবার-ব্যবস্থা অতীত দিনের মতো স্থায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার 'ভাঙনের' শিকার হয়েছে। এই ভগ্ন-পরিবার (broken home) শিশু ও কিশোরদের নিরাপত্তা, স্নেহ ও ভালবাসা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের 'সামাজিকীকরণ' (Socialisation) বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে খুব সংগতভাবেই নিরাপত্তাহীনতা হয়তো জীবনের

কোন অন্ধকার দিক, নেতিবাচক দিকের প্রতি শিশুকে চালিত করতে পারে। এই ছবি সুলভ বড় বড় শহরে নগরে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সঙ্গীসাথীরা। বিশেষ করে ব্যক্তির বয়ঃসন্ধিকালে। সঙ্গীসাথীদের প্রভাব শিশু ও কিশোরের মানসিকতাকে গড়ে তোলে, গড়ে তোলে মূল্যবোধও। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভাল বন্ধুর সাহচর্য একজন শিশু ও কিশোরকে যেমন ভালভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি কু-সংসর্গ তাকে নানা অন্যায় বা অবৈধ কাজকর্মের দিকে আকর্ষণ করে। ভাল-মন্দ বিচার করার পরিণত মানসিকতা না থাকার জন্যে অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা চালিত হয়। কিশোর অপরাধের নানা ঘটনায়, দেখা গেছে, অনেক সময়েই বন্ধুর পরামর্শ বা সাহায্য পরোক্ষভাবে একজন অপরাধীকে ইন্ধন যুগিয়েছে। এছাড়া, একই বিষয় পরিলক্ষিত হতে পারে প্রতিবেশীর প্রভাবের ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের দেখা যায় বড় বড় শহরগুলির বস্তি অঞ্চল বা মহল্লায় অনেকটা সময় কাটাতে প্রতিবেশীর ঘরে। অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত কোন প্রতিবেশীর বাড়ির পরিবেশ শিশু ও কিশোরদের অপরিণত মানসিকতার ওপর ছাপ ফেলতে পারে।

পরিশেষে, বর্তমান কালে কিশোর অপরাধের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল গণমাধ্যম, বিশেষত, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্রের খারাপ প্রভাব। জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি ছবিতে হিংসা ও যৌনতার অবাধ প্রদর্শন শিশু ও কিশোরদের মনকে সহজেই প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে অপহরণ, চুরি, ছিনতাই এইসব ঘটনায় জড়িত অপরাধীরা যেসব কৌশল অনুসরণ করেছে—তা চলচ্চিত্রের 'ব্যাড ম্যান'-এর অনুসৃত কৌশল। এছাড়া আছে দূরদর্শনে প্রদর্শিত নানা ধরনের বিজ্ঞাপন—যা ভোগবিলাসী জীবনযাত্রার দিকে তাদের আকৃষ্ট করছে। গত শতকের শেষ দশক থেকেই গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেকটা আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে। চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনের ভাষা আজকের সমাজে অন্যরকম একটা রুচি ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

## ১.৭ সমস্যা সমাধানের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধ দমনের জন্যে আমাদের দেশে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—তার উত্তরাধিকার সূত্রটি থেকে গেছে অতীত দিনের ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে। ১৮৭৬ সালে প্রণীত "Reformatory Schools Act"-এর মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে কিশোর অপরাধ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে পনের বছরের কম বয়স্ক কোন কিশোর অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে আদালত কোন Reformatory School বা সংশোধন স্কুলে তিন থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত রাখার নির্দেশ দিতে পারবে। পরবর্তীকালে ভারতীয় জেল-কমিটি রিপোর্ট, ১৯১৯-১৯২০ (Indian Jails Committee Report, 1919-1920) অন্যান্য অপরাধীদের তুলনায় তরুণ বয়স্ক অপরাধীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি গ্রহণের ও পৃথক বিচার ব্যবস্থা স্থাপনের সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী, মাদ্রাজ, বাংলা ও বোম্বাইতে যথাক্রমে ১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৪ সালে কিশোরসংক্রান্ত আইন (Childrens Act) পাস করে তরুণ ও অপরিণত বয়স্ক অপরাধীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও পুনর্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে কিশোর-অপরাধীদের বিষয়গুলিকে বিবেচনা করার যে ধ্যান-ধারণা ব্রিটিশদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেই ধ্যান-ধারণাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষ দিকে ভারতবর্ষেও প্রসারলাভ করে।

এরপর বিংশ শতকে কিশোর অপরাধ-বিষয়ক যে সমস্ত নিয়মকানুন তৈরি হয়, দেখা যায় তার সব কটির উৎস কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে ব্রিটেনে প্রচলিত কিশোরসংক্রান্ত আইনসমূহ (English Children Acts)।

স্বাধীন-ভারতে ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকার কিশোর-বিষয়ক আইন (Children Act) পাস করে। এই আইন অনুসারে অপরাধী কিশোরদের বিচারের ভার দেওয়া হয় Juvenile Court বা কিশোর অপরাধসংক্রান্ত আদালতের ওপর। পরে ১৯৭৮ সালে গৃহীত এক সংশোধনী দ্বারা ১৯৬০ সালের এই আইনটিকে আরও শক্তিশালী ও উদার করে তোলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের আগে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই অনুসারে Child Welfare Board বা শিশু কল্যাণ পর্ষদের অধীনে অবহেলিত কিশোরদের এবং কিশোর-আদালতের (Juvenile Court) আয়ত্তাধীন অপরাধী কিশোরদের আদালত বা পর্ষদ দ্বারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত একসঙ্গেই 'Observation Home' বা পর্যবেক্ষণ গৃহে রেখে দেওয়া হত। এছাড়া, এই সময়ে আদালত থেকে পর্ষদে অথবা পর্ষদ থেকে আদালতে কোন মামলা স্থানান্তর করা যেত না। ১৯৭৮-এর সংশোধনী দ্বারা নিয়ম করে দেওয়া হয়—যেসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ছাড়া প্রাথমিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে অপরাধকর্ম কোন ক্রমেই অবহেলার সঙ্গে যুক্ত নয়, সেই সব ক্ষেত্রে মামলা স্থানান্তর করা যাবে। বিচারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্রুততা আনা এবং পর্যবেক্ষণ গৃহ বা Observation Home-এ বসবাসের সময়কালকে হ্রাস করাই ছিল এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৭৮ সালের সংশোধনীসহ ১৯৬০ সালের আইনটি সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত হলেও কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা, পরিধি বা অপরাধীর বয়স—ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যে একই নিয়মপ্রণালী অনুসৃত হত না। এছাড়া, সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল সব রাজ্যে পর্যাপ্ত কিশোর-আদালত না থাকা। এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের আদালতেই কিশোর অপরাধের বিচার হত। এই সব সমস্যা ও অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'Juvenile Justice Act' বা 'কিশোরদের জন্যে ন্যায়নীতির আইন-টি পাশ করে। (ক) এই আইনটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটির দ্বারা 'অবহেলিত কিশোর' ও 'কিশোর অপরাধীর' মধ্যে পার্থক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হয়। (খ) 'অবহেলিত কিশোর' যারা নিপীড়ন, অপব্যবহারের শিকার এবং অপরাধমূলক কাজকর্মে যাদেরকে প্রবৃত্ত করানো হয়েছে—এই নতুন আইন অনুসারে তাদেরকে Observation Home বা পর্যবেক্ষণ গৃহে রাখার কথা বলা হয়। অন্যদিকে, 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত কিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই বন্দী রাখা চলবে না। (গ) এই আইনে আরও বলা হয়েছে—কিশোর অপরাধীরদের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর ধরতে হবে। (ঘ) অবহেলিত কিশোরদের শিশু কল্যাণ পর্ষদ বা Juvenile Welfare Board-এ পাঠাতে হবে এবং শিশু/কিশোর অপরাধীদের Juvenile Court বা কিশোর-আদালতে প্রেরণ করতে হবে।

১৯৮৬ সালের আইনটিকে পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা হয়েছে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে। তবে শুধু আইন প্রণয়নই নয়, অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। মেয়েদের জন্যে সল্ট লেকে ''হোম অফ দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন'' এবং লিলুয়ায় ''এস. এস. হোম'', ছেলেদের জন্যে বারাসাতে 'কিশলয়', আড়িয়াহে 'ধ্রুবাশ্রম'—সরকার পরিচালিত এই কটি পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক আবাসের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এছাড়া, নানা ধরনের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষে বিভিন্নরাজ্যে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে,

সেগুলি হল—রেমান্ড হোমস্ (Remand Homes), সার্টিফায়েড স্কুলস্ (Certified Schools), বরস্ট্যাল স্কুলস (Borstal Schools), প্রবেশন হস্টেলস্ (Probation Hostels) এবং রিফর্মেটরী স্কুলস্ (Reformatory Schools)।

## ১.৮ সারাংশ

এই এককে সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক আলোচনায় আমরা অপরাধ ও বিচ্যুতি সম্পর্কে জানলাম। সাধারণ ক্ষেত্রে অপরাধ বলতে বোঝায় আইন-বিরুদ্ধ বা অ-সামাজিক কাজকর্মকে। আবার, অপরাধ বলতে সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেও বোঝানো হয়। তবে যে কোন ধরনের বিচ্যুতিই কিন্তু অপরাধমূলক কাজ নয়। বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এইসব বিভিন্ন সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি—অপরাধ হচ্ছে সমাজস্থ গোষ্ঠীর আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতি এবং অপরাধ অবশ্যই আইন লঙঘনকারী ও অ-সামাজিক কাজ। নানা কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। কখনও অতিমাত্রায় লোভ ও আকাঙক্ষা, কিংবা দারিদ্র্য বা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের কারণে মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও মানুষ অপরাধপ্রবণ হতে পারে। মূলত অপরাধের কারণগুলিকে-ব্যক্তিগত ও সামাজিক—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অপরাধ কেন ঘটে কিংবা কী কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা ধরনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলি চারপ্রকার, যেমন—ধ্রুপদী তত্ত্ব, জৈবিক তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব। কোন একক তত্ত্বের মাধ্যমে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়। তবে 'অপরাধের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Crime) নামে যে একটি স্বতন্ত্র আলোচনার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলিই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এডউইন. এইচ. সাদারল্যান্ড তাঁর "Differential Association" বা "পার্থক্যমূলক সঙঘ" বিষয়ক তত্ত্বের মাধ্যমে পরিবেশ বা পরিস্থিতি (situational) ও বংশগত (genetic) দুটি কারণকে নির্দেশ করেছেন অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে। তবে তিনি নিজে genetic বা 'বংশগত' কারণকেই গ্রহণ করেছেন। অপর একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) 'Anomic' বা বিধিশূন্যতার তত্ত্ব নামে একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব নির্মাণ করেন। মার্টনের মতে সমাজে যখন গৃহীত নিয়ম-নীতির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—তখন ব্যক্তির আচরণে হৃদয়হীনতা সৃষ্টি হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। সমাজে সব মানুষই বস্তুগত সাফল্য লাভ করতে চায়। কিন্তু সমস্যা হল এই সাফল্য অর্জন করার জন্যে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় এবং এক্ষেত্রে সমাজ-অনুমোদিত সুযোগ-সুবিধা সকলের কাছে সমভাবে লভ্য নয়। তাই লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সমতা থাকে না। এই বিষয়টি ব্যক্তির মনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তারই ফলশ্রুতিতে Anomic বা বিধিশূন্যতা তৈরি হয়। সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্বকে অপর দুজন সমাজবিজ্ঞানী এ ক্লোয়ার্ড এবং এল. ই. ওহলিন সমন্বিত রূপ দেন এবং এঁরা দুজনে "পার্থক্যমূলক সুযোগ-এর তত্ত্ব (Theory of Differential Opportunity) গড়ে তোলেন। আলোচ্য তত্ত্বের মাধ্যমে ক্লোয়ার্ড ও ওহলিন তিনধরনের বিচ্যুতিমূলক উপসংস্কৃতিকে (delinquent sub-culture) চিহ্নিত করেন। যেমন অপরাধী বা Criminal, সংঘাতকারী বা Conflictory, পশ্চাদপসরণকারী বা Retreatist। অপরাধ-বিষয়ক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল বেকারের 'চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব' বা Labelling Theory। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হল সমাজ কেন একজন মানুষকে অপরাধী বা দুষ্কৃতি বলে চিহ্নিত করছে তা অনুসন্ধান করা। আমাদের সমাজে সাধারণত তিনি ধরনের

অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায় যেমন হিংস্র অপরাধ, অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ এবং ভদ্রলোকের অপরাধ। হত্যা, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি হল হিংস্র অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুট এগুলি হল অর্থনৈতিক অপরাধ। এছাড়া, ঘুষ নেওয়া, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, অবৈধভাবে সম্পত্তি বাড়ানো এগুলি হল ভদ্রলোকের অপরাধ বা বাবু অপরাধ। এছাড়া, ৭ থেকে ১৬ বা ১৮ বছর বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যেও নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়—তাকে বলে কিশোর অপরাধ। ভগ্ন পরিবার, পিতা-মাতার হৃদয়হীনতা, নিরাপত্তার অভাব, খারাপ পরিবেশ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্যে অনেক কিশোর সুকুমার বয়সেই নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। যে কোন সমাজেই এই ধরনের অপরাধ একটি গভীর সমস্যা। সরকারি তরফে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, এই সমস্যা নিবারণের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে কল্যাণকর নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও। পরিবারকেও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মতো আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

## ১.৯ অনুশীলনী

**(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)**

১। সমাজে অপরাধ কেন সংঘটিত হয় তার কারণগুলি আলোচনা করুন।

২। অপরাধের জৈবিক তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৩। অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৪। অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৫। কিশোর অপরাধের কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৬। ভারতে কিশোর অপরাধ দমন করার জন্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

**(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)**

১। অপরাধ-জনিত আচরণের ক্ষেত্রে রবার্ট কে. মার্টনের বিধিশূন্যতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। অপরাধ-জনিত আচরণের ক্ষেত্রে সাদারল্যান্ডের পার্থক্যমূলক সংঘের ধারণাটি আলোচনা করুন।

৩। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কিশোর-অপরাধের প্রকৃত ছবিটি কেমন?

৪। কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে পরিবার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা কতটা সক্রিয় বলে আপনি মনে করেন?

**(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি ৬ নম্বর)**

১। অপরাধের সংজ্ঞা দিন।

২। ভদ্রলোকের অপরাধ বলতে কী বোঝায়?

৩। চিহ্নিতকরণ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? এই তত্ত্বের মূল বিষয়টি কী?

৪। কিশোর-অপরাধ কাকে বলে?

৫। বেকারিয়া তাঁর ''ধ্রুপদী তত্ত্বে'' কোন বিষয়গুলি ওপর জোর দিয়েছিলেন?

৬। সাধারণ অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে কী কী বিষয়ে পার্থক্য আছে?

৭। ''জুভেনাইল জাস্টিস'' আইনটির বিশেষত্ব আলোচনা করুন।

## ১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—স্যোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯৯।

২। বেকার হাওয়ার্ড. এস—সোশ্যাল প্রব্লেমস্, এ মডার্ন অ্যাপ্রোচ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬।

৩। দত্তগুপ্ত বেলা—কনটেমপোরারি সোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৪।

৪। গিবনস্ ডি. সি—ডিভিয়্যান্ট বিহেভিয়ার, প্রেন্টিস্ হল, ১৯৭৬।

৫। মার্টন আর. কে— সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার, দি ফ্রি প্রেস, ১৯৫৭।

৬। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু—প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, দ্রষ্টব্য অধ্যায়—''সমাজ সমীক্ষণ''—''কিশোর অপরাধ'', পৃষ্ঠা ৪৪৭।

# একক ২ ❑ শিশু অপব্যবহার

গঠন


২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ শিশু অপব্যবহার ঃ সংজ্ঞা

২.৩.১ শিশু অপব্যবহারের ধরন

২.৩.২ অপব্যবহারের শিকার ঃ কন্যাশিশু

২.৩.৩ শিশু অপব্যবহারের কারণ

২.৩.৪ শিশু অপব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ

২.৪ শিশু শ্রম

২.৪.১ শিশু শ্রমের সংজ্ঞা

২.৫ শিশু শ্রমের কারণ

২.৬ কন্যা শিশু শ্রমিক ঃ বাস্তব চিত্র

২.৬.১ শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র

২.৬.২ শিশু শ্রমিক ঃ কাজের পরিবেশ

২.৭ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সরকারি পদক্ষেপ

২.৭.১ শিশু শ্রম ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি

২.৮ সারাংশ

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী


## ২.১ উদ্দেশ্য

মানবসমাজে শিশুর ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে একটি প্রবচনের মাধ্যমে—"Today's Child is tomorrow's citizen" অর্থাৎ আজকের শিশু হচ্ছে দেশের ভাবীকালের নাগরিক। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ হল শিশু। ভারতবর্ষেও আমরা দেখি জনগণনার হিসাবে শিশু হল মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ (১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে)। মানুষের জীবনের প্রথম ধাপ হল শৈশবকাল।

সাহিত্যে, প্রবচনে জীবনের এই মূল্যবান সময়কালকে নানাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়— জীবনচক্রের প্রাথমিক সোপান শৈশবকাল মানুষের কাছে মূল্যবান এবং শিশুরা দেশের ভাবী প্রজন্ম বলে স্বীকৃতি পেলেও আমাদের সমাজে শিশুরা আজও নানা ধরনের অবজ্ঞা, অযত্ন, নিপীড়ন ও সর্বোপরি অপব্যবহারের শিকার। ফলে কলকারখানায়, জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে নিয়োগ করা হয়। অর্থনৈতিক কারণে শিশু ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কন্যাশিশুকে পাচারচক্রের শিকার হয়ে সুকুমার বয়সেই অন্ধকার জগৎকে খুঁজে নিতে হয়। ফলে শিশু অপব্যবহার ও শিশু শ্রমের বিষয়টি আমাদের সমাজে একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

## ২.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, সেগুলি হল—

- শিশু অপব্যবহার বলতে কী বোঝায়?
- শিশু অপব্যবহারের বিভিন্ন ধরন—
- শিশুকে কেন বা কী কারণে এইভাবে অপব্যবহারের শিকার হতে হয়—
- শিশু শ্রম কাকে বলে?
- শিশু শ্রমের কারণগুলি কী কী?
- শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র।
- শিশু শ্রম প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থা।

## ২.৩ শিশু অপব্যবহার ঃ সংজ্ঞা

বিভিন্ন তাত্ত্বিক ''Child Abuse'' বা ''শিশু অপব্যবহারের'' বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখেছেন এবং নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু অপব্যবহারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেম্প অ্যান্ড কেম্প (Kemp and Kemp : 1978) শিশু অপব্যবহার বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি অবস্থা যেখানে শিশুকে ইচ্ছাকৃত শারীরিক নিপীড়নের দরুন আহত হতে হচ্ছে। অন্যদিকে গার্ডেন অ্যান্ড গ্রে (Garden and Gray, 1982) বলেছেন, দুর্ঘটনা ছাড়া ইচ্ছাকৃত শারীরিক আঘাত ও ক্ষত সৃষ্টি করা হয় যখন শিশুদের ওপর, তখন তাকেই Child Abuse বা শিশু অপব্যবহার বলা যাবে। বলা বাহুল্য, ওই ধরনের সংজ্ঞা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও অস্বচ্ছ, তাই সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি। এই সংজ্ঞার মধ্যে শুধু শারীরিক নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শিশুর প্রতি অযত্ন, অবহেলা কিংবা দুর্ব্যবহার ইত্যাদির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সমাজবিজ্ঞানী আর. এল. বার্জেস (R. L. Burgess : 1997) শিশু অপব্যবহারের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশু অপব্যবহার বলতে বোঝায় অভিভাবক, পিতা-মাতা কিংবা নিয়োগকর্তা কাছ থেকে যখন শিশু দুর্ঘটনা-বহির্ভূত শারীরিক ও মানসিক আঘাত পাচ্ছে। বার্জেস-প্রদত্ত সংজ্ঞায় মৌলিক তিরস্কার দৈহিক নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শন এবং মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক শাস্তিদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ২.৩.১ শিশু অপব্যবহারের ধরন

সাধারণত শিশু অপব্যবহারকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যা থেকে আমরা তিন ধরনের শিশু অপব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি, যেমন—দৈহিক অপব্যবহার (Physical abuse), যৌন অপব্যবহার (Sexual abuse), এবং আবেগগত অপব্যবহার (emotional abuse)।

শিশুর ওপর ইচ্ছাকৃত দৈহিক নিপীড়ন, দেহে ক্ষত সৃষ্টি করাই হল দৈহিক অপব্যবহার। শিশু দেহে আঁচড়, কামড়, পোড়ার দাগ এগুলি হচ্ছে দৈহিক অপব্যবহারের চিহ্ন। দৈহিকভাবে নিপীড়িত বা অত্যাচারিত শিশুর আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অযথা ভয় পাওয়া, কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়া, অতি মাত্রায় লজ্জিত হয়ে পড়া কিংবা সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে না মিশে একলা থাকার চেষ্টা করা।

যৌন অপব্যবহারের বিষয়টি দৈহিক অপব্যবহারের সঙ্গেই জড়িত, তবুও অপব্যবহার নিয়ে আলোচনার সময় এই ধরনের অপব্যবহার স্বতন্ত্রতা দাবি করে। কেম্প বলেছেন, অপরিণত বয়স্ক ও নির্ভরশীল শিশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে সম্পর্ক বিষয়ে বোঝা বা সাড়া দেওয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়—যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে সম্পর্ক বিষয়ে বোঝা বা সাড়া দেওয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়—যৌন অপব্যবহার বা Sexual Abuse বলতে এই সম্পর্ককে বোঝান হয় (The involvement of dependent and immature children in sexual activities they do not fully comprehend, to which they are unable to give informed consent (Kemp 1978)। ১৯৮৬ সালে গৃহীত শিশুসংক্রান্ত আইন (Juvenile Justice Act) অনুসারে আমাদের দেশে ১৬ বৎসরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৮ বৎসরের কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে যৌনাচার করা—'যৌন অপব্যবহার' হিসাবে অভিহিত হয়। দৈহিক অপব্যবহারের মতো যৌন অপব্যবহারকে শিশুর দেহের বিশেষ কোন চিহ্ন বা ক্ষতের মাধ্যমে বোঝা যায় না। তবে শিশুর হাঁটাচলার অসুবিধা বা দেহের গোপন স্থানে নখ বা দাঁতের দাগ দেখে অপব্যবহারের ঘটনাকে অনেক সময় বোঝা যায়। তবে আচরণগত কয়েকটি সূচক লক্ষ্য করা যায় যৌন অপব্যবহৃত শিশুর মধ্যে। বন্ধুদের সঙ্গে না মিশতে চাওয়া, কাজকর্মে অমনোযোগ বা অনিচ্ছা কিংবা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া বা অপ্রয়োজনীয় ভাবে যৌন জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা।

শিশু অপব্যবহারের অন্য একটি দিক হল আবেগগত অপব্যবহার। শিশুকে উপেক্ষা করা, তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শন করা বা অবহেলা করা—এগুলি হল আবেগগত অপব্যবহারের প্রকাশ। এখানে উল্লেখ্য, শিশুর প্রতি অবহেলা বলতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় না দেওয়া, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। আবেগগত অপব্যবহার শিশুর সুকুমার মনে ভীষণভাবে দাগ কাটে, কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশুর মন হয় কোমল এবং অনুভূতিপ্রবণ। আবেগগত অপব্যহারের ফলেও শিশুর নানারকম আচরণ জনিত অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যেমন—অকারণে ক্রুদ্ধ বা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা, বড়দের কথা না শোনা কিংবা শারীরিকভাবে তাদের আঘাত করা, ভয় পাওয়া বা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি।

দৈহিক, যৌন এবং আবেগগত অপব্যবহার ছাড়াও শিশুরা আরও একধরনের অপব্যবহারের শিকার হয়, তা হল সামাজিক অপব্যবহার বা Social Abuse। সমাজতত্ত্বে শিশু অপব্যবহারের আলোচনায় এই সামাজিক অপব্যবহার হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। শিশু অপহরণ, শিশু শ্রম, শিশু পাচার, তাদের জোর করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা, শিশু-পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা—এগুলিকে আমরা শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক অপব্যবহার বলে অভিহিত করতে পারি। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, সামাজিক অপব্যবহার বলে অভিহিত করতে পারি। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, সামাজিক ও যৌন অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা পুত্র শিশুর তুলনায় কন্যাশিশুর ওপর নিপীড়নের ঘটনা বেশি দেখতে পাই। তাই শিশু অপব্যবহারের আলোচনায় কন্যাশিশু কিভাবে অপব্যবহারের শিকার হয় সে বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাত করা জরুরী। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এই বিষয়ে জানব।

## ২.৩.২ অপব্যবহারের শিকার ঃ কন্যাশিশু

আগের অনুচ্ছেদেই আমরা উল্লেখ করেছি সামগ্রিক শিশু অপব্যবহারের ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা দু'ধরনের অপব্যবহারের সম্মুখীন হয়—(১) যৌন নির্যাতন এবং (২) সামাজিক অব্যবহার। রাজস্থানে নব্বই এর দশকে জি. এস. কেওয়ালরামানি (G. S. Kewalramani) ১০-১৬ বৎসরের ১৬৭ জন শিশুর ওপর যে সমীক্ষা করেন তাতে দেখা যায় মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি পরিমাণে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে (অনুপাত হচ্ছে ২.৩ : ১)। এছাড়া, ছেলেদের ক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ ঘটেছে একজন ব্যক্তির দ্বারা, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেখানে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা যৌন উৎপীড়ন ঘটেছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে সুইডেনের স্টকহোমে সপ্তাহব্যাপী এক মহাসম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল শিশুদের ওপর যৌনপীড়ন বন্ধের দাবি জানানো। এইরকম একটি বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন এই প্রথম আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ১২৬টি দেশের প্রতিনিধি নিজের নিজের দেশের শিশুদের, বিশেষ করে কন্যাশিশুর ওপর সংঘটিত যৌন নিপীড়নের কথা তুলে ধরেন। তবে প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের অসুবিধার কথা বলেন।

দ্বিতীয়ত, শিশুকন্যা যেসব সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয় তার মধ্যে রয়েছে কন্যাশিশু পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ। 'সেন্টার অফ কনসার্ন ফর চাইল্ড লেবার'—এর রিপোর্ট অনুযায়ী কন্যাশিশু পাচারের সবচেয়ে বড় চারটি ঘাঁটি হল কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদ। এইসব শহর থেকে পাচার হয়ে আসা ছোট ছোট মেয়েদের নানা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে তাদের নিয়োগ করা হয় কোথাও ভিক্ষাবৃত্তিতে, কোথাও পরিচারিকার কাজে, আবার কখনও সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় পতিতালয়ে। এছাড়া, দেশের বাইরেও কন্যাশিশুকে পাচার করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ওখানে ভারতীয় শিশুকন্যার খুব চাহিদা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে কন্যা শিশুদের যৌনবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়। এছাড়া, আরবে শিশুকন্যাদের উটের পিঠে বেঁধে দৌড়ের বাজি খেলান হয়। দিল্লির একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনে এইরকম একটি ভয়াবহ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ছোট ছোট মেয়েগুলিকে উটের পিঠে বেঁধে চাবুক মারা হয়। চাবুক খেয়ে শিশুর বুকভাঙা আর্তনাদে উটগুলো দিশেহারা হয়ে যত ছুটবে আরবের শেখ্‌রা এই অমানবিক দৃশ্য দেখে ততই আনন্দ পাবে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তান এই কটি দেশের মধ্যে অবাধে কন্যাশিশু আদান-প্রদান হয়। ইউনিসেফ প্রকাশিত, ''প্রগ্রেস অফ নেশনস'' ১৯৯৬ অনুযায়ী ৪০ হাজার বাংলাদেশী শিশুকন্যা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মত পাকিস্তানেরও শিশু পাচারকারীদের মূল লক্ষ্য হল মধ্যপ্রাচ্য। পাকিস্তান হিউম্যান রাইটস কমিশনের (Pakistan Human Rights Commission) একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার পাকিস্তানি শিশুকন্যা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে চালান করা হয়েছে। এদের বয়স ২ থেকে ১১ বৎসর। এদের বেশির ভাগকেই দাসী অথবা বিকৃত যৌন লালসার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, উটের দৌড়ের ''জকির'' কাজও করানো হয়েছে। ভয়ে, আতঙ্কে আর পরিশ্রমের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক শিশুর মারা যাবার মর্মান্তিক খবরও পাওয়া গেছে।

পরিশেষে, বলা যায়, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও এক বিশাল সংখ্যক শিশুকন্যা পাচার হয়ে আসে এবং যৌনবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ''সংলাপ''—এর সমীক্ষা অনুসারে, এরাজ্যে যেসব শিশু পাচার হয়ে আসে এবং পাচার হয়ে অন্য রাজ্যে যায় তারা বেশিরভাগ গ্রামের মেয়ে। বিভিন্ন জেলার মধ্যে এই বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

যেসব শিশুকন্যা এইভাবে পাচার হয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে বা মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরিত হচ্ছে তার জন্যে কী কী বিষয় দায়ী? কেনই বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অজস্র শিশুকে আবেগগত বা দৈহিক অপব্যবহারের শিকার হতে হচ্ছে?—এই জরুরী ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের শিশু অপব্যবহারের কারণগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তিনরকমের শিশু অপব্যবহার এবং সর্বোপরি সামাজিক অপব্যবহারের পিছনে সক্রিয় কারণগুলি নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

## ২.৩.৩ শিশু অপব্যবহারের কারণ

ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে কেওয়ালরামানি যে সমীক্ষা করেন, তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে শিশু অপব্যবহারের প্রধান কারণ হল পরিবার ও কর্মস্থলে উভয়ক্ষেত্রেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে পিতামাতা কিংবা নিয়োগকর্তার দিক থেকে। সেই অক্ষমতার কারণেই এঁরা শিশুকে অপব্যবহার করতে চান। অধ্যাপক রাম আহুজা (Ram Ahuja) শিশু অপব্যবহারের যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৫ থেকে ১৫ জন পিতামাতা এবং নিয়োগকর্তার অপব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে।

দৈহিক অপব্যবহারের বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা উপস্থাপন করেছেন। কেউ বলেছেন শিশুকে দৈহিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ, কেউ বলেছেন পারিবারিক তথা সামাজিক চাপ এবং অন্যরা বলেছেন বিশেষ পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিছু ব্যক্তি শিশুকে অপব্যবহার করে। পূর্বে উল্লিখিত কেওয়ালরামানি (Kewalramani) কৃত সমীক্ষায় শিশুর দৈহিক অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায়—শিশুদের পড়াশোনায় অমনোযোগ (৯ শতাংশ), পিতামাতার প্রতি শিশুর বিরামহীন অবাধ্যতা (৩৫ শতাংশ), পিতা-মাতার নিজেদের মধ্যে কলহ (১৯ শতাংশ), সহোদরদের মধ্যে মারপিট (৫ শতাংশ), শিশুর স্ব-অর্জিত অর্থ পিতামাতাকে প্রত্যর্পণ না করা (৫ শতাংশ) এবং ধূমপান করা, চুরি করা ইত্যাদি অসদ্ আচরণের অভিযোগ শিশুদের বিরুদ্ধে (৪ শতাংশ) ইত্যাদি কারণসমূহ পিতামাতা বা অভিভাবকদের দৈহিক শিশু অপব্যবহারের দিকে চালিত করেছে।

আবেগগত অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধানত চারটি কারণকে চিহ্নিত করা হয়, যেমন দারিদ্র্য, পিতামাতার নিজেদের শৈশবে অত্যাচারের তিক্ত অভিজ্ঞতা, পরিবারে সুন্দর ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অভাব এবং পরিশেষে মাদকাসক্তি। কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে শিশু অপব্যবহারকারী ৫৫ শতাংশ পিতামাতা নিম্ন আয় বিশিষ্ট (মাসিক আয় ১০০০ টাকার নিচে)। এছাড়া, ৭৯ শতাংশ পিতামাতা নিজেদের শৈশবে অত্যাচারিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট। কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় পিতা বা মাতার মাদকসক্তিকে শিশু অপব্যবহারের নিয়ামক বলে চিহ্নিত হয়নি। অবশ্য ম্যাটলিন (১৯৮১) শিশু অপব্যবহারের ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত পিতামাতার ভূমিকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করেছেন।

শিশুর ওপর যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রেও চারটি কারণকে নির্দেশ করা যায়—মাতাপিতার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, পরিবারের ভাঙন, ব্যবহারকারীর মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং শিশুর প্রতি হৃদয়হীনতা। পূর্বে উল্লেখিত কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুকে যৌন অপব্যবহারের পশ্চাতে ব্যক্তির কয়েকটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য কার্যকরী থাকে এবং এই আচরণ হচ্ছে একাধিক উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবের ফলশ্রুতি। পরিবারের মধ্যে কিংবা পরিবারের বাইরে এবং বিশেষত কর্মক্ষেত্রে এই অপব্যবহার ঘটে থাকে। কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় বালিকার একাকিত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তাকে যৌন অপব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে, সামাজিক অপব্যবহার অর্থাৎ শিশু পাচার, শিশু শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদির জন্যে দায়ী কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক লেনদেন, লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে পিতামাতা তাদের শিশু পুত্র বা শিশু কন্যাকে পাচারকারীদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে অন্য যে কারণই দায়ী থাকুক না কেন সামগ্রিকভাবে এইসব ঘটনার মাধ্যমে শিশুর প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারে হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়।

### ২.৩.৪ শিশু অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

শিশু অপব্যবহার যে কোন সভ্য সমাজের একটি গভীরতর সামাজিক সমস্যা, সন্দেহ নেই। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জরুরী হল শিশু অপব্যবহারের অমানবিক ও নিষ্ঠুর দিকটি সম্পর্কে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সচেতন করা। এর জন্যে প্রয়োজন ক্রমাগত প্রচার। শিশু যে মানবজাতির মধ্যে, দেশের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। সরকারি তরফে এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে শিশু অপব্যবহার রোধ করা এবং অপব্যবহৃত শিশুর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

## ২.৪ শিশু শ্রম

শিশু অপব্যবহারের একটি বিশেষ দিক হল শিশুশ্রম। বিশ্বে স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায় এক বিরাট সংখ্যক শিশুশ্রমিক শহরে ও গ্রামে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই একই ছবি দেখা যায়। আমাদের দেশে শহরে ও গ্রামে শিল্পের অসংগঠিত ও অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে অসংখ্য শিশুশ্রমিক। ১৯৯১ সালের আদমসুমারির হিসাবে ভারতবর্ষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ। শিশু শ্রমিকের এই সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে হয়তো অনুমান করা কঠিন হবে না যে শিশু শ্রমের সমস্যাটি হচ্ছে বহুমুখী এবং নানা স্তরবিশিষ্ট। তবে শিশু শ্রমজনিত সমস্যার ওপর আলোকপাত করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন কাকে বলব শিশু শ্রম?

### ২.৪.১ শিশু শ্রমের সংজ্ঞা

বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু শ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তার মতে ''As an economic practice it (Child labour) obviously refers to the employment of children in gainful practices and occupation...to add...some more money to the family budget'' অর্থাৎ লাভজনক কাজের মাধ্যমে সেখানে শিশুর শ্রম পরিবারের বাজেটে আরও কিছু বাড়তি অর্থ যোগ করতে পারবে, তাকেই শিশু শ্রম বলা যেতে পারে। অধ্যাপিকা দত্তগুপ্তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত শিশু শ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে বয়সের নিরিখে একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের থেকে শিশু শ্রমিককে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। তাই শিশু শ্রমিক বলতে আমরা বুঝি ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের, যারা জীবিকা নির্বাহের জন্যে বা পরিবারের বাড়তি রোজগারের জন্যে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে বা ধারণাগত দিক থেকে শিশু শ্রমিকের যে সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন কোন দেশের আইনগত বা সরকারি সংজ্ঞাই কার্যক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিশু শ্রমিকের হার গণনার ক্ষেত্রে ভারতের জনগণনায় শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সকাল ৫ থেকে ১৪ এই বয়ঃসীমাকে শিশুশ্রমিক নির্দেশক বয়স হিসাবে গণ্য হয়েছে।

## ২.৫ শিশু শ্রমের কারণ

কমবয়সী শিশুদের অর্থকরী কর্মে নিয়োগের পেছনে সক্রিয় আছে একাধিক কারণ যেমন অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ বলতে বোঝায় অবশ্যই দারিদ্র্যকে। নানা সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পরিবার অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যেই অল্পবয়সী শিশুদের কলকারখানা বা যে কোন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। Indian Labour Organisation (ILO) বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯৯২ সালে তাদের একটি প্রতিবেদনে, পারিবারিক দারিদ্র্যকে শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পারিবারিক কারণ হিসাবে দেখা যায় উপার্জনকারী সদস্যের শারীরিক অক্ষমতা, নেশাগ্রস্ততা, পরিবারে অত্যধিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি। এইসব কারণে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত হলে শিশুরা অর্থ রোজগারের জন্যে নানা ধরনের কাজে যোগদান করে।

ব্যক্তিগত কারণ বলতে অনেক সময় লোভের বশে শিশুর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করাকে বোঝায়। অনেকে পড়াশোনায় অমনোযোগের কারণে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কাজে নিযুক্ত হয়। এছাড়া দেখা যায়, অনেক সময় পিতামাতা অর্থের লোভে সন্তানকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে কাজে নিয়োগ করছেন। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিককে নিযুক্ত করার পেছনে মালিক শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ হয়, কারণ এই ধরনের শ্রমিককে অল্প মজুরীতে বেশি সময় ধরে কাজ করানো যায়। অল্পবয়সী শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন থাকে না বলে, এরা দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্যে সংঘবদ্ধ হতে জানে না। অনেক সময় ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেনেও অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণে তারা কাজ ছেড়ে দিতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, নিম্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবারের পিতামাতারা পুত্রশিশুকে অর্থ উপার্জনের যোগ্য একক মনে করে। তাই অনেক সময় অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছাড়িয়ে অর্থ রোজগারের লোভে শিশুকে কাজে নিয়োগ করে। আর শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক মূল্যবোধহীনতা, নিরাপত্তার অভাব এবং পড়াশোনার পদ্ধতি আকর্ষণীয় মনে না হওয়ার দরুন এরা শ্রমজগতে প্রবেশ করে অর্থ উপার্জন করাই শ্রেয় মনে করে।

## ২.৬ কন্যাশিশু শ্রমিক ঃ বাস্তব চিত্র

শিশু শ্রমিক নিয়ে আলোচনায় আমরা সাধারণত সামগ্রিকভাবে পুত্র শিশু শ্রমিককেই ধরি, কন্যা শিশুকে তেমনভাবে আলোচনার পরিসরে আনি না। তবে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে শহরের বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে গৃহ পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে কত বালিকা এবং বড় বড় শহরের রাস্তায় কাগজ ও পলিথিন কুড়িয়ে বেড়ায় কতজন শিশু বালিকা তার কোন সরকারি পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। এছাড়া, গ্রাম ও শহরে শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজকর্মে কত কন্যাশিশু যে নিয়োজিত আছে, তার হিসাবে আমরা সরকারি নথিপত্রে পাই না। তবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর সংখ্যক কন্যাশিশু নানা ধরনের অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিযুক্ত। গৃহভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে রয়েছে বিড়ি, পাঁপড় বা আচার তৈরি, লেস বা জরি বোনা ইত্যাদি। সংগঠিত ক্ষেত্রে দেখা

যায় যে তামিলনাড়ুর কামরাজনগর, শিবকাশী ও চিদাম্বরনগর জেলায় বিভিন্ন দেশলাই তৈরির কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিককের মধ্যে ৬০ শতাংশ হচ্ছে বালিকা, যাদের গড় বয়স ১০ থেকে ১৩ বছর। অনুরূপভাবে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে তালা নির্মাণ কারখানায় বা মির্জাপুরে কার্পেট শিল্পে নিযুক্ত আছে এক বিরাট সংখ্যক কন্যা শিশু শ্রমিক। বেনারসে সাবেকী জরি এমব্রয়ডারী শিল্পে, লক্ষ্ণৌতে চিকন শিল্পে নিয়োজিত অজস্র বালিকা কম মজুরির বিনিময়ে পরিবারের দারিদ্র্যের মোকাবিলায় এসব ধরনের কাজে যুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমব্রয়ডারী বা বিভিন্ন সূচী শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের মতো শিশু কন্যা শ্রমিককে বেশি পছন্দ করা হয়, কারণ তাদের হাতে কাজ সূক্ষ্ম। এছাড়া, উত্তর-পূর্ব ভারতের চা বাগানগুলিতে, বিশেষ করে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর কন্যাশিশু শ্রমিক কাজ করে।

## ২.৬.১ শিশুশ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র

আমাদের দেশে শিশুশ্রমের সমস্যা যতটা শহরকেন্দ্রিক, প্রায় ততটা বা তার থেকেও বেশি গ্রামীণ। গ্রামাঞ্চলে যত শিশুশ্রমিক আছে তার ৯০ শতাংশ হয় কৃষিকাজ নয়তো ঐ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজ যেমন বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, মাছ ধরা, জলসেচন করা ইত্যাদি সাধারণত শিশুদের দিয়েই করানো হয়। বরোদা জেলার গ্রামীণ ক্ষেত্রে শিশুদের ওপর সমীক্ষা করে নলিনী ওগেল (Nalini Ogale) দেখিয়েছেন সেখানে শিশু শ্রমিকদের রোজ ৮/১০ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। অধ্যাপক এস. বি. সাক্সেনা (S. B. Saxena) গুজরাটের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ভারুচ (Bharuch) জেলার মিয়া মাতার (Miya Matar) গ্রামে যে সমীক্ষা কাজ চালান, তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে কৃষিকাজে যুক্ত আছে ৭২ শতাংশ শিশুশ্রমিক, কৃষিকাজ ও পশুপালনে নিয়োজিত ১৪ শতাংশ শিশু এবং কৃষি ও গৃহকর্মে নিযুক্ত বাকি ১২ শতাংশ শিশু। ৯৮ শতাংশ শিশু শ্রমিককে দৈহিক ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ 'ঠিকা শ্রমিক' হিসাবে যুক্ত।

বড় বড় শহরগুলিতে বেশিরভাগ শিশু শ্রমিক রেস্তোরাঁয়, হোটেলে, গ্যারেজে, ছোট ছোট কারখানায়, পেট্রোল পাম্পে কাজ করে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দীর্ঘক্ষণ তাদের কাজ করতে হয়। সামান্য কোন অন্যায় বা অবাধ্যতার জন্যে মালিকের হাতে তাদের ভর্ৎসনা ও প্রহার সহ্য করতে হয়। বরোদা শহরে ১৮০ জন শিশুশ্রমিকের ওপর কমলা শ্রীনিবাসন (Kamala Srinivasan) যে সমীক্ষা চালান, তাতে দেখা গেছে যে শিশুশ্রমিকরা ১২ বছর বয়স হবার আগেই নানা অর্থকরী কাজে যোগদান করে। শ্রীমতী শ্রীনিবাসন বরোদা শহরে শিশুশ্রমিকদের কাজের ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন, যেমন গৃহ পরিচারক (এই ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শিশুকন্যা নিয়োজিত), গ্যারেজ কর্মী, নির্মাণ কর্মী, রেঁস্তোরায় বাসনপত্র ধোয়া, রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে কাজ এবং ছোটখাটো জিনিসপত্র বিক্রি ইত্যাদি।

ভারতের রাজধানী শহর দিল্লিতে প্রায় ৬০ হাজার শিশু ধাবা, চায়ের দোকান ও রেস্তোঁরায় দৈনিক মাত্র ৮-১০ টাকার পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকে। দিল্লি ছাড়া অন্যান্য বড় বড় শহর ও মহানগরীতে শিশুশ্রমিকদের ওপর যেসব সমীক্ষা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, মুম্বাই শহরে অগণিত শিশুশ্রমিক নানা ধরনের কাজে যুক্ত। যেমন, সাহারানপুরে কাঠখোদাই শিল্পেই প্রায় ১০,০০০ শিশুশ্রমিক নিযুক্ত। এদের দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, কিন্তু পারিশ্রমিক হিসাবে পায় মাত্র ৭ থেকে ৮ টাকা। বারাণসীতে রেশম বয়ন শিল্পে যুক্ত আছে ৫,০০০ শিশু। তামিলনাড়ুর রামনাথপুরম জেলার শিবকাশীতে দেশলাই এবং আতসবাজি শিল্প কারখানায় ৫,০০০ শিশুশ্রমিক কাজ করে।

ফিরোজবাদের কাচশিল্পে এবং মির্জাপুরের কার্পেট শিল্পে নিয়োজিত ৫,০০০ শিশুশ্রমিক। অন্ধ্রপ্রদেশের মর্কপুরের স্লেট শিল্পে, মধ্যপ্রদেশের স্লেট-পেন্সিল শিল্পে, উত্তপ্রদেশের আলিগড়ে তালা শিল্পে নিযুক্ত অসংখ্য শিশু যাদের বয়স ১৪ বছরের নীচে। উত্তরপ্রদেশেরই মোরাদাবাদে পিতল সামগ্রী শিল্পে নিযুক্ত আছে ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ শিশুশ্রমিক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিখনন কাজেও অগণিত শিশুশ্রমিক নিযুক্ত। এইসব ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা দালাল বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে শিশুশ্রমিক যোগাড় করে থাকে। এই ধরনের কাজে শিশুদের চাহিদাই বেশি, কারণ তাদের শোষণ করা যায় এবং বয়স্ক শ্রকিমদের মত এরা প্রতিবাদী হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের নানা শহর ও গ্রামীণ এলাকাতে শিশুরা শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়িশিল্পে নিযুক্ত আছে অসংখ্য শিশু। এছাড়া, ঐ জেলারই রেশম বয়ন শিল্পে ও রেশম চাষের কাজেও শিশুদের লাগান হয়। কলকাতা মহানগরীতে বড় বড় রেস্তোঁরায় হোটেলে, রাস্তার পাশের ধাবায়, চায়ের দোকানে দৈনিক স্বল্প মজুরীর ভিত্তিতে শিশুরা কাজ করে থাকে। পূর্ব কলকাতার বালব তৈরির কারখানাতে নিযুক্ত আছে অনেক শিশুশ্রমিক। এছাড়া, বস্তি অঞ্চলে গৃহভিত্তিক উৎপাদনেও ছোট ছোট শিশুদের কাজে লাগান হয়।

## ২.৬.২ শিশু শ্রমিক ঃ কাজের পরিবেশ

শিশু শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যেমন তাদের নানা ধরনের জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের কথা বলতে হয়, তেমনি উল্লেখ করতে হয় যে পরিবেশে তারা দিনে ৮/৯ ঘণ্টা কিংবা ১৩/১৪ ঘণ্টা কাজ করে, তার কথাও। পরিবেশের কথা বা কর্মস্থলের অবস্থার উল্লেখ ব্যতিরেকে শিশুশ্রমিকদের সমস্যার ভয়াবহতা অনেকটাই বোঝা যাবে না। আমরা দেখেছি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বা দারিদ্র্যের কারণে চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুরা খনিখনন কাজে, বালব্ তৈরির কাজে, আতসবাজি ও দেশলাই শিল্পে নিযুক্ত হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়। ১৪০০ সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার ফার্নেসের কাছে তারা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে, তেমনি আর্সেনিক ও পটাসিয়ামের মতো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল তাদের ব্যবহার করতে হয়। সপ্তাহে কোন ছুটি শিশু শ্রমিকদের দেওয়া হয় না, সাধারণত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা এরা কাজ করে। কাজে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে মালিকের প্রহারের হাত থেকে এরা রেহাই পায় না। অনেক সময় কর্মস্থলে কোন জিনিসের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এদের পারিশ্রমিক থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়। দারিদ্র্যের কারণে এরা কাজ ছেড়ে দিতেও পারে না। কর্মস্থলে ঘিঞ্জি, অন্ধকার নোংরা পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে শিশুরা প্রায়শই নানা ধরনের রোগের শিকার হয়। এগুলিকে বলা যায় 'কর্মজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা' বা Occupational Health Hazards। দীর্ঘসময় এক দিকে তাকিয়ে কাটাতে হয় বলে এরা চোখের অসুখে ভোগে। ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করার দরুন এরা চর্মরোগ ও ফুসফুসের রোগের শিকার হয়। তাই ব্রঙ্কাইটিস, টিউবারকিউলোসিস, অ্যাজমা, বাত বা আর্থারাইটিস্ শিশু শ্রমিকদের কতকগুলি প্রচলিত অসুখ। বাজি কারখানায় কর্মরত শিশুরা অনেকে আগুনজনিত দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণের দরুন অগ্নিদগ্ধ হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনায় এদের অঙ্গহানি ঘটে, এমন কি অনেকে প্রাণও হারায়। বিভিন্ন মহানগরীতে (দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা) শিশুশ্রমিকদের ওপর কৃত সমীক্ষায় দেখা গেছে নোংরা পরিবেশে কর্মরত শিশুরা অপুষ্টি, কম ওজন, দৃষ্টিহীনতায় ভোগে। অথচ অসুখের চিকিৎসা করার মতো যথেষ্ট সংগতি এদের নেই, আর নিয়োগকর্তা কিংবা মালিকেরা এদের স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়।

## ২.৭ শিশু শ্রম ঃ সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং সরকারি পদক্ষেপ

ভারতীয় সংবিধানে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

⊙ ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানায়, খনিতে বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবে না (২৪ নং অনুচ্ছেদ)।

⊙ শৈশব ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বস্তুগত অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে হবে (৩৯ নং অনুচ্ছেদ [চ])।

⊙ শিশুদের ১৪ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র তাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান করবে (৩৫ নং অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানে উল্লিখিত নির্দেশাবলীকে রূপায়িত করার জন্যে ভারত সরকার কর্মরত শিশুদের কয়েকটি আইনী রক্ষাকবচ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যেমন—

- কারখানা আইন, ১৯৪৮
- খনি আইন, ১৯৫২
- মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস আইন, ১৯৬১
- বিড়ি ও সিগার কর্মচারী আইন, ১৯৬৬
- বাগিচা শ্রম আইন, ১৯৫১
- ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮

শিশুশ্রমিকের কল্যাণ সাধনের জন্যে আমাদের জাতীয় সরকার ১৯৭৯ সালে এম. এস. গুরুপদ স্বামীর নেতৃত্বে দি ন্যাশনাল কমিটি অন চাইল্ড লেবার (The National Committee on Child Labour) গঠন করে। এই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত আইনগুলি এলোমেলো থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের বিধানগুলিও অসঙ্গতিপূর্ণ থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে এই কমিটি প্রচলিত আইনগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটি অখণ্ড আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৮৬ সালে "শিশু শ্রম (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন" (The Child Labour [prohibition & regulation] Act) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দান করা হয়; যেমন—শিশু শ্রমিকদের ৩ ঘণ্টা কাজের অন্তরে ১ ঘণ্টা অবসর দেওয়া, সপ্তাহে ১ দিন সবেতন ছুটি দেওয়া এবং শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। তবে শুধু শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ নয়, কিভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া যায় সেই ব্যাপারেও জাতীয় সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করে। আর সেই চিন্তাকে সামনে রেখেই ১৯৮৭ সালের আগষ্ট মাসে শিশু শ্রমিকদের জন্যে একটি জাতীয় নীতি তৈরি করা হয়। এই নীতিতে তিনটি কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়; যেমন—(১) আইনগত কর্মসূচী (২) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী এবং (৩) পরিকল্পনামাফিক কর্মসূচী। প্রায় একই সময়ে জাতীয় শিশুশ্রম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে এই কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করা হয় যাতে ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিপজ্জনক কাজ থেকে মুক্ত করে এনে জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্পের আওতায় তাদের শারীরিক ও মানসিক পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়। কর্মসূচীটির আওতায় যে ১০টি জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সেগুলি হল—

(১) অন্ধ্র প্রদেশের মর্কপুরে স্লেট শিল্প

(২) তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে দেশলাই শিল্প

(৩) মধ্যপ্রদেশের মান্দসাউরে স্লেট শিল্প

(৪) উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদে কাঁচ শিল্প

(৫) উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে পিতল সামগ্রী শিল্প

(৬) রাজস্থানের জয়পুরে পাথর মাজাই শিল্প

(৭) উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে তালা তৈরি শিল্প

(৮) জম্মু ও কাশ্মীরে কার্পেট শিল্প

(৯) গুজরাটের সুরাটে হীরক মাজাই শিল্প

(১০) উত্তরপ্রদেশের ভাদোই এবং মির্জাপুরে গলিচা শিল্প।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল যেসব শিশু শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে তাদের প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিকল্প পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া এবং বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করা।

### ২.৭.১ শিশু শ্রম ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি

শিশুদের অধিকার বিষয়ে ১৯৮৯-এর ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিশু শ্রম প্রথা ধাপে ধাপে দূর করার জন্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শুধু দূর করাই নয়, শিশুরা যাতে শিল্প সংস্থায় শোষণের শিকার না হয় তার লক্ষ্যেও চলেছে নিরন্তর প্রয়াস। সংস্থা মূলত পাঁচটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছে। এগুলি হল শিশুশ্রম বিলোপ কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকদের নিরাপত্তা দান, শিশু শ্রমপ্রথার মূল কারণকে আক্রমণ করা, ভবিষ্যতে উপযুক্ত কাজ খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে শিশু শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং যেসব শ্রমিকদের পিতামাতা কর্মরত তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এরও আগে ১৯৮৭ সালে সার্ক (SAARC) আয়োজিত বিশেষ সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ার শিশুদের জীবনের মানের উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে চারটি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল; যেমন—(১) উদ্বর্তন (২) উন্নয়ন (৩) সংরক্ষণ এবং (৪) অংশগ্রহণ।

## ২.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককে আমরা প্রথমে শিশু অপব্যবহার ও পরে শিশু শ্রম নিয়ে আলোচনা করলাম। শিশু অপব্যবহার বলতে কেউ বলছেন দৈহিক নির্যাতন, আবার কেউ বুঝিয়েছেন মানসিক নির্যাতনকে। সমাজ বিজ্ঞানী বার্জেস প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। বার্জেস বলেছেন, অভিভাবক বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে শিশু যখন কোন দুর্ঘটনা বহির্ভূত শারীরিক ও মানসিক আঘাত পাচ্ছে, তখন তাকেই শিশু অপব্যবহার নামে অভিহিত করা যায়। তিনটি প্রধান শ্রেণীতে এই অপব্যবহারকে ভাগ করা যায়—দৈহিক, যৌন এবং আবেগগত অপব্যবহার। সাধারণত দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় পুত্র শিশু, কিন্তু যৌন ও সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয় কন্যাশিশু।

নিগ্রহ, নিপীড়ন, শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণের চেষ্টার মাধ্যমে যৌন অপব্যবহার করা হয়; অন্যদিকে কন্যাশিশুকে এক রাজ্য বা এক দেশ থেকে অন্য রাজ্য বা দেশ পাচার করা এবং পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা। এইসব অপব্যবহারের পশ্চাতে সক্রিয় কারণগুলির মধ্যেই রয়েছে মানুষের হৃদয়হীনতা, মানসিক বিকৃতি, অর্থনৈতিক লেনদেন, লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা। শিশু অপব্যবহারের একটি বিশেষ দিক হল শিশু শ্রম। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়, জীবিকা নির্বাহের জন্যে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুরা যখন নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত হয়, তাকেই শিশু শ্রম বলে। অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নানা কারণে কমবয়সী শিশুদের সংসারের বাড়তি রোজগারের জন্যে অর্থকরী কাজে, এমন কি জীবনের ঝুঁকিযুক্ত কাজেও নিয়োজিত করা হয়। অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে শিশু শ্রমের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে পারিবারিক দারিদ্র্য। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা ILO একই কারণকে শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে নির্দেশ করেছে। বড় বড় শহরগুলিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় শ্রমের বাজারে নিয়োজিত রয়েছে অজস্র বালিকাও। এরা কোথাও পরিচারিকার কাজে রত, কোথাও নিযুক্ত রয়েছে শ্রম-নিবিড় কাজে যেমন চা-পাতা সংগ্রহ কিংবা জরি বোনা বা এমব্রয়ডারির কাজে। তবে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এরা মজুরি পায় নামমাত্র। কাজ হারাবার ভয়ে প্রতিবাদের ভাষা এরা প্রয়োগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে, ছেলে শ্রমিকেরাও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন— আতসবাজির কারখানায় বা দেশলাই তৈরির কাজে নিজেদের নিয়োগ করে। অথচ শিশু শ্রম রোধ করার কথা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। গ্রহণ করা হয়েছে নানা সরকারি নীতি। প্রণীত হয়েছে শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৮৬ সালে)। জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ১০টি জাতীয় প্রকল্প। শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও শিশু শ্রমিকদের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনিসেফ (UNICEF) তাদের একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে—"এমন দিন আসছে যখন একটি দেশের মূল্যায়ন কেবলমাত্র তার অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তি, কিংবা রাজধানীর চাকচিক্য ইত্যাদি দিয়ে বিচার করা হবে না—বিচারের মাপকাঠি হবে যারা সামাজিক নিপীড়নের শিকার এবং যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্যে কি করা হয়েছে তার ওপর।" শিশুর অপব্যবহার ও শিশু শ্রম সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রতিবেদনটি হতে পারে আমাদের চক্ষু উন্মীলক বা eye-opener।

## ২.৯ অনুশীলনী

**১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)**

(ক) আমাদের সমাজে কী কী ধরনের শিশু অপব্যবহার দেখা যায় তা আলোচনা করুন।

(খ) শিশু অপব্যবহারের কারণগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিককে নিয়োগ করা হয় তা আলোচনা করুন।

(ঘ) শিশু শ্রম প্রতিরোধ করার জন্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সরকারি পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

**২। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)**

(ক) কন্যাশিশু কিভাবে অপব্যবহারের শিকার হয় তা বিশ্লেষণ করুন।

(খ) শিশু শ্রমের কারণগুলি পর্যালোচনা করুন।

(গ) কন্যা শিশুও কিভাবে শ্রমের বাজারে ব্যবহৃত হয় তার বাস্তব চিত্রটি উপস্থাপন করুন।

(ঘ) শিশু শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটি ৬ নম্বর)**

(ক) শিশু অপব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

(খ) কিভাবে শিশু অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(গ) শিশু শ্রম বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) শিশু শ্রমিকদের 'কর্মজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা' বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) শিশু শ্রম বিরোধী সাংবিধানিক ধারাগুলি আলোচনা করুন।

(চ) জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্পের অধীনে কোন কোন শিল্পকে গ্রহণ করা হয়েছে?

(ছ) শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলি লিখুন।

## ২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—স্যোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯৯।

২। কেম্প আর. এস. এবং কেম্প সি. এইচ—চাইল্ড লেবার, ফন্টানা লন্ডন, ১৯৭৮।

৩। কেওয়ালরামানি সি. এস. চাইল্ড অ্যাবিউস, রাওয়াত পাবলিকেশনস্, জয়পুর, ১৯৯২।

৪। চক্রবর্তী বাসবী—গার্ল চাইল্ড লেবার ঃ লস্ট চাইল্ড হুড; আলোচনাপত্র—ক্যারিড, কলকাতা ও আই. ডি. আর, বাংলাদেশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ (বিষয় ঃ কালচার অফ পিস ইন সাউথ এশিয়া ঃ উইমেন পার্সপেক্টিভ) প্রদত্ত এবং পঠিত।

৫। চক্রবর্তী বাবসী—গার্ল চাইল্ড ইন বিড়ি মেকিং ঃ এ কেস স্টাডি অফ কলকাতা; আলোচনাপত্র, ডিপার্টমেন্ট অফ সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত ও পঠিত।

৬। শ্রীনিবাসন কমলা ও বিনা গন্ড্রোত্রা—চাইল্ড লেবার, মাল্টি ডাইমেনশ্যানাল প্রব্লেম, অজন্তা পাবলিকেশন, দিল্লি, ১৯৯৩।

৭। শর্মা বি কে অ্যান্ড মিত্র. ভি—চাইল্ড লেবার অ্যান্ড আর্বান ইনফরম্যাল সেক্টর। দীপ অ্যান্ড দীপ পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

# একক ৩ ❑ যুব সমস্যা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ যুবক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা

৩.৩.১ বিচ্ছিন্নতার কারণ

৩.৪ যুব অসন্তোষ

৩.৪.১ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য

৩.৫ ছাত্র আন্দোলনের কারণ

৩.৫.১ ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন

৩.৫.২ যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ ঃ পদ্ধতি ও উপায়

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ৩.১ উদ্দেশ্য

যে কোন সমাজের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। সাধারণত ষোল থেকে একুশ বছর এই বয়সসীমার মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত, আমরা তাদের যুবক বলে অভিহিত করি। শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবনী শক্তিতে পূর্ণ যুবসম্প্রদায় হচ্ছে সমাজের চালিকাশক্তি। কিন্তু এই যুবসম্প্রদায় সমাজের অন্যান্য অনেকের মতোই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমাজের প্রচলিত নীতি, কর্তৃত্ব এসবের সঙ্গে অনেক সময়ই তারা মানিয়ে চলতে পারে না; ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় Alienation বা বিচ্ছিন্নতা। সমাজে বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলার অক্ষমতার জন্য প্রকাশ পায় অসন্তোষ এবং এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে।

## ৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, সেগুলি হল—

- ✪ যুব সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়?
- ✪ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
- ✪ কিভাবে যুব অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?
- ✪ ভারতবর্ষে সংঘটিত ছাত্র-আন্দোলন?
- ✪ যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উপায়।

## ৩.৩ যুবক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা

আমাদের সমাজে যুব সম্প্রদায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার অন্যতম হল বিচ্ছিন্নতা। সাধারণত Alienation বা বিচ্ছিন্নতাকে নগরায়িত শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে ভাবা হয়। একসময় যৌথ পরিবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক, পারিবারিক নিরাপত্তা মানুষকে মানসিকভাবেও পূর্ণতা দিয়েছিল। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের স্রোত মানুষের জীবনে নিয়ে এল অনেক সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য। এই পরিবর্তনের একটি নেতিবাচক দিকও ছিল। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাথমিক সম্পর্ক বিনষ্ট হল—যৌথ পরিবার ভেঙে গড়ে উঠল একক পরিবার। ফলে শহরের মানুষের ভীড় ও কোলাহলের মধ্যে মানুষ একা হয়ে পড়ল। এই একাকীত্ব তার মধ্যে এক ধরনের 'বিচ্ছিন্নতা' সৃষ্টি করল। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ তারমধ্যে এমন একটি মানসিকতার জন্ম দিল সে মনে করতে লাগল সমাজের মূলস্রোত থেকে সে একা। ফলে সে বিচ্ছিন্ন। যুবক সম্প্রদায়ের মনে এই বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কোন কোন কারণ সক্রিয় ছিল এখন আমরা তার অনুসন্ধান করতে পারি।

### ৩.৩.১ বিচ্ছিন্নতার কারণ

যুবকদের মনে যে একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমরা আগের অনুচ্ছেদে জানলাম। কিন্তু কেন এই বিচ্ছিন্নতার অনুভব জন্ম নিচ্ছে, এই অনুচ্ছেদে তার কারণগুলিকে অন্বেষণ করব। প্রথমত বলা যায় নগরায়ণের ফলে নিজের বাসভূমি থেকে পরিযাণ নিয়ে যেসব যুবক শহরে চলে এসেছে কিংবা চলে আসতে বাধ্য হয়েছে—তারা নগরজীবনের ব্যস্ততা, কোলাহল বা যান্ত্রিকতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি—ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা একাকিত্ব গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, যুবা বয়স মানুষের জীবনের এমন একটি পর্যায়, যখন সে নিজের আদর্শ, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গড়ে তোলে। কিন্তু যখন সে দেখে বাইরের পৃথিবীটা, বাস্তব জগৎটা তার ভাবনা থেকেই অনেকটাই আলাদা এবং সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে তাঁর ধ্যান-ধারণার তেমনভাবে মেল বন্ধন ঘটছে না তখন যুবকেরা হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশা থেকে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়। সে নিজেকে কারুর সঙ্গে একাত্ম করতে পারে না। তৃতীয়ত, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পরিবার ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে, গড়ে উঠেছে একক বা অণু পরিবার। যৌথ পরিবারের নিশ্চিত আশ্রয়ে তরুণেরা একসময় যে মানসিক নিরাপত্তা ও হৃদয়ের উষ্ণতা পেত আজকের একক পরিবারের সেই নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই এর ফলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তরুণদের যোগাযোগের অভাব (Communication gap) সৃষ্টি হয় সেই প্রেক্ষিত থেকে যুবকদের মনে একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিতে পারে। চতুর্থত, পরিবর্তিত অর্থ সামাজিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য, কর্মের সুযোগের অভাব, নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং সর্বোপরি সমাজের রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আদর্শহীনতা এবং অনুসরণ করার মতো কোন ''রোল মডেলে'র (Role Model) এর অনস্তিত্ব এই সব কারণ যুবা সম্প্রদায়ের মনে একাকীত্ববোধ বা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, বিচ্ছিন্নতার উৎস হিসাবে সমাজের অধিক মাত্রায় ঐক্যবদ্ধতা এবং অতি-সাংগঠনিকতাকে নির্দেশ করা যায়। অবশ্য এই অভিমত হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক টি. কে. ওম্যানের (T. K. Oommen)। ওম্যান তার ''স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া'' গ্রন্থের ''ইন্ডিয়ান ইয়ুথ ঃ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অপর্চুনিটি'—নামক একটি বিশেষ অধ্যায়ে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত হল বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয় হল একটি মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। সমাজে বাস করেও সে এই প্রক্রিয়াগুলির শরিক হতে পারে না, ফলে সে বিচ্ছিন্নতা বোধের শিকার হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যুবসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুসারে ওম্যান তাদের তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ স্বাধীনতাহীন (The unemancipated), ক্রিয়াশীল (The activists) এবং নিযুক্ত (The disengaged)।

স্বাধীনতাহী বা unemancipated যুবকদের সাধারণত ভারতবর্ষের গ্রামীণ এলাকায় দেখা যায়। এরা শিক্ষিত নয় এবং এদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ। বৃহত্তর সমাজ এবং সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। নিজেদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে এরা সন্তুষ্ট। এমনকি, সমাজে নিজেদের কর্তব্য এবং অধিকার কতটা, সেই সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা নেই। এই ধরনের যুবকদের মধ্যে আলোকপ্রাপ্তি (enlightenment) ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা ও নিজেদের দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ activists বা ক্রিয়াশীল যুবকেরা সাধারণত ভারতের বড় বড় শহর ও নগরগুলিতে এবং শহরাঞ্চলে বাস করে। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ গ্রাম থেকে পরিযাণ নিয়ে শহরে বা নগরে এসে বসতি গড়েছে। ফলে শহরের বাসিন্দা হলেও এদের শিকড় রয়ে গেছে গ্রামে। নগরায়ণের স্রোত অনুসরণ করে এরা 'নাগরিক' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্য বা পরম্পরা এরা বিস্মৃত হতে পারেনি। ফলত এরা আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্যগত সংঘাতের শিকার হয়েছে। টি. কে. ওম্যান এই 'ক্রিয়াশীল যুবকদের' সম্পর্কে বলেছেন, এরা হচ্ছে এমন একটি প্রজন্ম, যাদের মধ্যে না আছে দৃঢ় মতাদর্শ কিংবা শুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিক জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় এদের ক্ষমতা বা শক্তি তেমনভাবে কার্যকরী নয়।

তৃতীয় ধরনের অর্থাৎ disengaged বা বিযুক্ত যুবকেরা ভারতীয় সমাজে আত্মপরিচয় অন্বেষণকারী। এরা নিজেদের সমাজে rootless বা শিকড়হীন। এরা সমাজের বিদ্যমান নীতি ও মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে। এরা প্রতিবাদী, বিদ্রোহ করতে চায়, কিন্তু এদের কোন মতাদর্শগত কার্যপদ্ধতি নেই। অথচ এদের যোগ্যতা আছে, এরা শিক্ষিত এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। ওম্যানের মতানুযায়ী, এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যুবসম্প্রদায়ের অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা খুবই হতাশাজনক, কারণ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এরা নিজেদের বিযুক্ত করে রেখেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে।

ওম্যান যে বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুযায়ী যুবসম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন ভিন্ন কারণের ফলশ্রুতিতে যুবসম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতা বা অন্বয়ের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যুবসম্প্রদায় হচ্ছে সমাজের একটা বড় অংশ এবং এরাই সমাজের চালিকাশক্তি, তাই বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করে সমাজের মূলস্রোতে যদি তারা ফিরে আসে, গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাহলে সমাজের উন্নতি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

## ৩.৪ যুব অসন্তোষ ঃ সংজ্ঞা

অসন্তোষ বলতে বোঝায় কোন কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা যখন যুব অসন্তোষ নিয়ে আলোচনা করব, তখন আগে জানা দরকার "যুব অসন্তোষ" বলতে কী বোঝায়? সমাজতাত্ত্বিকরা 'যুব অসন্তোষ' বা Youth Unrest' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যখন যুবসমাজ সমাজে প্রচলিত নীতি বা আদর্শকে অকার্যকরী বা ক্ষতিকারক মনে করে, তখন তারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে। এই অগ্রাহ্য করার মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলন ঘটে 'যুব অসন্তোষের'। অধ্যাপক রাম আহুজার মতে, যুব অসন্তোষ হল "সমাজে যুবকদের সার্বিক হতাশার বহিঃপ্রকাশ" (manifestation of collective frustration of the youth in the society)। অধ্যাপক আহুজা বলেছেন, সমাজের বিদ্যমান নীতি নিয়মগুলি যুবসম্প্রদায়ের মনোনীত না হওয়ার জন্যে তারা আহত হয়। সমাজ সম্পর্কে তাদের যে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বিনষ্ট হয়। তখন বিরক্ত আর হতাশ যুবকেরা অনুভব করে যে যুগের উপযোগী নতুন নীতি ও নিয়ম গড়ে উঠুক। রাম আহুজা একটি ডায়াগ্রাম বা অনুচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন—

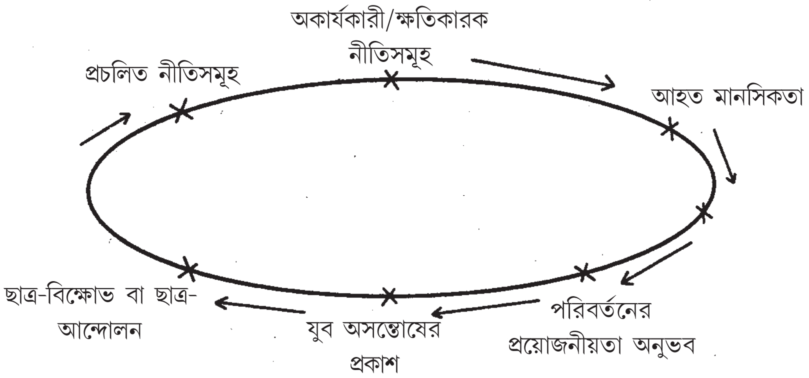


### ৩.৪.১ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য

উল্লিখিত যুব অসন্তোষের সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা যুব অসন্তোষের কতগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি, যেমন—(১) অকার্যকরী পরিস্থিতি বা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক অবস্থা (২) যৌথ প্রতিবাদ, (৩) পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং (৪) বিদ্যমান নিয়ম ও নীতিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা।

অন্যভাবে যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা যেতে পারে, যেমন—

(ক) সমাজে যে অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, এই বিষয়ে যুবসম্প্রদায়ের সচেতনতা এবং এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুবকদের প্রতিবাদমূলক আচরণ;

(খ) যুব সমাজের মধ্যে যে হতাশা, বঞ্চনা ও অসন্তোষ ঘটছে তার উৎস খুঁজে বের করার বিষয়ে যুবকদের সার্বিক বিশ্বাস ও প্রবণতার বৃদ্ধি এবং বিস্তার।

(গ) প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে যুবকদের সংগঠিত হওয়া এবং যুবকদের মধ্যে নেতত্বের উদ্ভব।

(ঘ) কোন বিশেষ উত্তেজনাপ্রবণ ঘটনাকে ভিত্তি করে যুবসমাজের যৌথ প্রতিক্রিয়া।

যুব অসন্তোষ ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই ছাত্র আন্দোলনের বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে পারি। কর্তৃত্বের বিপক্ষে যাওয়া, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতি ও নিয়ম কিংবা প্রচলিত আদর্শ এবং আরোপিত নিয়ন্ত্রণ যখন ছাত্র সমাজ মানতে পারে না, তখনই তাদের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আন্দোলনের মাধ্যমে। 'যুব সম্প্রদায়' বলতে আমরা ষোল থেকে একুশ এই বয়ঃক্রমকে নির্দেশ করছি। এই ১৬-২১ বয়সসীমার পরিধির মধ্যে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজ যখন আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়ে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করছে, তখন তার মধ্যে কি যুবকসম্প্রদায়ের অসন্তোষের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি না? সুতরাং, যুব অসন্তোষ ও ছাত্র আন্দোলনের বিষয়টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা ছাত্র আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের পর্যালোচনায় যুব অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটেছে, সেই সম্পর্কেও আমরা অবহিত হব। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার কারণ।

## ৩.৫ ছাত্র আন্দোলনের কারণ

ছাত্র আন্দোলনের পশ্চাতে সক্রিয় যে ছাত্র বিক্ষোভ বা ছাত্র অসন্তোষ, তা কেন ঘটে?—এই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঘনশ্যাম শাহ তার ''সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া'' (Social Movements in India) গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যে generation gap বা প্রজন্মগত ব্যবধান এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। ষোল থেকে একুশ এই বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে শারীরিক মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই বিক্ষোভ বা অসন্তোষের মাধ্যমে ছাত্রদের সমাজের সঙ্গে নেতিবাচক একাত্মতা প্রকাশ পায় বলে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ মনে করেন। ভারতবর্ষের মতো পরিবর্তনশীল ও বহুত্ববাদী সমাজে ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রচলিত আদর্শ, নীতি-নিয়ম, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গ্রহণ করা প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিযুক্ত কমিটি, ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে সক্রিয় আচরণের তিনটি ধরন (type) নির্দেশ করে—(১) শিক্ষক সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন; (২) সহপাঠী ছাত্রীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার এবং (৩) প্রাতিষ্ঠানিক সম্পত্তি ধ্বংস। এই তিন ধরনের ছাত্র বিক্ষোভের কতকগুলি কারণ এই কমিটি তুলে ধরেছিল, যেমন—

(ক) ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিগুলি পরিবর্তনের দাবী,

(খ) ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব,

(গ) গ্রন্থাগারে পুস্তকের অভাব, পরীক্ষণাগারে গবেষণার যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা,

(ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন হ্রাস করা এবং মেধাবৃত্তি বৃদ্ধি করার মতো অর্থনৈতিক দাবি

(ঙ) এছাড়া আরও কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

যোসেফ ডিবোনা (J. Dibona) উত্তরপ্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভের প্রকৃতি নিয়ে সমীক্ষা করেন এবং ছাত্রবিক্ষোভের তিনটি কারণ চিহ্নিত করেন। যেমন—(১) অর্থনৈতিক কারণ ঃ ভবিষ্যতের জন্যে ছাত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চাহিদার (দেশের মধ্যে একটি ফাঁক প্রত্যক্ষ করছে অর্থাৎ তারা মনে করছে, শিক্ষাগ্রহণ ভবিষ্যতে তাদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে তেমন সহায়ক নয়।

(২) সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণ ঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের মধ্যে রয়েছে ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, উপযুক্ত সংখ্যক কলেজ, পঠিতব্য বিষয় ও বিভাগের অপ্রতুলতা, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার অভাব, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি, অদক্ষতা ও দুর্নীতি এবং সর্বোপরি ছাত্রসমাজের স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা ও সাফল্য অর্জনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক।

(৩) রাজনৈতিক কারণ ঃ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে কলেজের প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনা। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে।

এইসব কারণগুলি নিয়ে আলোচনার পর আমরা বলতে পারি যে, ছাত্র বিক্ষোভ, ছাত্র অসন্তোষ এবং আরও ব্যাপকভাবে যুব সমাজের অসন্তোষের কারণ ও উৎস যুবসম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্বের ত্রুটি নয়, এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা (Social System)।

অধ্যাপক রাম আহুজা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ ধরনের যুবক সাধারণত বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে; যেমন—(১) সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন (Socially isolated), (২) ব্যক্তিগতভাবে সংগতিহীন (Personally maladjusted); (৩) পরিবারের সঙ্গে বিযুক্ত (Unattached to family), (৪) প্রান্তিক যুবক (marginals) এবং (৫) সচল বা পরিযাণশীল যুবক। অধ্যাপক আহুজার মতে, যেসব যুবক সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ব্যক্তিগতভাবে সমন্বয়হীন, পরিযানশীল এবং প্রান্তিকতায় অবস্থান করে, তারা খুব সহজেই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে প্রণোদিত হয়।

বি. ভি. শাহ (B. V. Shah : 1968) গুজরাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর একটি সমীক্ষা চালান। তিনি ছাত্রদের চারভাগে ভাগ করেছেন—(১) উচ্চমর্যাদা ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, (২) নিম্নমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন, (৩) নিম্নমর্যাদা ও নিম্নযোগ্যতাসম্পন্ন এবং (৪) উচ্চমর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন। শাহ তাঁর সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা অর্থাৎ নিম্নমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররাই বেশিমাত্রায় ছাত্রবিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় ও চতুর্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নিম্ন মর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং উচ্চমর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অনেক অল্প মাত্রায় বিক্ষোভে যোগ দেয়। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা সাধারণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ছাত্রবিক্ষোভে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাই পারিবারিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## ৩.৫১ ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন

আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছাত্র-আন্দোলনের কারণ পর্যালোচনায় আমরা দেখলাম যে সাধারণত ষোল থেকে একুশ এই বয়ঃক্রমের যুবকদের মনে প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও আদর্শ সম্পর্কে যখন আস্থা বা

বিশ্বাসভঙ্গ হয়, তখন তারা আর এগুলিকে গ্রহণ করতে চায় না। তাদের মনে যে অসন্তোষ বা ক্রোধ বা ক্ষোভ জমা হয়, তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছাত্র বিক্ষোভ বা সংগঠিত ছাত্র বিক্ষোভ বা সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা যদি প্রাক্ স্বাধীনতা পর্যায় থেকে ভারতবর্ষের নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেক্ষিতে ভাবি, তাহলে দেখব এই সব আন্দোলনে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যারা 'শহীদের' শিরোপা পেয়েছেন তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ছিলেন তরুণ সংগ্রামী, যেমন বিনয়, বাদল, দীনেশ, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ। তবে এই আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অংশগ্রাহী হিসেবে, তারা স্বতন্ত্রভাবে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করেন নি। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছাত্ররা নিজেদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। যেমন—১৯৫৩ ও ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অশান্তি ঘটে। হায়দ্রাবাদের ছাত্ররা তেলেঙ্গানা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ এর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে গুজরাটে ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে যায় এবং জরুরী অবস্থার সময় ছাত্ররা বিহারের কংগ্রেস সরকারের স্থায়িত্বকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

'৮০ এর দশকেও গুজরাটে ছাত্রদের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে রাণে কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করে গুজরাট সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সংরক্ষণ কোটা বাড়িয়ে দেয়। বর্ধিত কোটা ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ২৮ শতাংশ। ফলে সাধারণ ছাত্র ও যুবকদের জন্যে মাত্র ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ বহির্ভূত থাকে। ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয় এবং সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়। এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুজরাটে হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ, দলিত ও উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংঘাত ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল। ছাত্রদের এই আন্দোলন প্রায় দু'মাস ধরে চলেছিল যতক্ষণ না সরকার এই সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সংরক্ষণের প্রশ্নে ভারতবর্ষে সংঘটিত অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন "Anti Mandal Agitation" নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে ১৯৯০ সালের ৭ই আগস্ট তৎকালীন জনতা সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে ও.বি.সি (OBC) ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে সরকারি চাকরির ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই ঘোষণা যেন বারুদের বাক্সে অগ্নি সংযোগ করে। ছাত্ররা তীব্রভাবে এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। প্রথমে বিক্ষোভ আন্দোলন আরম্ভ হয় দিল্লিতে, পরে তা উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল অন্য আন্দোলনের থেকে একেবারেই আলাদা। অনেক ছাত্র গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেয় এবং অনেকে দেবার চেষ্টা করে। ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে সরকার এই সংকটকে মোকাবিলা করতে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কংগ্রেস সরকার তাদের নতুন সংরক্ষণ নীতি ঘোষণা করার পর ছাত্র-যুবকদের হতাশা ও বিক্ষোভ অনেকটা পরিমাণে প্রশমিত হয়।

উত্তরপ্রদেশে পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র ও যুবকরা সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল পরে তা স্বতন্ত্র 'উত্তরাখণ্ড' রাজ্য গঠনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়।

'৮০ এর দশকে আসামে পূর্ববাংলা থেকে আগত শরণার্থী সমস্যা নিয়ে 'All Assam Students Union' (AASU) যে আন্দোলন সংগঠিত করে ছাত্র আন্দোলনের আলোচনায় তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্যতার দাবি করে।

### ৩.৫.২ যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ ঃ পদ্ধতি ও উপায়

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা জানলাম যুব অসন্তোষের কারণ। জানলাম যুব অসন্তোষের প্রতিফলিত রূপ হিসাবে কিভাবে ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। সেসব কারণের জন্যে অসন্তোষ বাড়ছে, বিক্ষোভ ও আন্দোলন হচ্ছে—তার শিকড়গুলিকে সমাজের মাটি থেকে উপড়ে ফেলা সহজ কাজ নয়। তাই সমাজতাত্ত্বিকেরা বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। তারা ভেবেছেন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে যুব অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোন উপায় গ্রহণ করলে যুব অসন্তোষকে প্রশমিত করা যায়। আলোচ্য অনুচ্ছেদে সমাজতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি উপায়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে; যেমন—

(১) যুব সম্প্রদায় সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্পনাবিলাসী এবং প্রতিবাদী হয়। তাদের উৎসাহ বা উদ্দীপনা, ক্রোধ ও উত্তেজনা যাতে সঠিক পথে চালিত হয় অভিভাবকদের সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। বয়সোচিত তাদের মনের প্রক্ষোভগুলিকে প্রশমিত করার দায়িত্ব হচ্ছে অভিভাবকদের বিশেষ করে পিতা-মাতার।

(২) অভিভাবক ছাড়া ছাত্র ও যুবাদের সমস্যার বিষয়ে নজর দিতে হবে শিক্ষক সমাজকেও। তারা অবশ্যই তাদের সমস্যাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং সমাধান করতেও সচেষ্ট হবেন।

(৩) এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে। ছাত্রসমাজের অসুবিধাগুলি দূর করার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নজর দিতে হবে।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্ধারণে ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনের ছাত্রদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

(৫) ছাত্রসমাজকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একটি সাধারণ ব্যবহার বিধি মেনে চলবে।

(৬) প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে নানাধরনের কাজ যেমন, সমাজসেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করা হবে।

(৭) যুব সম্প্রদায় এবং ছাত্রসমাজকে বোঝাতে হবে তারা বৃহৎ সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ। তাই সমাজে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। যুবা বয়স থেকে তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য সচেতন হয়, তাহলে তারা নিজেদের অনন্বিত বা বিচ্ছিন্ন মনে না করে সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতিতে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্রসমাজের মনে আশা, বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তখন তারা নিজেদেরকে নিজেরাই সঠিক পথে চালিত করতে পারবে।

## ৩.৬ সারাংশ

যুব সমস্যা বিষয়ক এই এককে প্রথমেই আমরা পরিচিত হয়েছি 'যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা'র ধারণার সঙ্গে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন, পরিবারের ভাঙন যুবক সম্প্রদায়ের মনে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব জন্ম নিচ্ছে তারই ফলশ্রুতিতে যুবকেরা বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের শিকার হচ্ছে। এছাড়া, পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সমাজের চতুর্দিকে আদর্শহীনতা, দারিদ্র্য, কাজের সুযোগের অভাব এসব কারণও যুবকদের মনে অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে। বিচ্ছিন্নতার উৎস হিসাবে সমাজের অত্যন্ত বেশি মাত্রায়

ঐক্যবদ্ধতা ও অতি সাংগঠনিকতাকে নির্দেশ করা যায়, সমাজতাত্ত্বিক টি. কে. ওম্যানের অভিমত অনুসরণ করে। বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও যুব সমাজের আরেকটি সমস্যা হল যুব অসন্তোষ বা 'Youth Unrest'। যখন যুবসমাজ সমাজে বিদ্যমান নীতি ও আদর্শকে অকার্যকরী ও ক্ষতিকারক মনে করে অগ্রাহ্য করে তখন সেই মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় 'যুব অসন্তোষের'। যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে বিষয়গুলি নির্দেশ করা যায়, সেগুলি হল—(১) অকার্যকরী পরিস্থিতি বা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক অবস্থা (২) যৌথ প্রতিবাদ (৩) পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা ও (৪) প্রচলিত নিয়ম ও নীতিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা। যুব অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটে ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষের মতো পরিবর্তনশীল এবং বহুত্ববাদী সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অগ্রহণযোগ্যতার ফল হিসাবে দেখা দেয় ছাত্রবিক্ষোভ ও সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলন। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে ছাত্ররা আন্দোলন ও বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। তবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র আন্দোলন হিসাবে ১৯৮৫ সালে গুজরাটের ছাত্র আন্দোলন, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া, All Assam Students Union কর্তৃক সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনও (আসামে) উল্লেখযোগ্য। যুবসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং এই ধরনের প্রক্ষোভের উৎসগুলিকে উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। তবে কিভাবে অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার কতকগুলি বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন সমাজতাত্ত্বিকগণ। এই বিকল্প পথগুলিকেই আমরা যুব অসন্তোষ বা বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

## ৩.৭ অনুশীলনী

**১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)**

(ক) যুব সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়? বিচ্ছিন্নতার কারণগুলি নির্দেশ করুন।

(খ) ছাত্র আন্দোলনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(গ) ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**২। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)**

(ক) যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুযায়ী টি. কে. ওম্যান যুবসম্প্রদায়ের যে শ্রেণীবিভাজন করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণের উপায় ও পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

**৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটি ৬ নম্বর)**

(ক) যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়?

(খ) যুব অসন্তোষ কাকে বলে?

(গ) যোসেফ ডিবোনা ছাত্র-বিক্ষোভের কী কী কারণ নির্দেশ করেছেন?

(ঘ) বি. ভি. শাহ-এর ছাত্রদের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে লিখুন।

(ঙ) 'Anti Mandal Agitation' বা মণ্ডল কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন সম্পর্কে কী জানেন?

(চ) যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণের যে কোন তিনটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## ৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—সোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ ১৯৯৯।

২। ওম্যান টি. কে— স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, স্টাডিজ ইন নেশন বিল্ডিং; সেজ পাবলিকেশনস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

৩। গোরে এম. এস—এডুকেশন অ্যান্ড মডার্নাইজেশন ইন ইন্ডিয়া, রাওয়াত পাবলিকেশনস্, জয়পুর, ১৯৮৩।

৪। শাহ্ ঘনশ্যাম—সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া : এ রিভিউ অব দ্য লিটারেচার, সেজ পাবলিকেশনস্, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

## একক ১ ❑ নারী নির্যাতন ও বৈষম্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ নারী নির্যাতন

১.৪ নারী নির্যাতনের প্রকার ও প্রকৃতি

১.৫ সারাংশ

১.৬ নারী বৈষম্য

১.৭ নারী বৈষম্য : সামাজিক ভিত্তি

১.৮ নারী বৈষম্য : প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

১.৯ সমাধানের উপায় ও মূল্যায়ন (বিধিব্যবস্থা)

১.১০ সারাংশ

১.১১ প্রশ্নাবলী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১.১৩ পরিসংখ্যান

## ১.১ উদ্দেশ্য

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে নানা ধরনের পরিকাঠামোগত এবং আন্তঃমানবিক সম্পর্কীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন যে, এই মডিউলের সম্পূর্ণটাই বৃদ্ধ সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পরিবেশ সমস্যা এবং নারী সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে।

আলোচ্য এককে আমরা সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা, বিশেষভাবে ভারতীয় নারীদের অবস্থা পর্যালোচনা করব। প্রভেদের দিক থেকে নারীদের পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখব। এছাড়া, নারীদের মর্যাদাগত পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও এখানে আলোকপাতের চেষ্টা করব। এমনকি সামাজিক স্তর বিন্যাসের গঠনগত দিক থেকে সমাজের কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, পিতৃতন্ত্রের ধারাবাহিকতা, নারী বৈষম্যের ধারাবাহিকতাও এই সূত্রে দেখব। যে সমস্ত উৎপীড়নের সম্মুখীন নারীদের হতে হয়, যেমন, ধর্ষণ, যৌন উৎপীড়ন, অত্যাচার,

গৃহবিবাদ, অত্যাচার, গৃহবিবাদ, পণসংক্রান্ত মৃত্যু, বেশ্যাবৃত্তি, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি, সেই বিষয়গুলির ওপরও আলোকপাত করা হবে। নারীদের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে রাজ্যের এবং সমাজের মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যুত্তরগুলি কীরূপ, তা এই এককে প্রকাশ্যে পর্যালোচনা করা হবে।

## ১.২ প্রস্তাবনা

আমাদের সমাজে নারীদের ওপর উৎপীড়ন এবং নারী বৈষম্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করার আগে আমাদের প্রচলিত সমাজে লিঙ্গা বৈষম্যের ওপর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলি কিরূপ, সে সম্পর্কে একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতাত্ত্বিকগণ মূলতঃ যৌন চিহ্নিতকরণের চারটি প্রণালী বা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে থাকেন : (ক) জৈব জাগতিক দিক থেকে প্রাথমিক এবং যৌন শারীরিক প্রলক্ষণ (traits) গুলিকে প্রত্যক্ষ করে কোনো ব্যক্তিকে জৈবিক দিক থেকে পুরুষ এবং নারী হিসাবে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা। (খ) লিঙ্গা পরিচিতি অথবা যৌন সম্পর্কিত আত্ম-পরিচিতি। (গ) প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার ভিত্তিতে পুরুষ এবং নারীদের আচরণ, (ঘ) যৌন ভূমিকা, শ্রম বিভাজন, যৌনতা অনুসারে দায়িত্ব এবং কর্তব্য ইত্যাদি। যদিও সমাজের সাধারণ ধারণা হল, এগুলি পারস্পরিক ভাবে সংবদ্ধ থাকে, তা সত্ত্বেও প্রায়শই এরা একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে।

লিঙ্গা চিহ্নিতকরণের বিষয়টি তিনটি প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভরশীল থাকে : (১) প্রতিরূপীকরণ (modelling), অথবা প্রাপ্তবয়স্কের আচরণের অনুকরণ, (২) পুনর্বলিয়ানকরণ (reinforcement), বা যে আচরণ শিশুদের লিঙ্গা অনুসারে যথাযথ তা উৎসাহিত করা এবং যে আচরণগুলি তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, তা নিবারণ করা। (৩) আত্ম-সামাজিকীকরণ, যা হল শিশুর সেই সকল আত্ম-পরিচিতির চর্চা করা, যেগুলি অপরের বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া লাভ করবে।

সমাজ মূলত সামাজিক ভূমিকার পৃথকীকরণে যৌন বিষয়টি উল্লেখ করে থাকে। এটি কেবল জৈব জাগতিক দিক থেকেই পৃথক করা হয় না। যেমন, পুরুষের দীর্ঘ আয়তন এবং নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা। নারী পুরুষের ভিন্নতার প্রকৃতি অসংখ্য, কিন্তু আমাদের যৌন ভূমিকায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খলের তুলনায় প্রচলিত সমাজের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, লিঙ্গা বৈষম্যের বিষয়টিকে বুঝতে গেলে তার অভিজ্ঞতামূলক এবং তত্ত্ববিষয়ক দিকগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। অতএব লিঙ্গা সংক্রান্ত প্রশ্ন, মানবজাতি সম্বন্ধীয় বিষয়, যৌনতা এবং অক্ষমতার বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে। মারগারেট মীড (Margaret Mead, 1935) এ সম্পর্কে বলেন, প্রতিটি সংস্কৃতি জীবনধারার কতকগুলি দিককে গুরুত্ব দেয়, আবার কতকগুলি দিক বর্জন করে। যদিও প্রতিটি সংস্কৃতি পুরুষ এবং নারীর ভূমিকাকে কতকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক পথ ধরে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, তাই বলে পৃথকীকরণের ফলে পারস্পরিক বৈপরীত্য বা একের প্রতি অন্যের প্রভুত্ব বা দমনমূলক আচরণ সমর্থন করে না।

যৌন ভূমিকা পৃথকীকরণ বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। যৌন ভূমিকা সংক্রান্ত কার্যনির্বাহী তাত্ত্বিকরা এরূপ মনে করেন যে, আধুনিক পরিবার ব্যবস্থায় সহায়কের ভূমিকা পালনের জন্য একজনকে প্রয়োজন, যিনি পরিবার এবং বহির্জগতের সঙ্গে মধ্যস্থতা করেন। একজনকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হয়, যিনি পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি সুরক্ষিত করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা তাকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্বগুলি নিতে বাধ্য করে এবং স্বামীকে উপার্জনকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়।

তুলনামূলকভাবে, দ্বন্দ্ববাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী পুরুষ এবং অনুসরণকারী গোষ্ঠী নারীদের

পারস্পরিক যৌন সংক্রান্ত অসমতাই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। তাঁরা একথাও মনে করেন যে, পুরুষদের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে, কারণ পুরুষেরা আকৃতিতে নারীদের তুলনায় দীর্ঘ ও সবল। তাই যৌন তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনায়াসেই তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো নারী পুরুষের অনুগত হবে কিনা, তা নির্ভর করে—

(ক) স্ত্রীর যাবতীয় সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে;

(খ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রেক্ষিতে নারী কতখানি মূল্যবান।

নব্য মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিকদের মতে, দুটি পরস্পরবিরোধী লিঙ্গ সম্পর্ক হল, কর্তৃত্বকারী পুরুষদের সঙ্গে অধীনস্থ নারীদের সম্পর্ক। কিন্তু এই অসাম্যের ভিত্তি নিহিত ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে, যৌন সম্পর্কের মধ্যে নয়। তাই তাঁরা মনে করেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কতকগুলি জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধনতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে। এই ভাবেই ধনতন্ত্র বাজারে নমনীয়তা গড়ে তোলে।

নারীবাদী ঐতিহ্য অনুসারে পরিবর্তনকামী নারীবাদ ব্যক্তিগত অধিকার, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। এই ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করা থেকে নারীদের প্রতিরুদ্ধ করে সামাজিক কিছু বাধা। নারীদের এই অবনমিত অবস্থান কাটিয়ে উঠতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আইনগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চরমপন্থী নারীবাদের মতাদর্শে নারীর ওপর পুরুষের সামাজিক কর্তৃত্ব পিতৃতন্ত্রের নানা যন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়; যেমন অত্যাচার, যৌনতা/ইতররতি প্রবণতা (heterosexuality), নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে পুরুষেরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে নারীদের ওপর উৎপীড়নের জন্য দায়ী।

দুটি সাধারণ তত্ত্ব—মনোপর্যালোচনা (Psychoanalysis) এবং আধুনিক কাঠামোতত্ত্ব (Post structuralism) ক্রমশ ভাষা, সংস্কৃতি এবং আলোচনার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে তুলছে। এর ফলস্বরূপ নারীদের ক্ষেত্রে 'পৃথক' (difference) শব্দটি নানা অর্থ এবং মাত্রা পেয়েছে। 'পৃথক' অর্থে এখন আর কেবলমাত্র নারীদের অভিজ্ঞতার পার্থক্য বোঝানো হয় না, উত্তর-আধুনিকতা একই সাথে নারী ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত ভিন্নতার ওপর আলোকপাত করে। এই সকল তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা নারী উৎপীড়নের উদ্দেশ্য হিসাবে যে কোনো একটি কারণকে স্বীকৃতি দেওয়ার রীতি বর্জন করে। যেমন, পুরুষের অত্যাচার অথবা প্রভেদকারী আইন। নারী এবং পুরুষের মতো এবং সম্পর্কসমূহ কতখানি সমরূপধর্মী, এই নিয়ে নানা যুক্তিতর্ক রয়েছে। আবার নারীদের অভিজ্ঞতা যে সর্বদাই নঞর্থক এবং পুরুষরাও যে সর্বদা বিরুদ্ধাচরণ করেন, সে কথাও ঠিক নয়।

সমাজতাত্ত্বিক অন্তদৃষ্টির বিস্তারিত পর্যালোচনার পর আমরা লিঙ্গসম্পর্কিত বিষয়টির ওপর একটি ধারণা লাভ করতে পারি। কিন্তু নারী পুরুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ধারণা কেবলই কোনা তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, এই ধারণা সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই বিভাগীয় বক্তব্যের শেষে আমরা লিঙ্গ বৈষম্যর ভিত্তি সম্পর্কীয় পর্যালোচনা করব।

লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলি, যা নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, তা সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রয়োজনের অধিক সরলীকৃত। এই অপরিবর্তনীয় ধারণাগুলি আমাদের পুরুষ ও নারীর কাটভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করে, এবং একই সঙ্গে তাদের পরম্পরাগত (traditional) ভূমিকা আমাদের মনে লিঙ্গভিত্তিক বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যদিও পরম্পরাগত লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলির আরোপিত সীমাবদ্ধতা নিয়ে উভয় লিঙ্গেরই অভিযোগ রয়েছে, তবু সেগুলি প্রচলিত ও সচল। আজও পুরুষরাই কাজের খোঁজে বাইরে যান, আর নারীরা সন্তান প্রতিপালনসহ পরিবারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করেন। এই লিঙ্গ বৈষম্যের প্রেক্ষিতে আজও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নারী এবং পুরুষের লিঙ্গ সংক্রান্ত ভূমিকা সাম্যহীন। আবার লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও লাঞ্ছনা এখনও বর্তমান, যদিও আজকের সমাজে নারীরা অপেক্ষাকৃতভাবে পুরুষদের সাথে অনেক বেশি সমতা (equality) ভোগ করেন।

## ১.৩ নারী নির্যাতন

উপরোক্ত অংশের পর্যালোচনায় আমরা নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছি। যেখানে নারীদের ওপর উৎপীড়ন এবং প্রভেদের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এই উৎপীড়ন ও প্রভেদের অন্যতম কারণ হল, পুরুষদের ক্ষমতা ও মর্যাদাগত দিক থেকে শীর্ষে থাকার ভ্রান্ত প্রবণতা, যার ভিত্তি হল যৌন পার্থক্য এবং লিঙ্গাভিত্তিক তথাকথিত ধারণা।

সাধারণত এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে, নারীদের ওপর পুরুষদের অত্যাচার কিছু অসুস্থ অথবা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হতবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই কাজ। এমনকি এইসব পুরুষেরা নারীদের দ্বারা সাধারণত প্রলুব্ধ হয় বা তাদের উত্তেজিত আচরণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এমনও মনে করা হত যে, পুরুষদের নারীদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন, যেগুলির কর্তা গৃহের বাইরে যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি। এমনকি নারীদের উপর প্রতিনিয়ত যে অত্যাচার হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যানগত বিবরণ কোথাও নেই। এর কারণ, আজও বহু নারী পুলিশের কাছে তাদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ দেন না কারণ বহু সময় অত্যাচারী তাদের পরিচিতি। এমনকি অনেক সময় ঘটনার তদারকি করতে পুলিশ বিমুখ ও অনিচ্ছুক থাকে, কারণ সেগুলি একান্ত পারিবারিক। যদিও স্ত্রীদের ওপর যৌন উৎপীড়নকে আজকের সমাজও সঠিক গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু এর দ্বারা নারীর জীবনে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং সদা বর্তমান সমস্যাকে চিহ্নিত করা যায়।

যৌন উৎপীড়ন সরাসরি নারীদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, কারণ সামাজিক দিক থেকে নারীদের দেহকে যৌনতার অর্থেই ব্যবহার করা হয়। নারীদের ওপর যৌন সংক্রান্ত উৎপীড়নের মাধ্যম হল, হুমকি, অথবা শারীরিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করা, যা নারীর শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

যৌন উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে পুরুষেরা কেবল ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নারীদের শরীরকে ব্যবহার করে তাই নয়, এমনকি আবেগের দিক থেকে তাদের যন্ত্রণা দেয় এবং আঘাত করে। এগুলি হল যৌন ধর্ষণ, যৌন অত্যাচার, যৌনাঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি, শরীরে আঘাত, যৌন-লাঞ্ছনা, শিশুর যৌন নির্যাতন এবং পর্নগ্রাফি। নারী এবং যুবরীতর ওপর উৎপীড়নের এই মাধ্যমগুলি দেখলে বোঝা যায় যে পুরুষেরা যৌনতাকে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অস্ত্র হিসাবে, যার মাধ্যমে তারা নারীর স্বাধীনতাকে খর্বকরে তাদের জীবনের পরিধিকে সংকুচিত করতে চায়। অতএব যে ভাবেই হোক, তারা নারীদের বাধ্য করে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যবহার এবং নিয়মের মধ্যে বন্দী থাকতে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বলপ্রয়োগের হুমকি, এই দুটিই লিঙ্গাভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

## ১.৪ নারী নির্যাতনের প্রকার ও প্রকৃতি

বিগত অংশে আপনারা নিশ্চয়ই আলোচনার মুখ্য বিষয় অনুধাবনের সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সঙ্গে আমরা সমাজতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে কোন দিক থেকে এই বিষয়ের আলোচনা করব, তাও বুঝেছি। আসুন, আমরা এই অংশে নারীদের ওপর উৎপীড়নের ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করি।

ব্যুরো অফ্ পুলিশ রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (Bureau of Police Research and Development in India) নারীদের ওপর উৎপীড়নজনিত অপরাধকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

(১) ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের (Indian Penal Code) অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত অপরাধ—ধর্ষণ, অপহরণ বা বলপূর্বক অপহরণ, পণ সংক্রান্ত হত্যা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, রোমিওবৃত্তি (eye-teasing) এবং একুশ বছরের অন্তর্বর্তী যুবতীদের পাচার করা।

(২) স্থানীয় বা বিশেষ আইন অন্তর্ভুল অপরাধ : সতীপ্রথা, পণপ্রথা (dowry prohibition), নারীর দেহ ব্যবসা (immoral traffic), নারী দেহের অশালীন পরিবেশন (indecent representation of women).

নারীদের বিরুদ্ধে অনেক সময় অত্যাচারের উৎস সামাজিক বিশ্বাস ও মতবাদ থেকে হয় যেগুলি নারীর স্বাধীন সত্তা ও মর্যাদার অবনমন ঘটায়। নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতনকে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে নিম্ন উপায়ে বলা যেতে পারে—

(১) অপরাধমূলক অত্যাচার : ধর্ষণ, প্রতারণা, খুন, উৎপীড়ন, পাচার, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি।

(২) পারিবারিক উৎপীড়ন : বধূ নির্যাতন, পণ সংক্রান্ত মৃত্যু, যৌন উৎপীড়ন এবং বঞ্চনা (deprivation)।

(৩) সামাজিক অত্যাচার : বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভ্রূণহত্যা, প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত করা, সতীদাহকে সমর্থন করা এবং বলপূর্বক তা প্রচলন করা, পণ সংক্রান্ত অত্যাচার, কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন ইত্যাদি।

এখন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করব সেই সকল নারী উৎপীড়নের দিকে, যা সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত।

## (ক) ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা এবং উৎপীড়ন

ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা, নারীদের ওপর রোমিওবৃত্তি (eve-teasing), উৎপীড়ন এবং নির্যাতনের সাহায্যে পুরুষতন্ত্র মূলত নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায়। একই সঙ্গে এই বিশ্বাসকেও দৃঢ় করতে যায় যে, জীবনে নারীদের চলার পথে পুরুষের ওপর নির্ভরতা অবশ্যম্ভাবী। যৌন লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার যখন কর্মক্ষেত্রে ঘটে, সেক্ষেত্রে চাকরি হারানোর এবং সমাজে কলঙ্কিত হওয়ার ভীতিতে নারীরা সে সকল ঘটনাগুলি গোপন করেন। যৌন লাঞ্ছনা পুরুষের নানাবিধ আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়, যার কিছুটা শরীর সম্পর্কীয়, কিছুটা মৌখিক, আবার কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক। যেমন, কুমন্তব্য বা অশালীনভাবে মহিলাদের দিকে তাকানো, ঠাট্টা করা, অকারণ স্পর্শ করা বা সরাসরি যৌন সংসর্গের প্রস্তাব দান। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং যৌন উৎপীড়নের মধ্যে মূলত পার্থক্য এই যে, যৌন উৎপীড়ন কখনোই দুজনের সম্মতিপূর্বক নয়, উপরন্তু বিরক্তি এবং ভীতি উদ্রেককারী। ফলস্বরূপ মহিলারা বাধ্য হন, কার্যক্ষেত্র পরিবর্তন করতে। নারীদের পোষাক কখনোই তাদের শ্লীলতাহানি অথবা যৌন উৎপীড়নের কারণ হতে পারে না।

ধর্ষণ হল একটি উগ্র যৌন সংসর্গ, যা কোনো নারীর ওপর তার ইচ্ছা এবং মতামতের বিরুদ্ধে সম্পাদিত হয়। ধর্ষণ হল নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রদর্শন করে। এর দ্বারা নারীর অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা হয় এবং নারীকে একটি বস্তুতে পরিণত করা হয়। এর পাশাপাশি ধর্ষিতা নারী প্রচলিত সমাজে স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত এবং অবহেলিত হয়ে থাকেন, যার ফলে নারী এক চরম ব্যক্তিত্বহীনতা ও অপরাধবোধের শিকার হয়। আজও মুষ্টিমেয় ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ধর্ষণের কারণ যৌন বিকৃতি নয়। যা ভয়াবহ তা হল, এই ধরনের অসামাজিক ধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি দুঘণ্টায় ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও একটি করে ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটছে। আরও লজ্জাজনক বিষয় হল, ধর্ষিতাদের অধিকাংশই বারো বছরের অনূর্ধ্বা। এদের দুই তৃতীয়াংশ ষোল বছরের থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের সকলে কেবল দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত নয়, মধ্যবিত্ত মহিলারাও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের পুরুষ কর্মচারী দ্বারা যৌনগত দিক থেকে উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। জেলখানায় অবরুদ্ধ মহিলা অপরাধীরা পুরুষ কর্মচারীদের কাছে, হাসপাতালে মহিলা রোগীরা কর্মীবৃন্দের হাতে, পরিচারিকারা তাদের গৃহকর্তার কাছে এবং রোজ উপার্জনকারী মহিলারা মহাজন ও দালালদের হাতে ধর্ষিতা হন। এমনকি যারা বোবা, কালা, বিকারগ্রস্ত, অন্ধ এবং দরিদ্র, তারাও নিস্কৃতি পায় না।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণ বিভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে— (অ) পরিবারের অভ্যন্তরে (উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংগম, শিশুদের ওপর যৌন উৎপীড়ন, স্বামীর দ্বারা ধর্ষণ, যা আইনের চোখে স্বীকৃত নয়)।

(আ) জাতি ও শ্রেণীগত আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে ধর্ষণ (উদাহরণস্বরূপ, উঁচু জাতির কোনো পুরুষ দ্বারা নীচুজাতির কোনো নারীর ওপর যে ধর্ষণ, ভূমিহীন বেগার শ্রমিকদের (bonded labour) ওপর ভূস্বামীর দ্বারা ধর্ষণ।

(ই) শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং অরক্ষিত নারীদের ওপর যে ধর্ষণ।

(ঈ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধ বা রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী দ্বারা মিলিত ভাবে যে ধর্ষণ।

(উ) পুলিশি হেফাজতে (custody), হোমে (remand home), হাসপাতালে, কর্মক্ষেত্রে যে ধর্ষণ।

(ঊ) কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বিচ্ছিন্ন কোনো ধর্ষণ।

যে সকল নারীরা ধর্ষণের শিকার, তারা এই নিপীড়নের প্রভাব তিনটি স্তরে অনুভব করেন—মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও সামাজিক।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ষণের প্রভাব তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়—ধর্ষণের পূর্বে, ধর্ষণের সময় এবং ধর্ষণের পরে। ধর্ষিত হওয়ার ভীতি নারীদের মধ্যে বর্তমান সবসময়, সব জায়গায়, যা বয়স, স্বাস্থ্য, চেহারা, মানসিক অবস্থান এবং আশ্রয় নিরপেক্ষ। অতএব ধর্ষণ ক্রিয়া বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই নারীরা একটি মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, যা তাদের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে। বাস্তবিক অর্থে ধর্ষণ সমকালীন পরিস্থিতি হল এমন একটি মানসিক চাপ এবং কষ্টকর পরিস্থিতি, যেখানে থাকে অস্তিত্বের এক তীব্র সংকট। ধর্ষণের পরবর্তীকালে নারীরা বিচারব্যবস্থায় চরম অমানবিকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত রূপে চিহ্নিত হন, শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন প্রভৃতি। এগুলির সমন্বয়ে নারীর মনে গড়ে ওঠে এক অবিশ্বাস, যা তার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে।

ধর্ষণ রোধের ক্ষীণ চেষ্টার ফলে নারীরা নানাভাবে শারীরিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যা নির্ভর করে আঘাতের অবস্থান এবং প্রতিরোধের মাত্রার ওপর। ধর্ষণ সম্পর্কিত আঘাতগুলি মূলত ঘাড়ে, গালে, চিবুকে, উরু, বাহু, পায়ে, মেনকি যৌনাঙ্গভিত্তিক হয়ে থাকে, যা নানা শারীরিক সমস্যায় পরিণত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলি থেকে যথাযথ শুশ্রুষা এবং সহানুভূতি পাওয়া যায় না এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় নারীদের নিজেদের বহন করতে হয়। এই সব রোগিনীদের জন্য চিকিৎসার কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, এদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সহায়তাদানের জন্য পরিকাঠামোগত কোনো ব্যবস্থাও নেই, যা ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের মানসিক ভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতা এবং সমাজ উভয়ের উপরই একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা বিবাহিত বা অবিবাহিত, শিশু, প্রাপ্তবয়সক অথবা বৃদ্ধ, যেই হোক না কেন, ধর্ষণের প্রভাব প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন। যদি তিনি অবিবাহিতা হন, সেক্ষেত্রে তার আগামী দিনের বিবাহিত জীবনের সম্ভাবনা মুছে যেতে পারে। অপরদিকে বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে, এই ঘটনার পর বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ধর্ষিতার বয়স অনুযায়ী তার শারীরিক যন্ত্রণা এবং মানসিক দুর্বলতার ধরন এক এক প্রকার হতে পারে। যদি ধর্ষণের মধ্য দিয়ে তার প্রথম যৌনতাভিত্তিক অভিজ্ঞতা (sexual experience) সঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে ধর্ষিতার যৌন বোধ, সাধারণ জীবনধারা, অত্যাচার, অপমানের ধারণাগুলি বিকৃত হয়। এই ধর্ষণ স্থায়ীভাবে অপকৃত ব্যক্তিকে বিশ্বাসহীনতা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগায়, যার ফলে ধর্ষিতার স্বাধীন জীবনযাপন বিঘ্নিত হয়। তাই একাকী জীবনধারণের দিকেও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ধর্ষিতা নারী, যিনি সমাজের একটি কার্যনির্বাহী একক রূপে অবস্থান করেন, তিনি কর্মরতা বা মা, অথবা কন্যা, কিংবা স্ত্রী বা যতই সৃষ্টিশীল হোন না কেন, তার মানসিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক মাত্রায় থাকে। সামাজিক স্তরে ধর্ষণ পিতৃতন্ত্র, পুরুষের আধিপত্য, নারীর শোষণ এবং নারীর মর্যাদার অবনমনের চিত্র তুলে ধরে। আশ্চর্যজনকভাবে

ধর্ষণের পরবর্তীকালে সমাজের চোখে ধর্ষিতা এবং তার পরিবার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়। এমনকি প্রতিবেশী এবং তথাকথিত বন্ধুগোষ্ঠী এই অবস্থার চর্চা করে এবং গুজব ছড়িয়ে মজা পায়। এইরকম ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের সহযোগী মাধ্যমগুলি যেমন পুলিশ, বিচারব্যবস্থা বা চিকিৎসা কর্মী বা গণমাধ্যম, সংবেদনশীলতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্তের সাথে যে আচরণ করে থাকে, তা নেহাতই যান্ত্রিক। ফলে ধর্ষিতারা নীতিগত দিক থেকে জনগণ এবং সহযোগী মাধ্যমের কাছে নিরপেক্ষ বিচারের নামে দুর্নাম, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের শিকার হয়।

### (খ) পারিবারিক অত্যাচার বা নির্যাতন এবং পণ সংক্রান্ত মৃত্যু :

পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন হয়, যেমন, দুর্ব্যবহার, মারধোর, মানসিক অত্যাচার ইত্যাদি, যেগুলিকে পারিবারিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়, কিন্তু কখনোই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। এরূপ দেখা গেছে যে, পারিবারিক নির্যাতন সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই অবস্থান করে। এছাড়া, এই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিবাহের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে, স্ত্রীদের মৃত্যুর হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণত পণসংক্রান্ত মৃত্যু হিসাবে জানা যায়। গৃহ সংক্রান্ত অত্যাচার বলতে আমরা এমন কিছু আচরণের কতা বুঝি যার দ্বারা নারীর ওপর তার জীবনসঙ্গী ক্ষতিকর শারীরিক অত্যাচার করে। পরবর্তীকালে গবেষণার মাধ্যমে এই সংজ্ঞার বিস্তার ঘটে, যার ফলে অপব্যবহার, বৈবাহিক জীবনের ধর্ষণ (marital rape) অথবা আবেগগত এবং মানসিক উৎপীড়ন এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে নারীবাদী চিন্তাধারার অনুগামীরা এই সমস্যাকে নারীর ওপর তার জীবনসঙ্গীর বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ হিসাবে দেখে, যা কিনা শারীরিক, মানসিক বা যৌন সংক্রান্ত হতে পারে।

আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, পণ সংক্রান্ত মৃত্যু ও অত্যাচারের মুখ্য কারণ হল, যেখানে নারী স্বল্প পণ আনেন, কিংবা আদৌ কোনো পণ আনতে সক্ষম হন না। সেই নারীই তখন তার নিকট আত্মীয়-পরিজনের দ্বারা নির্যাতিত হন। এই নির্যাতনের মূল কারণ হল লোভ, যার কবলে পড়ে তারা নানা প্রকারে নারীর ওপর অত্যাচার করে। তার মাধ্যমে অধিক পণ আদায় করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই লোভ নারীর মৃত্যুর কারণ হয়, যা কিনা পরবর্তীকালে পুরুষকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে আবার পণ সংগ্রহ করার সুযোগ করে দেয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল যে, এই ধরনের ঘটনাগুলি সহজেই প্রতিরোধ করা যেত, যদি পিতা-মাতা অথবা আত্মীয়-স্বজন তাদের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্জন করে তাদের কন্যাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিত। উপরন্তু বিবাহ ভেঙে গেলে একটি মেয়ে এবং তার পরিবারকে সামাজিক চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই মেয়েটি তার পরিবারের কাছে অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পণপ্রথার অস্তিত্ব, প্রচলন এবং বিস্তার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পণ সংক্রান্ত মৃত্যু ক্রমশঃ ছোটো-বড়ো গ্রামে ও শহরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি মহিলা গোষ্ঠীর (women's group) দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার ফলে ১৯৮০ সালের প্রথমার্ধে তারা পণ সংক্রান্ত আইন (dowry act) সংশোধনের দাবি পেশ করেন। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে (Amniocentesis test) নিয়ে মূলত উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে নিয়মিত ভাবে শিশুর জন্মের পূর্বে তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে ভ্রূণহত্যা করা হয়, যাতে পরবর্তীকালে পণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

এমনও দেখা গেছে যে, প্রতিলোম (hypergamy) বিবাহের মাধ্যমে (নীচু জাতের নারী উঁচু জাতের পুরুষ) পণপ্রথার প্রচলন হয়। 'স্ত্রীধন' সংক্রান্ত ধারণার মাধ্যমে বিবাহকালীন সম্পদ বা সম্পত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যা ধীরে ধীরে পাত্রীপক্ষের দ্বারা পাত্রপক্ষকে দেওয়া পণপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। এই পণের ধরন যা কিনা সাধারণতঃ অস্থাবর সম্পত্তি হওয়া উচিত, তা পরবর্তীকালে স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যার ওপরে বিবাহিতা মহিলার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। উপভোগবাদের (Consumerism) ফলে নানারকম বৈদ্যুতিক সামগ্রী, আসবাব, যানবাহন ইত্যাদি

সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে পণের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছে। এই পণপ্রথা সাম্প্রতিককালে নিম্ন শ্রেণী ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে, যদিও পূর্বে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে এই প্রথার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পণপ্রথা সম্পর্কে বর্তমানে যে ধারণা প্রচলিত তা হল, পাত্রপক্ষের পরিবারকে একটি মেয়ের দায়-দায়িত্ব এবং নিরাপত্তার ভার বহন করার জন্য পণ দেওয়া হয় দায়ভার হিসেবে। এই প্রচলিত ধারণার ভিত্তি হল যে নারী উৎপাদনশীল নন, বরং একটি ভারগ্রস্ত বোঝা, যা স্থানান্তরিত হয় পাত্রের পরিবারে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ; (ক) তা নারীর বাইরে এবং অভ্যন্তরীণ জীবনের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে, এবং (খ) চাকুরিরতা নারী কেন পণ দিতে বাধ্য হন, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

এই চালচিত্রের পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন নারীকে আর উৎপাদনশীল, ব্যয়শীল সামগ্রী হিসাবে দেখা হবে না। সম্প্রদায়, প্রতিবেশী এবং নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে নারীর প্রয়োজন অধিক মাত্রায় সহযোগিতা। এমনকি একটি মেয়ের যে কোনো প্রকারে বিবাহের ওপর সমাজ এবং তার বাবা-মা যে অসামান্য গুরুত্ব দেয় এবং চাপ সৃষ্টি করে থাকে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। স্বতন্ত্র এবং অবিবাহিতা থাকার যে স্বাধীনতা, তার যথাযথ সম্মান এবং মূল্য দেওয়া উচিত। একক নারী যিনি স্বতন্ত্র জীবনযাপন করেন কিংবা বাবা মায়ের সঙ্গে বাস করেন, তাকে নিয়মের বিচ্যুতি হিসেবে না দেখে নিয়মের একটি ধারা হিসেবে দেখতে হবে।

গৃহ সংক্রান্ত নির্যাতনের আর একটি দিক হল বিধবাদের ওপর অত্যাচার, যা সমাজের নারীর মর্যাদাহানির একটি বিশেষ কারণ রূপে গণ্য করা যায়। বিধবাদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অবহেলা, বাচনিক কটু ভাষা, যৌন সংক্রান্ত অত্যাচার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার মতো নানা অত্যাচার প্রচলিত আছে। সাধারণত অল্পবয়সী বিধবারা যৌন লাঞ্ছনা, অপমান এবং শোষণের মতো নানবিধ নির্যাতনের শিকার হন, অন্যান্য বয়সের বিধবাদের চেয়ে অধিক মাত্রায়। ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং যৌনতা—এই তিনটি হল বিধবা নিযআতনের মূল কারণ। পরিবারে অবস্থিত পুরুষেরাই হলেন এই অত্যাচারের মূল প্রবক্তা। পরিবারের আয়তন, আকৃতি, এমনকি অবস্থার নির্বিচারে বিধবাদেরই একমাত্র এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সহ্য করতে হয়। সামাজিক নীতি এবং তার পরিচালনার ধরন অনুযায়ী বেশির ভাগ বিধবাই তার স্বামীর ব্যবসা, সঞ্চিত ধন এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন, যে কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে তাদের অত্যন্ত সহজেই ব্যবহার করে। একমাত্র বয়স, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানই বিধবাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতে পারে।

## (গ) পতিতালয় :

পতিতালয় নারীর মর্যাদা এবং সম্মান ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজের চোখে সে নষ্ট নারীতে পরিণত হয়। নারীর যৌনতার সামগ্রীকরণের প্রারম্ভ হয় তার যৌনতার দাসত্ব এবং বশীভূতকরণের মাধ্যমে। নগরাঞ্চল, যেখানে একক পুরুষ গ্রামাঞ্চল থেকে দেশান্তরিত হয়ে আসে, সেখানে পতিতালয় অনিয়ন্ত্রিত এবং অত্যন্ত প্রচলিত। এই সব ক্ষেত্রে পতিতালয় সমস্যা একটি পরিস্থিতিগত আবশ্যিকতা। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগত আবশ্যিকতা হল—(১) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, (২) দারিদ্র্য। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে সেই সব নারী অবস্থান করে যারা সমাজ কর্তৃক বহিষ্কৃত, যেমন, বিধবা, নিঃস্ব, পরিত্যক্তা এবং যারা প্রতারণা ও চতুরতার শিকার। যে সব মহিলারা ধর্ষণের পর পরিবার কর্তৃক বহিষ্কৃত, তারাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। নানাবিধ আইন মাধ্যম, যেমন ইম্‌মরাল ট্রাফিক ইন পারসনস্ প্রিভেনসান অ্যাক্ট (Immoral Traffic in Persons Prevention Act) যদিও প্রচলিত রয়েছে, তবুও এগুলি যৌনকর্মীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলেও উপভোক্তাদের (clients) অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়। উপরন্তু কার্যপ্রণয়ন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় না করে অপরাধের দণ্ড নির্ধারণ করার যুক্তি বা অর্থ কোনোটাই নেই। পতিতালয়ের পরিচালনা, রাজনীতিজ্ঞ এবং পুলিশের মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং চক্রান্ত বর্তমান, তা দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, বিচারালয়ের লিঙ্গভিত্তিক প্রতিরোধ এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো এই প্রান্তিক (marginalised)

নারীদের সমাজের মূল স্রোতে আনার বিপক্ষে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে ব্যবসা চলে আসছে মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। কিন্তু মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎকে সর্বনাশ ও নিয়তির পথে ঠেলে দিয়েছে এই ব্যবসা। বেশির ভাগ মহিলা যারা এই ব্যবসায় যুক্ত, তারা হল যৌন সংক্রান্ত ব্যাধি বা রোগের সূত্র, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল এডস্ (Aids)। অনুমোদনকারী সমাজ এবং তার উদার মনোভাব এই যৌন ব্যবসাকে সমাজের প্রতিটি কোণে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে 'আমি তোমার চেয়ে পবিত্র (holier than thou)'—এই ধারণাসম্পন্ন হয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবর্তে যৌন কর্মীদেরই এড্স রোগের সংক্রামক হিসাবে চিহ্নিত করি।

### (ঘ) যৌন উত্তেজনা বর্ধক নারীকেই প্রদর্শন (Pornography)

পর্ণোগ্রাফি নারীদের ওপর এক ধরনের অত্যাচার। এটি সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, যা কিনা সংস্কৃতির সব দিকগুলিকেও বিকৃত করেছে। এর উৎপত্তি পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা থেকে। পর্ণোগ্রাফি নারীর দেহকে পুরুষের অধিকৃত সামগ্রী হিসাবে চিত্রায়ণ করে এবং নারীর যৌনতাকে বস্তুগত, অশ্লীল ও অপমানজনক রূপে প্রদর্শন করে। পর্ণোগ্রাফি মধ্যেই রয়েছে নারী শোষণের ভিত্তি, কারণ এটি নারীকে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে দেখে এবং নারীর সাথে অপব্যবহার করাকে উৎসাহ দেয়। এমনকি পর্ণোগ্রাফি সাহিত্য, ম্যাগাজিন, হোর্ডিং, ছবি এবং চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়। বলা যায় তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার (right to freedom of expression) নামে আসলে নারীর মর্যাদার অবমাননা করে। এর ফলস্বরূপ একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিক প্রতিমূর্তি হিসাবে শক্তিশালী, আক্রমণপ্রবণ, তীব্র, দাম্ভিক পুরুষের জন্ম হয়, অন্যদিকে জন্ম নেয় বিনীত, বাধ্য এবং সহনশীল নারী, যাদের যৌন সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাস্তবে এই প্রতিচ্ছবিগুলি বাণিজ্যিক লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়।

### (ঙ) জাতিগোষ্ঠী :

জাতিগত মর্যাদায় দুর্বল নারীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। উচ্চ নেতৃত্বকারী জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সকল দুর্বল নারীরা বেশি করে একাকীত্ব বোধ করেন। নেতৃত্বকারী এবং দুর্বল জাতিগোষ্ঠীর মানসিকতার পার্থক্য নারীদের মধ্যে অনেকখানি। কারণ, অধিকাংশ তথ্য এবং গবেষণা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী এবং তাদের অভিজ্ঞতার ওপরই দৃষ্টিপাত করে। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, জাতিগোষ্ঠীগত অবস্থান এবং হীনম্মন্যতার কারণে দুর্বল সংখ্যালঘু জাতির নারীরা আইনী মাধ্যমগুলি থেকে সাহায্য নিতে বিমুখ থাকে, এমনকি যখন জীবননাশের চরম হুমকি কিংবা অন্যান্য ভয়ঙ্কর অপরাধও তাদের ওপর এসে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ দেখা গেছে যে, এই সমস্ত মাধ্যমগুলি কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলেও আইন পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকে, এমনকি এক এক সময় তারা নিজেরাই অপরাধে লিপ্ত থাকে।

## ১.৫ সারাংশ

এই পর্যন্ত আমরা পর্যালোচনা করেছি, আমাদের সমাজে নারীর মর্যাদা কতখানি এবং জানতে পেরেছি যে নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নির্দেশকগুলিও আমাদের সমাজে নারীর শোষণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই শোষণের ধরন অনুযায়ী সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর মহিলাদেরই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। নারীর ওপর যৌন অত্যাচার অত্যন্ত জটিল এবং আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি সদা বর্তমান বৈশিষ্ট্য। 'উৎপীড়ন' বলতে আমরা যা বুঝি তা হল এমন একটি পদ্ধতি, যা নারীকে কয়েকটি বিশেষ ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করে বা রুদ্ধ করে। পূর্ববর্তী অংশে আমরা নারী নির্যাতনের নানা ধরন, যেমন ধর্ষণ, যৌন উৎপীড়ন, পারিবারিক অত্যাচার,

পতিতালয়, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনার মধ্যে আমরা এই নির্যাতনগুলির নানাপ্রকার কারণ, প্রকৃতি এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করেছি। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে নারীদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা সমাজে নারীদের বৈষম্যকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করব।

## ১.৬ নারী বৈষম্য

যেখানে যৌনতা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক ও শারীরিক পার্থক্য নির্দেশ করে, সেখানে লিঙ্গ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সামাজিক নির্মাণকে বোঝায়। বস্তুত লিঙ্গকে কখনোই যৌনতার ভিত্তিতে বোঝা উচিত নয়, কারণ তার মধ্যে কোনো জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। লিঙ্গ ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, ব্যবহার ও সত্তাগুলির সৃষ্টি ও অর্থনিরূপণ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক সময়ের দ্বারা হয়। সেই অর্থে আমাদের লিঙ্গ পরিবর্তনশীল। আসলে, মানবসমাজে লিঙ্গভিত্তিক সংজ্ঞা ও মীমাংসা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে থেকে উঠে আসে।

নারীবাদীদের মতে, আমাদের যৌনতা এবং লিঙ্গ সম্বন্ধীয় ধারণা সামাজিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এই ধরনের ধারণা প্রকৃতি (প্রবৃত্তি) ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বকে অবারিত করে। সামাজিক জীবনে লিঙ্গভিত্তিক সচেতনতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নারীবাদীদের মতে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জটিলতা আমাদের এই সরল সত্যটিকে বুঝতে বাধা দেয়। তাঁরা মনে করেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক অস্তিত্ব তাদের ব্যবহারিক জীবনের আধার হয়।

মার্ক্সপন্থী নারীবাদীদের মতে, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। এঁদের মতে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ককে শ্রেণী সম্পর্কের অনুরূপ ধারণায় বিচার করা হয়, যেখানে স্ত্রীরা অসাম্য ও শোষণের সম্মুখীন হয়। এই মতবাদ স্ত্রী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের দরুন অসাম্যের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক প্রভেদের কারণ হল, এঁদের মতে, একের অপরের ওপর আধিপত্য। এই অসাম্য ও আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য সমাজে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত হয়েছে লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ। এই লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য স্ত্রী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেয়, কিন্তু অন্য সামাজিক বিষয়গুলিকে এই ধারণা গুরুত্বহীন।

এর অপরদিকে, উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের মতানুযায়ী, সাংস্কৃতিক আচার-বিচারের ভিত্তিতে নির্মিত হয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য। আমাদের জীবনাচরণে যেহেতু আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদকে গুরুত্ব দিই এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবন লিঙ্গভেদের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু আমাদের অস্তিত্ব ও বিশ্বাস লিঙ্গাভিত্তিক হয়ে পড়ে। অতএব এঁদের মতে, নারীত্বের পরিধি সমাজের ব্যবহারিক জীবনের ওপর নির্ভরশীল এবং অস্তিত্ব বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল।

অন্যান্য বিশ্লেষকদের মতে, বংশ এবং জাতিগোষ্ঠীগত বিষয়সমূহ এমন কিছু অভিজ্ঞতা এবং গুণগত পার্থক্য বয়ে আনে যা, যে কোনো লিঙ্গসম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বয়স, যৌনসত্তা, অক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কাঠামো গড়ে তোলে। তাই সমাজে নারীদের প্রতি লিঙ্গ বৈষম্য ও আধিপত্যকে সরলীকৃত ভাবে দেখা উচিত নয়। বর্তমান সমাজে কিছু সংখ্যক নারীদের দেখা যায়, যারা তাদের গোষ্ঠী আনুগত্য, শ্রেণীগত অবস্থান ইত্যাদির দ্বারা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পেরেছে। তাই সময় এসেছে সচেতন হওয়ার যে, নারী বৈষম্যের ধারণাটি অভিন্ন নয়, তার মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্য বর্তমান।

পূর্ববর্তী লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার অনেকগুলি কারণ আছে। যেমন আমরা বুঝতে পারলাম, লিঙ্গভেদ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। আমরা এও দেখলাম যে, যে কোনো ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, তা সে গণমাধ্যমই হোক বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই হোক, নারীরা নানাপ্রকার অসাম্য ও অবদমনের সম্মুখীন হয়।

## ১.৭ নারী বৈষম্য : সামাজিক ভিত্তি

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, প্রতিরোধক আইন থাকা সত্ত্বেও নারীদের প্রতি বিস্তর বৈষম্য বর্তমান। সামগ্রিক জীবনধারায়, যেমন, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, বা আবাসন, বা স্বাস্থ্য কিংবা সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নারীরা চিরাচরিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

এই অংশের পর্যালোচনায় আমরা ভারতীয় সমাজে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা ভারতীয় সমাজে নারীদের মর্যাদার সেই সূচকগুলি দিয়ে শুরু করব, যেগুলি তাদের অধীনস্থ অবস্থানের নির্দেশক। এরপর আমরা এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি ও সমাজে তা স্থায়িত্ব দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের সমাজে যেমন একদিকে নারীদের দেবীরূপে পূজার্চনা করা হয়, অপরদিকে তাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। এই ধরনের বৈপরীত্য আমাদের সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অন্তর্নিহিত। নারীদের সত্তা, স্বীকৃতি, স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা ও সম্প্রদায়ের ওপর অধিকার তাদের পরিবারের জাতি ও শ্রেণীমর্যাদার ওপর নির্ভরশীল। বৈবাহিক মর্যাদা ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা বা মাতৃত্ব সমাজে নারীদের প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক। বিবাহিত নারীদের মান-মর্যাদার উন্নতি তখনই হয়, যখন সে (পুত্র) সন্তান জন্ম দিয়ে মাতৃত্বের প্রমাণ দিতে পারে।

সমাজ ও পরিবারের মধ্যে নারীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকে ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাবিধ নেতিবাচক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি সংকুচিত আকার লাভ করে। যদিও বর্তমান কালে আমরা বিবিধ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, যেমন, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে; তবুও সামাজিক প্রাণী হিসেবে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্তি ও ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

### (ক) নারীদের প্রতি বৈষম্যের মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশিকাগুলি :

কোনো জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে আমাদের যৌন অনুপাত, জন্মহার, মৃত্যুহার, জীবনকালের দৈর্ঘ্য— প্রভৃতি সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করতে হয়। নারীদের ভারতীয় জনসংখ্যার অবস্থান বোঝার জন্য আমাদের মুখ্যতঃ যৌনহার ও মৃত্যুহার নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যৌনহারের মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যায় প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা বুঝতে পারি। মৃত্যুহারের গণনা বার্ষিক হারে প্রতিটি বয়ঃগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে প্রতি হাজার জন্মের অনুপাতে করা হয়। আয়ুষ্কাল অর্থে জীবনের দৈর্ঘ্যকে বোঝায়, যেটি নির্ণয় করার জন্য প্রতিটি বয়ঃগোষ্ঠী অনুযায়ী আমাদের সমসাময়িক প্রচলিত মৃত্যুহার লক্ষ্য করতে হবে। অধ্যায় শেষে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে জনসংখ্যায় নারীদের বৈশিষ্ট্য সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করা আছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

### (খ) সাক্ষরতার নিরিখে নারীদের প্রতি বৈষম্য :

শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিচার্য হয়ে থাকে। তা শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের

সহায়ক নয়, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে ও সামাজিক মর্যাদার ক্রমোন্নতিও ঘটতে পারে। সারণিবদ্ধ তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান সমাজে নারীরা উত্তরোত্তর শিক্ষিত হয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে।

### (গ) স্বাস্থ্য পরিবেশ ও নারী বৈষম্য :

বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নারী ও কন্যা সন্তানদের তুলনায় পুরুষ ও পুত্র সন্তানরা বেশি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা পেয়ে থাকে। সাধারণত নারী ও কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় না পৌঁছনো অবধি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয় না। উপরন্তু ভারতীয় সমাজে অধিকাংশ মেয়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে। দৈনন্দিন জীবনে তাই গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ করার জন্য তাদের অধিকতর শক্তি ক্ষয় হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যহানির একটি বিশেষ কারণ। স্বাস্থ্যপ্রকল্প ও বিভিন্ন বীমা প্রকল্পে সেই সব নারীদের জন্য কোনরকম বন্দোবস্ত দেখতে পাই না যারা চাষ-আবাদ, খননকার্য, গৃহপালিত উৎপাদন ব্যবস্থা; যেমন, বিড়ি তৈরি করা, ঠোঙা তৈরি করা, সেলাইয়ের কাজ করা, মশলা তৈরি করা ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত থাকে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর থেকে নানাবিধ বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এগুলি সম্বন্ধে নীতি নির্ধারক প্রবন্ধকদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। অদ্ভুতভাবে দেখা যায়, একই রোগের ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের প্রতি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যথেষ্ট সতর্ক, সংবেদনশীল ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করেন, সেখানে নারীদের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের আচরণের অভাব দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে আমরা এডস্ (AIDS)-এর কথা বলতে পারি। নারীদের ক্ষেত্রে এডস্‌ের (AIDS) উপসর্গগুলি সম্পর্কে জনগণ, স্বাস্থ্যকর্মী বা জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিতে সচেতনতা বাড়াবার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। এডস্ (AIDS)-এর এই ধরনের পক্ষপাতপূর্ণ সচেতনতা রোগনির্ণয় ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে, যা কি না নারী ও ও তাদের প্রিয়জনদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুরাসক্ত ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের নিরাময়ের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করি, কারণ এই নিরাময় প্রকল্পগুলি পুরুষদের দ্বারা প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বঞ্চনার রূপটি সবচেয়ে প্রকট। এই ধরনের বীমায় যেখানে একদিকে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রোগগুলি (উদাহরণ : ফুসফুসের ক্যান্সার) সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নারীদের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিশেষ উপসর্গ দেখা যায় (যেমন, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও অন্যান্য স্ত্রীরোগ) সেগুলিকে পর্যাপ্ত হারে বীমার আওতায় আনা হয় না।

### (ঘ) লিঙ্গ বৈষম্য ও কর্মসংস্থান :

কর্মক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ লিঙ্গভিত্তিক। বর্তমান সময়ে আমরা নারীদের অধিকতর বিভিন্ন ধরনের চাকরি করতে দেখতে পাই, যা তাদের মাতৃত্বের দায় ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম সামাল দিয়ে করতে হয়। তবু সমান অধিকারের নানাবিধ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও নারীদের কর্মক্ষেত্রে মাত্র কিছু বিশেষ ধরনের কাজে নিয়োগ, অসমান মজুরি ও অসমান কর্ম সময়ের সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের কর্মসংস্থানে ক্ষেত্রে আমরা আংশিক নিয়োগের হার বেশি দেখতে পাই। শ্রম বাজারে এই ধরনের বৈষম্যগুলিই শুধু লক্ষ্য করা যায় তা নয়, আমরা উল্লম্বন (vertical) এবং অনুভূমিক (horizontal) পৃথকীকরণও লক্ষ্য করি। স্ত্রী এবং পুরুষের কর্মনিয়োগ নির্দিষ্ট চাকরি ও কর্মসংস্থায় দেখা যায়। আবার, বিভিন্ন সংস্থায় পরিচালনার উপরিস্তরে শুধুমাত্র পুরুষের আধিপত্য সম্ভব হয়। কারণ পদোন্নতির ক্ষেত্রে নানাবিধ অবিধেয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন

নারীদের হতে হয়। পেশায় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য বেশ সংকুচিত। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এরূপ ধারণা বর্তমান যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের কর্মদক্ষতার অভাব আছে, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। যোগ্যতা ও দক্ষতা কোনো অংশে কম না হয়েও নারীদের বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, যা কিনা পুরুষদের প্রতি সমাজের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। সাধারণত কোনো বিষয়ে কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে, নারীদের ভাগ্য ও পুরুষদের সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের মানসিকতার জন্য কর্মক্ষেত্রে নারীদের সদর্থক বিচার বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ অপ্রয়োজনীয় ও অনাহূতের মর্যাদা পায়। অনুরূপভাবে, সম্পর্ক ও স্বার্থভিত্তিক যে গোষ্ঠীবদ্ধতা আমরা কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাই তা থেকে বেশির ভাগ সময় নারীদের সচেতনভাবে পৃথক করে রাখা হয়। সবশেষে আমরা কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অশালীন আচরণের উল্লেখ করতে পারি, যা সব ধরনের সংস্থা, এমনকি স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায়।

ভারতে নারীদের সামাজিক ভূমিকায় সবরকম গৃহস্থালীর কাজ করতে পারা অতি গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলি সাধারণত 'শ্রম' বা 'শ্রমিকের' সংজ্ঞার আওতায় আসে না, কিন্তু এই গৃহস্থালীর কাজগুলিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয় না। ১৯১১-এর আদম সুমারি অনুযায়ী ভারতে মেয়েদের মোট জনসংখ্যার ১৪.৪ শতাংশ শ্রমক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে বেশির ভাগেরা চাষ-আবাদ ও খনন কার্যে নিযুক্ত। ১৯৭৬ (1976) সালের সমান পারিশ্রমিক আইন (Equal Remuneration Act) থাকা সত্ত্বেও, পারিশ্রমিক, পদ, দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীদের বঞ্চনার শিকার হতেই হয়। শহরাঞ্চলের চাকুরিজীবী মহিলাদের কিছু বাঁধাধরা পেশায় নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়, যেমন শিক্ষিকা, নার্স, ডাক্তার, ক্লার্ক ও টাইপিস্ট। তবুও আজকাল আমরা মহিলাদের সাধারণত পুরুষকেন্দ্রিক পেশায়, যেমন, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, বিমান নির্মাণকারী, পুলিশ, পরিচালকবর্গের মধ্যে অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা ও বাধার জন্য তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়।

### (ঙ) লিঙ্গ বৈষম্য ও রাজনীতি :

বহু পশ্চিমী দেশের মতো ভারতবর্ষে নারীদের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতারা নারীদের প্রকাশ্যে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন। ১৯৩২ (1932) সালে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ও ১৯৩৬ (1936) সালে তাঁরা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। সেই সময় থেকে ভারতীয় নারীরা রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। যদিও আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাদের এম. পি. (M.P.), এম. এল. এ (MLA), রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি, তবুও অনুপাতের দৃষ্টিতে বিভিন্ন আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অতি নগণ্য। আসলে নির্বাচনের মতো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের নিষ্ক্রিয়তা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রভাব এর কারণ। যদিও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নারীরা পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার কল্যাণে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় রাজ্যস্তরে তাদের সংরক্ষণের বিষয়টি বিতর্ক হিসেবে রয়ে গেছে। তাদের বাম, ডান ও মধ্যপন্থী সব রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক ভাবে সঠিক প্রবচন শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই বিতর্কে উল্লম্ব ও অনুভূমিক ভাবে বিভক্ত। এমনকি যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান মহিলা, তাদের পক্ষেও এই বিতর্কিত নীতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। এমনকি চরমপন্থী দলগুলি যেগুলিকে আমরা বৌদ্ধিক ও মননশীলতার দিক থেকে সর্বাগ্রে মনে করি, তাদেরও পরিচালন সমিতিতে বা নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় না। স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের স্থান উপান্তেই থেকে গেছে। স্বাধীনতার পর কোনো সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে শতাংশের বেশি মহিলা প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় আইনসভায় আসতে পারেননি, এবং তাদের অস্তিত্ব পুরুষদের তুলনায় প্রতীকীই থেকে গেছে।

## ১.৮ নারী বৈষম্য : প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

আগের অংশে আলোচনার লক্ষ্য ছিল সমাজে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য দেখা যায়, তার বিভিন্ন সূত্রগুলির বিশ্লেষণ; যেমন জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও রাজনীতির ক্ষেত্র। এটুকু নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে যে, ভারতবর্ষে যে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ তার মর্যাদা, ভূমিকা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ণয় করে। এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি আমরা নারী বৈষম্যের কাঠমোগত ভিত্তিগুলি না আলোচনা করি। কাঠামোগতভাবে অবস্থিত লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকাশ পক্ষপাতপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই এই অংশে আমাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতিব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, শ্রেণীকাঠামো ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা ও কিভাবে এগুলি লিঙ্গ বৈষম্যকে চিরায়ত করছে, তা স্পষ্ট করা।

**(ক) জাতি ব্যবস্থা :** ভারতীয় সমাজে জাতিভিত্তিক স্তর বিন্যাস নারীদের অবদমনের প্রধান কারণ। এই অসাম্য আবার স্তরভিত্তিক জাতি ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। উঁচু জাতিদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা অনেক বেশি সংকুচিত। যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে আমরা যে লিঙ্গ বিভাজন দেখতে পাই, তা জাতি কাঠামোকে পুষ্টকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতীয় সমাজে গৃহস্থের ধর্মীয় ও আত্মিক পবিত্রতা রক্ষা করতে মুখ্যতঃ তিনটি আদর্শের কথা বলা হয়, নিরামিষ ভোজন করা, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা ও স্ত্রীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—(১) স্ত্রীদের স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং সেই সূত্রে তাদের ভূমিকা গৃহস্থালীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা, (২) সম্বন্ধ করে বিবাহ, শিশুকালে বিবাহ, একগামিতা ও বিবাহ বিচ্ছেদ অস্বীকার করে সমাজ স্ত্রীদের যৌনতা ও সত্তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে।

এই ধরনের নীতির দৃঢ়তা উচ্চজাতির মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল, তার কারণ এগুলির সাহায্যে তারা তাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলির ওপর তাদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠতার ধারণাকে চিরস্থায়ী করতে পারত। নীচু জাতিগুলি আবার এই ধরনের বৈষম্যমূলক নীতিগুলির আত্মীকরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হত। ফলত সম্পূর্ণ সমাজে নারীদের পক্ষে এই ধরনের নেতিবাচক নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এর ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হত না। পিতৃতন্ত্র, পিতৃকুল ও পিতৃবাসস্থানিক ব্যবস্থা ও বিশ্বাস, যেগুলিকে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি আবার বৈধতা দেয়, জাতি ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক ভিত্তিকে পুষ্ট করে।

**(খ) পরিবার ব্যবস্থা :** সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সদস্যরা আত্মীয়তা, ভূমিকা ও উত্তর-দায়িত্বের (responsibility) ভিত্তিতে সম্পৃক্ত। পরিবার প্রজনন ও সামাজিকীকরণের একটি একক, যা ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক করে তোলে। এই উপায়ে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা হয় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করা যায়। পরিবারের প্রজনন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে বংশ পরিচয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। বংশগতি দুধরনের হয়, পিতৃবংশানুক্রমিক ও মাতৃবংশানুক্রমিক। ভারতীয় সমাজে পিতৃবংশানুক্রমিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত পিতৃবাসস্থানিক ব্যবস্থা, যেখানে স্ত্রীকে বিবাহের পর স্বামীগৃহে বসবাস করতে হয়। পিতৃবংশানুক্রমিক ও বাসস্থনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে যে, স্ত্রী বা কন্যা স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে না পায়। আইন এই ধরনের বৈষম্যকে অবৈধ ঘোষণা করার পরেও এখনও আমরা দেখি পরিবারের (পুরুষ) কর্তার কাছে আশা করা হয় যে, আগে থেকেই আইনানুগ ব্যবস্থা করে শুধু উত্তর-পুরুষদের হাতে স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া হবে। স্ত্রীদের জন্য মাত্র গয়নার মতো সামান্য কিছু অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ রাখা হয়, কিন্তু তা আবার পণপ্রথার মতো দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা সৃষ্টি করে। আসলে এই ধরনের সামাজিক পরিণতি পিতা-মাতাকে কন্যা সন্তান জন্মালেই চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে এবং তার ফলে শিশু কন্যার ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাবিধ হীনম্মন্যতা ঢুকে যায়।

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পুত্র সন্তান অধিকতর কাম্য বলে নির্দেশিত হয়। পুণ্যার্থে পুরুষকে তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করে পুত্র সন্তান উৎপাদন করতে হবে যাতে বংশ রক্ষা হয়, পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ তর্পণ করা যায় ও পূর্বপুরুষরা মোক্ষ লাভ করে। এখানে স্ত্রীদের ভূমিকা শুধুমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া অবধি। এই ধরনের স্তর বিভক্তিকরণ, স্ত্রী এবং পুরুষদের মধ্যে, সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। যে কারণে আমরা সমাজে ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীনতা, অধিকার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে দেখি। পরিবারের ঐক্যসাধন যেহেতু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য এই ধরনের বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা দীর্ঘকাল থেকে স্থায়ী হয়ে গেছে। পরিবারে স্ত্রী-পুরুষের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হওয়ায় অসাম্য স্বাভাবিক বাস্তব হিসেবে গণ্য হয়।

**(গ) সামাজিকীকরণ :** সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শ, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে লিঙ্গ বৈষম্য। সামাজিকীকরণ শিশুকাল থেকে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সময় পরিবার ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে হয়, যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং পেশাগত সংস্থা। কিন্তু সমাজে নারী-পুরুষ সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হওয়ার ফলে সামাজিক ভূমিকা ও আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাম্য বজায় থেকে যায়। পরিবারের মধ্যে পুত্র সন্তানদের সামাজিকীকরণ এমন ভাবে করা হয়, যাতে তারা বলবান, আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অপরদিকে কন্যা সন্তানদের প্রথম থেকেই গৃহকর্মে নিপুণা ও মস্তিষ্কের বদলে দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই কন্যা সন্তানদের স্বাধীন সত্তা ও আত্মসম্মানবোধ অনেকটাই হীনবল হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নরীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যমূলক রীতিগুলির আচারনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দেয় এবং আনুষ্ঠানিক স্থায়িত্ব দেয়। প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলি নারীদের এই ধরনের রীতি ও প্রত্যাশিত ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। গণমাধ্যমগুলি নারীদের চিরাচরিত রক্ষণশীল প্রতিরূপে উপস্থাপিত করে লিঙ্গ বৈষম্যকে সামাজিক চেতনায় স্বাভাবিক স্তরে নিয়ে আসে।

**(ঘ) শ্রেণী কাঠামো ও পেশাভুক্ত নারী :** মানব সমাজে শ্রেণী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীভিত্তিক স্তর বিন্যাস উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জাতি কাঠামো পরস্পর সংযুক্ত, যা কিনা শ্রেণী কাঠামোতেও বর্তমান, তাই গ্রামাঞ্চলে নারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও উঁচু থেকে নীচু জাতিগত বিভেদ দেখা যায়। তুলনায় শহরাঞ্চলে আরোপিত মর্যাদা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ এখানে পেশা কৃষিভিত্তিক নয়। শহরের মধ্যে শ্রেণী গঠন মূলত উচ্চজাতির মানুষ করে। শিক্ষা ও কর্ম নিযুক্তির সাহায্যে এই শ্রেণীর মহিলারা গত একশো বছরে আপেক্ষিক ভাবে স্বাধীন ও মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তারা এখনো অসচেতন ভাবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে গেছে। আসলে জাতি কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গভিত্তিক স্তর বিন্যাসের ওপরেই শ্রেণী কাঠামো গড়ে উঠেছে। পরিবারগুলি শ্রেণী কাঠামোয় নারী শিক্ষা ও কর্ম নিযুক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদা আহরণ করার জন্য। পরিবারের এই উপার্জনকারী নারীদের, সমাজ শিক্ষিত স্ত্রী, মা ও উপার্জনকারী সদস্যের ভূমিকা দিয়েছে মাত্র। 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, পরিবারগুলি নারী শিক্ষা ও উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের পরিবারগুলিতে নারী শিক্ষার ধরন, মান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুত এই উপায়ে পরিবার নারীদের কর্মনিযুক্তির প্রকার ও স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে উপার্জনের পাশাপাশি তারা পরিবারের অভ্যন্তরে তাদের পরম্পরাগত ভূমিকা পালন করতে পারে।

**(ঙ) আইন, নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র :** যে কারণে আমরা এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, তা হল, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নীতিগতভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাদের নাগরিকদের ওপর বৈধ, তাই সচেতনভাবে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুযায়ী তারা নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু সমাজে অবস্থিত লিঙ্গ বৈষম্যের ভাবধারা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকা ও পরিষেবা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেহেতু রাষ্ট্র পরিবারগুলিকে

এক-একটি সুসংবদ্ধ একক হিসেবে দেখে, তার মধ্যেকার প্রভেদগুলিকে উপেক্ষা করে, সেহেতু আশা করা হয় যে পরিবারের মধ্যে সম্পদের সমান বণ্টন হবে। কিন্তু তা হয় না, কারণ প্রায় সবসময়ই নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু পরিবার, সম্প্রদায় ও বৃহত্তর সমাজে সেবা-যত্নের দায়িত্ব সাধারণত মহিলাদের ওপর থাকে, যার কোনো স্বীকৃতি না থাকায় সরকার সহজেই বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। এর ফলে সমাজে রীতিসিদ্ধ লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন আরও শক্তিশীল হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক ভাবে যে নীতিগুলির ভিত্তিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলি তাদের পরিকল্পনাগুলি নির্ধারণ করে সেগুলি প্রতিনিয়ত অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আগে কল্যাণমূলক নীতিগুলি এই আশা করত যে সমাজে সব পুরুষ উপার্জনকারী হবে, অধিকাংশ নারী নিয়মিত চাকরি থেকে বিরত থাকবে এবং তারা স্বামীদের ওপর জীবন নির্বাহের জন্য নির্ভরশীল হবে। এর দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হবে। কিন্তু গত দশকেরও বেশি সময় থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীরা উত্তরোত্তর নিয়মিত চাকরিতে যোগ দিচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে যচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই 'এক-অভিভাবক' পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে সব মহিলা কল্যাণমূলক পরিষেবার দ্বারস্থ হয়, তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উপরন্তু তাদের পরিবারে প্রথাগত ভূমিকা পালিত না হওয়ায় অবশ্যম্ভাবীভাবে মর্যাদাহানিও ঘটে থাকে।

আইনের চোখে নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও তার সংস্থাগুলি নারী বৈষম্য প্রতিকারের বিষয়ে অত্যন্ত শ্লথ ও উদাসীন, বেশির ভাগ আইন বস্তুত লিঙ্গ বোধহীন এবং লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সংবেদনশীল নয়। তাই বারংবার নারীদের আইনী অধিকার ও সুরক্ষা লঙ্ঘিত হয় ও তারা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের স্থান, মযাদা ও ভূমিকা সর্বাগ্রে থাকে এবং নারীদের একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়।

পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে আজও আমরা দেখি, সমগ্র দেশে মুখ্য রাজনৈতিক ধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের হার তুলনামূলকভাবে নগণ্য। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ লিঙ্গভিত্তিক নাগরিকত্ব। নাগরিক হিসাবে যে সব অধিকার ও দায়িত্ব রাষ্ট্র দেয়, তা নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান নয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে যে, সমাজে দুর্বল স্থানে থাকার দরুণ নারীদের নাগরিক হিসাবে নানাবিধ অধিকার ও দায়িত্ব অর্জন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর এবং এখনও কিছু কিছু বিষয়ে তারা একেবারেই বঞ্চিত।

উপরিলিখিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলির পুনর্মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, সামগ্রিকভাবে নারীরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এখনও বঞ্চিত। বহুল সংখ্যায় যৌন অত্যাচার, ধর্ষণ, নির্যাতন ও অশালীনতা প্রদর্শনের ঘটনাগুলি প্রমাণ করে, ভারতীয় সমাজে এখনও কিভাবে নারীদের ব্যক্তিসত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং স্বাধীনতা খণ্ডিত হয়। আইন, কোর্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতার পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে। এখনও যখন মহিলাদের উপদেশ দেওয়া হয়, কী ধরনের বস্ত্র পরিধেয় বা কখন কোথায় যাওয়া উচিত, যাতে কিনা পুরুষদের কুনজরে না পড়ে। তার থেকে স্বভাবতই নারীদের নাগরিকত্বের প্রকৃতি ও পরিধি কিরূপ, তা সহজেই অনুমেয়। নাগরিক সমাজে নারীদের অবস্থানের অপর একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, তাদের পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। 'অস্বীকৃত' গৃহকর্মে নারীদের শুধুমাত্র সময়, শ্রম ও শক্তি ব্যয় হয় তাই নয়, সামাজিক অর্থে তাদের নাগরিক সত্তার অবনমনও ঘটে। তাদের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণও ব্যাহত হয়।

নারী বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ, কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব আলোচনা করার পর এর পরের অংশে আমরা এই সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি খুঁজতে চেষ্টা করব, বিধিবদ্ধ যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব এবং নতুন উপায়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব।

## ১.৯ সমাধানের উপায় ও মূল্যায়ন (বিধিব্যবস্থা)

গত তিন দশকে সরকারি ও বেসরকারি দুই স্তরেই নারী নির্যাতন ও বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে, সরকারি নীতি গ্রহণের ফলে ও আত্মসচেতন নারী আন্দোলনের উদ্ভব হওয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় সমাজে নারীদের অবস্থানের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। পরিণতিস্বরূপ ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে যে সব আইনি পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি কিন্তু রক্ষণশীল ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকেই হয়। জাতীয় স্তরের নেতারা নারী অধিকারকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করতেন। এই সময় নারীদের অনেকগুলি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। যেমন, উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৯১৭), ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান উইমেন (১৯২৬), অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (১৯২৭)।

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান নীতিগতভাবে নারীদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে নারীদের উন্নয়মূলক কর্মসূচিগুলির মুখ্য লক্ষ্য ছিল তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিকাশের ব্যবস্থা করা। নারী আন্দোলনগুলিও এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয় ও নারীদের সংগঠিত করে। এই আন্দোলনগুলি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেন্দ্রিক ছিল। এবং এগুলি চালনার দায়িত্ব কর্মরত মহিলা ও সমাজসেবীদের হাতে ছিল। 'মানুষী' এই ধরনের প্রচেষ্টারই ফল। অবিরত আলোচনাচক্র, সম্মেলন ইত্যাদির সাহায্যে এই সংস্থাগুলি নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন পরিবারের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের জন্য নারীমুক্তি আন্দোলনগুলিকে প্রধানত আমরা চারটি রূপে সংগ্রাম করতে দেখি—

(ক) তাদের সংগঠিত ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালাতে দেখি, যাতে নারীদের ব্যক্তিসত্তা বলিষ্ঠতর হয়, যৌন-স্বাধীনতা রক্ষা পায় ও সমাজ কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অংশীদারিত্ব বাড়ে।

(খ) তাদের আমরা শ্রমিক সংঘ গঠন করে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অবস্থান ও জীবনের মান উন্নয়ন করতে দেখি।

(গ) সংগঠিত ভাবে তারা গৃহস্থালীতে নারীদের প্রতি অবিচার, বৈষম্য, নিগ্রহ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে, যাতে লিঙ্গভিত্তিক আদর্শের পরিবর্তন করা যায়।

(ঘ) তাদের আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখি।

বিভিন্ন কমিশন (যেমন, ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন ১৯৯১), কমিটির (যেমন, কমিটি অন স্টেটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া, ১৯৭৪) সুপারিশ এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ও নারীকল্যাণ সংস্থাগুলির অনবরত দাবির ফলে সাম্প্রতিক কালে আমরা কিছু পরিকল্পনার (যেমন, ন্যাশানাল পারস্পেকটিভ প্ল্যান ফর উইমেন, ১৯৮৮-২০০০) প্রণয়ন ও অন্যান্য কিছুর কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সরকারকে দেখছি। নতুন আইন প্রণয়ন করে বা পুরনো আইনে পরিবর্তন এনে বহুবিবাহ, সতীদাহ, পণপ্রথা, ধর্ষণ, নারীদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। লাঞ্ছিত মহিলাদের ন্যায়ের নামে হেনস্থা হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আইনের মধ্যে যে সব ত্রুটির ফাঁক, বিচ্যুতি ছিল সেগুলির সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণ, অশালীন আচরণ ও প্রদর্শন এবং দেহব্যবসা রুখতে এখন প্রমাণের দায় অপরাধীর ওপরে আইন করে চাপানো হয়েছে। যদিও পরিস্থিতির আরও উন্নতি দরকার, তবুও সামাজিক নীতিবোধ ও বিবেক বিনষ্ট না হয়ে যায় তার দিকে আইন ও আদালত নজর দিচ্ছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে অনেকগুলি আন্দোলনের চাপে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়কারী পরীক্ষা এখন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৭৩-এর ইক্যুয়াল রেমুনারেশান অ্যাক্ট পুরুষ এবং নারীর একই কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক এবং কর্মনিয়োগ ও পদোন্নতিতে সমান অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। নারীদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩০ শতাংশ উপকৃত মহিলাদের হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নারীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ডেভেলপমেন্ট অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন ইন রুরাল এরিয়াস নামে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জহর রোজগারী যোজনার মতো কর্মসূচিতে ৩০ শতাংশের মতো কাজ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

এত সব হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সমস্যা থেকেই গেছে। যেমন, শিশুকন্যা শ্রমিকদের শোষণ, কন্যাশিশুদের ধর্মার্থে দেবদাসী বা মাতাজী রূপে উৎসর্গ করা, পরিবার পরিজনদের দ্বারা যৌন নির্যাতন। উপযুক্ত আইনি, শিক্ষাগত বা আর্থ-সামাজিক সুযোগ যদিও এই ধরনের সমস্যা নিবারণ করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দিক থেকে সদিচ্ছার অভাবে আমরা পরিকল্পনা ও প্রণয়নের মধ্যে ফাঁক থেকে যেতে দেখছি। যেমন, ভারতবর্ষে সমরূপ ন্যায়-সংহিতা (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) প্রণয়ন করার বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি কখনোই সচেষ্ট হয়নি, পাছে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। আবার সমাজে বিভিন্ন অদৃশ্য বৈষম্য বর্তমান, যেগুলির শিকার নারী। পরম্পরাবদ্ধ ভারতীয় সমাজে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে, নিয়মিত কর্মক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বঞ্চনা এখনও যে প্রতীয়মান তার একটি মুখ্য কারণ ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত অসংগতি। একাধারে সংবিধান সাম্য প্রতিষ্ঠার্থে জন্ম, কুল, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করেছে, অপরদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করেছে। নারীদের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি বিশাল বড় প্রতিবন্ধকতা। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনগুলি ধর্মীয় আদর্শনিষ্ঠ, যেগুলি আবার নারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার দেয় না। ফলত ধর্মীয় স্বাধীনতা নারীকে অবদমিত রাখতে আচার-আচরণের সাহায্য নেয়। বস্তুত আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ লিঙ্গভিত্তিক অসাম্যকে বজায় রাখে। লিঙ্গ সাম্য ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও কার্যকরী সামাজিক পদক্ষেপ। শুধু আইনের দ্বারা সমাজে সদর্থক কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য পারিবারিক কাঠামোকে আরও গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে, আর্থিক সম্পদের সমভাবে বণ্টন করতে হবে, নারীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে, তবেই বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। যদিও রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জনগণের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে লিঙ্গভিত্তিক চেতনা রয়ে গেছে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা পাবে ও অর্তনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে। গত পঞ্চান্ন বছরে ভারতীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, যদিও সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই আইনের দ্বারা সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তনের অভাবে এখনও আইনের সাহায্যে (যেমন, উইল করে) মেয়েদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা দেখা যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, আইন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। স্থাবর সম্পত্তির ওপর নারীদের বাধ্যতামূলক অধিকার, তাদের উৎপাদনকারী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ দেবে। এর পাশাপাশি তাদের জন্য ঋণের ও উৎপাদন বর্ধক পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি আরও কার্যকরী হবে যদি আমরা নারীদের জন্য পাবলিক সার্ভিস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি। ঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে যদি নারীদের শিল্প-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় বা সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া বা নিয়োগ করা যায় বা শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ করা যায় কিংবা তাদের জন্য নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সমাজে অনেকটাই সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করা যাবে।

সমাজ থেকে নারী বৈষম্য দূর করতে পারলে মানব সভ্যতা ব্যাপক সুফল লাভ করবে, কারণ তবেই আমরা একটি মানবাধিকার পুষ্ট সংস্কৃতি স্থাপন করতে পারব, যা সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদের মান উন্নয়ন করে সাধারণ জীবনের গুণমান বলিষ্ঠতর করবে।

## ১.১০ সারাংশ

এই এককে আমরা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি যে, সমাজে কি ধরনের লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ আছে, যা পুরুষ ও নারীর মধ্যের আন্তঃসম্পর্ককে বৈষম্যমূলক করে তুলেছে। অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে—যা নারী নির্যাতন ও বৈষম্যগুলির সামাজিক ভিত্তিগুলিকে বোঝার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে। যেহেতু লিঙ্গ সচেতনতা সমগ্র সমাজে বিস্তীর্ণ ভাবে বিদ্যমান, এর প্রতিক্রিয়া আমরা জীবনের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লক্ষ্য করি। ফলত আমরা বিশদে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি, লিঙ্গভিত্তিক নানাপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের রূপ। তার পাশাপাশি আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি, পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যগত আদর্শের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। পরিশেষে আমরা বিশ্লেষণ করেছি, কিভাবে লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রতিহত করা যায়, কি ধরনের পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র নারী সমাজের সুরাহা হতে পারে, তাদের জন্য ন্যায় ও মর্যাদা কিভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং তাদের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার প্রক্রিয়া কি ধরনের বাধা ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে পারে।

## ১.১১ প্রশ্নাবলী

**(ক) দীর্ঘ প্রশ্ন ঃ-**

(১) নারীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(২) মানব সমাজে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন রূপের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করুন।

(৩) কি ভাবে ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতন নারী স্বাধীনতাকে খণ্ডিত করেএবং সমাজ তাদের দুর্বল ও নির্ভরশীল প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠা করে, তা দেখান।

(৪) সমাজে নারীর অবদমিত স্থানের বিভিন্ন সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(৫) সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যকে স্থায়িত্ব দেয় এমন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিগুলি কী?

(৬) সমাজে নারীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, হিংস্রতা ও নির্যাতনের বর্ণনা দিন ও অসম লিঙ্গ সম্পর্ককে বজায় রাখতে এদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

(৭) বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে কি আপনার মনে হয় সমাজে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা অপূর্ণই থেকে গেছে?

**(খ) মধ্যম প্রশ্ন ঃ-**

(১) রাষ্ট্র, আইন ও নাগরিকত্ব নারীদের কী ধরনের প্রতিরূপ নির্মাণ করে?

(২) যৌনতা ও নির্যাতনের সাহায্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার নারীবাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন।

(৩) বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য সমাজে নারীর জীবনের মান কীভাবে প্রভাবিত হয়?

(৪) ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নয়নে আইনের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

(৫) নারী বৈষম্যের শিকড় কি পরিবার প্রথায় অন্তর্নিহিত আছে?

(৬) স্ত্রী-পুরুষ আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণে জাতি-ব্যবস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

**(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ-**

(১) নারীদের সমাজে নিম্ন মর্যাদার জন্য কী ধরনের কুফল আমরা লক্ষ্য করি?

(২) ভারতীয় সংবিধানে কী ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় যা নারী স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে?

(৩) ভারতীয় সংবিধানে কী এমন কোনও পরস্পর বিরোধ আছে যা লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে?

(৪) নেতৃত্বকারী জাতিগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকৃতির কেন হয়?

(৫) পরিবারের অভ্যন্তরে নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিধবাদের অভিজ্ঞতা কিরূপ হয়?

(৬) যৌন উত্তেজনা বর্ধক নারীদেহ প্রদর্শন (Pornography) কে কী সমাজে মহিলাদের শোষণের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে?

(৭) ভারতীয় জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি সমাজে নারী বৈষম্য নির্দেশ করে?

(৮) শ্রেণী কাঠামো সমাজে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে?

(৯) ভারতীয় সমাজে পণপ্রথা ও ভ্রূণহত্যার মধ্যে কি কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে?

## ১.১২ গ্রন্থপঞ্জী


1. Abbott, P. and Wallace, C. 1996, IInd Ed., *An Introduction to Sociology: Feminist Perspectives,* London : Routledge.
2. Ahuja, Ram. 1997, IInd Ed., *Social Problems in India,* Jaipur : Rawat.
3. Desai, Neera and M. Krishnaraj. (edts.), 1987, *Women and Society in India,* Delhi : Ajanta Publications.
4. Dube, S.C. 1990, *Indian Society,* New Delhi : NBT.
5. Landrine, H. and E.A. Klonoff, 1997, *Discrimination Against Women, Prevalence, Consequences, Remedies, Thousand Oaks :* Sage.
6. Mathews, R. and J. Young (edts.) 1986, *Confronting Crime,* London : Sage.
7. Pandey, R. 1994, *Social Problems of Contemporary India,* New Delhi : Ashish Publishing House.
8. Smart, Carol & Bren Neale, 1999, *Family Fragments?* Cambridge : Polity Press.
9. World Development Report 2000/2001. *Attacking Poverty,* New York : OUP.


## ১.১৩ পরিসংখ্যান

**The Following Informations Indicate that Women in Indian Society, Compared to Their Male Counterparts, Face Inequality and Deprivation in Every Aspect of Their Life.**

| | |
|---|---|
| 1. Life Expectancy at Birth (1993-97) | *61.1 Years.* |
| 2. Total Fertility Rate (2000) | *3.3* |
| 3. Percentage of Pregnant Women (2000) | |
| (a) Had Antenatal Check Up | *61.8%* |
| (b) Blood Pressure Measured | *43.8%* |

| | | |
|---|---|---|
| | (c) Given TT Injections | *60.2%* |
| | (d) Received IFA tablets | *53.8%* |
| | (e) Delivered at Institutions | *34.5%* |
| | (f) Delivery attended by health professional | *42.5%* |
| | (g) Pregnancy or pregnancy related deaths PA | *100000 Approx.* |
| 4. | Anemia amongst Women (15-49 yeas) | *51.8%* |

| | | Total population | Child Population | % of total |
|---|---|---|---|---|
| 5. | India (2000) | Total population | Child Population | % of total |
| | (a) Sex Ratio | *933* | *927* | — |
| | (b) Missing Women | *35595564* | *5979506* | *16.8%* |

6. Maternal Mortality Ratio (1999) — *540 per 1 lac live birth.*

Throughout childhood the mortality rate among girls continue to be 20% higher than among boys.

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Literacy Rate, Females as a percentage of Males (2001) | *71.4%* |
| 8. | Enrollment ratio, girls as a percentage of boys (1999-2000) | |
| | Primary | *82.2%* |
| | Secondary | *75.2%* |
| 9. | Percent ever Married Women (1999) | |
| | (a) Needs permission to visit friends/relatives | *75.6%* |
| | (b) Beaten or physically mistreated since age 15 | *21.0%* |

| | | | No. of Illiterates. |
|---|---|---|---|
| 10. | Literacy Rate (2001) | | No. of Illiterates. |
| | (a) Total | *65.38% (562010743)* | *296208952* |
| | (b) Male | *75.85% (336969695)* | *106654066* |
| | (c) Female | *54.16% (225041048)* | *189554886* |

Despite significant expansion of early education services, nearly two in every three women and one in every three men are illiterate.

11. Gross Enrollment Ratio (1999-2000)

| | |
|---|---|
| (a) Primary | |
| i. Boys | *100.9%* |
| ii. Girls | *82.9%* |
| (b) Secondary | |
| i. Boys | *65.3%* |
| ii. Girls | *49.1%* |
| (c) University/College (1997-98) in Lacs | |
| i. Boys | *35.2* |
| ii. Girls | *21.3* |

| | |
|---|---|
| 12. Estimated number of women and child victims of commercial sex exploitation in six metropolitan cities (1999) | *100000* |
| 13. Inducted into commercial sex exploitation when they were less than 18 years of age (1999) | *40%* |
| 14. Track Record of Women Candidates in first 12 Lok Sabha Elections : | |
| 1st | *22 (4.29%)* |
| 2nd | *27 (5.4%)* |
| 3rd | *34 (6.7%)* |
| 4th | *31 (5.9%)* |
| 5th (Mrs. Gandhi at the peak of her career as PM) | *22 (4.29%)* |
| 6th (Decline during Janata Party in power) | *17 (3.4%)* |
| 7th | *28 (5.1%)* |
| 8th (During Rajiv Gandhi's regime) | *44 (8.11%)* |
| 9th | *28 (5.29%)* |
| 10th | *39 (7.2%)* |
| 11th | *39 (7.2%)* |
| 12th | *43 (7.79%)* |
| 15. A Sakshi Survey of 2400 men and women across organizations and institutions, 2002, regarding "Sexual Harassment at Workplace" | |
| (a) Sexual Harassment exists at my Workplace | *80%* |
| (b) I have encountered it | *49%* |
| (c) I have not heard of the 1997 SCI judgement | *58%* |
| (d) My Office follows the SCI guidelines | *20%* |
| (e) Men are responsible for it | *28%* |
| (f) Women are responsible for it | *08%* |
| (g) The only to stop it is by protesting | *80%* |
| (h) Women who get it, deserve it | *12%* |
| (i) Sometimes women succumb because it advances their careers | *32%* |
| (j) Bosses are to blamed | *68%* |

*(Pub : The Telegraph, Calcutta, 10 November, 2002)*

| | |
|---|---|
| 16. According to the 1991 census, the ratio of Working Males to total male population was | *51.55%* |
| Whereas the ratio of Female Workers to total female population was, | *22.25%* |
| i.e. in actual figures : | |
| (a) Male | *22.64 Crores* |
| (b) Females | *09.06 Crores* |

*Source : UNICEF IN INDIA 1999-2002, if not otherwise mentioned*

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বিষয় ঃ বুদ্ধত্বের প্রকৃতি ও পরিধি/বার্ধক্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

২.৪ বৃদ্ধত্ব যখন সমস্যার আকার নেয়, বার্ধক্যে পরিণত হয়, বার্ধক্য সমস্যার বৈশিষ্ট্য

২.৫ বার্ধক্য সমস্যার ভারতীয় চিত্র

২.৬ বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকার

২.৭ সারাংশ

২.৮ প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সাধারণ বার্ধক্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচলিত এই সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিত হব। এই প্রযত্নে আমরা বৃদ্ধত্ব ও তার বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করব। এরপর সমাজে বার্ধক্যের দুঃসহ ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি এবং তাদের অস্তিত্বের বিপন্নতার কারণ বর্ণনা করব। পরবর্তীতে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করব এবং এর প্রভাব বৃদ্ধদের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর কিরূপে প্রভাব ফেলছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করব। সবশেষে বার্ধক্যের সার্বিক সমস্যার প্রতিকার, কর্মসূচী ও নীতিবিষয়ক দিকগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব।

## ২.২ প্রস্তাবনা

বৃদ্ধ বা প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নানাবিধ পূর্বসংস্কার (prejudice) ও তাঁদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা ক্রমশই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তাই এই সকল প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও বাড়ছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধ বলতে তাঁদেরকে বোঝায়, যাঁরা জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে পঁয়ষট্টি বছর বা তার পরবর্তী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে (যেমন, ভারতবর্ষে) বৃদ্ধ বয়সের মাপকাঠি হিসাবে ষাট বছর ধরা হয়ে থাকে। এই ধরনের সংজ্ঞা নিরূপণ অনেকটাই স্বেচ্ছাসৃষ্ট বলে মনে হয়। কেননা, বয়ঃবৃদ্ধি একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া। বর্তমান বৃদ্ধসমাজ সামাজিক, ঐতিহাসিক, প্রযুক্তিগত যে পরিবর্তনগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা ইতিহাসের কোনো যুগেরই বৃদ্ধ প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু দুর্ভগ্যবশত এরূপ লক্ষ্য করা যায় যে, জীবনধারার গুণগত মানের সঙ্গে পরিমাণগত মানের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়নি। জীবনের একটা

পর্যায় বা মধ্যবয়স পর্যন্ত সুঠাম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সন্তান-সন্ততির উপস্থিতি, পর্যাপ্ত উপার্জন, সুন্দর ঘর-বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতির স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলিতে ঘাটতি দেখা যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বৃদ্ধরা গোষ্ঠীগত ভাবে সমরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, কারণ, তাঁদের অবস্থান ও চাহিদাগুলি ভিন্ন প্রকারের। বৃদ্ধরা যেমন জীবনের বিবিধ জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সংগতি বিধানের চেষ্টা করে, তেমনি সমাজের সঙ্গেও তাদের মানিয়ে নিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে বোঝায়, একটি মানুষের বয়ঃবৃদ্ধিজনিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, অপরদিকে ঐতিহাসিক সময় বা প্রেক্ষাপটে তার অবস্থানের নিরিখে সামাজিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং উন্নয়নের প্রভাবে বৃদ্ধদের মর্যাদাগত অবস্থান্তর ঘটে। প্রায়শই জীবনের নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বৃদ্ধদের মনে সমাজ সম্পর্কে নানাবিধ নেতিবাচক ধরাণা গড়ে ওঠে। চাকরি থেকে অবসর, মর্যাদার অবনমন, আত্মীয়-পরিজন হারানোর বেদনা, সন্তানদের কাছে প্রত্যাঘাত ইত্যাদি নিয়ত ঘটতে থাকায় বৃদ্ধদের মনোবলে চিড় ধরে। এছাড়া নিজেদের সার্বিক আত্ম-অকর্মণ্যতা কিংবা জীবন-পরিচালনার নিয়ন্ত্রক হিসেবে অপারগতা বৃদ্ধদের আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে। শুধু মানসিক পীড়ন, বিপর্যয় বা হারানোর বেদনা নয়, তাদের নানাবিধ মর্যাদর অবনমনও সহ্য করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, জনগোষ্ঠীর অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় সামান্য শারীরিক অসুস্থতার সময় বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অধিক যত্ন ও শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়, না হলে তা গুরুতর পরিস্থিতির রূপ নিতে পারে।

## ২.৩ বিষয় ঃ বৃদ্ধত্বের প্রকৃতি ও পরিধি বার্ধক্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

বৃদ্ধদের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কিত পর্যালোচনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। বিশেষ করে তাঁদের আন্তঃমানবিক সম্পর্ক, বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ, অবসরকালীন জীবনধারণ, সামাজিক অসাম্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের উপস্থিতি, বয়ঃসংক্রান্ত নানাবিধ রাজনীতি বা কূটনীতি, স্বাস্থ্য ও তার শুশ্রূষা, মৃত্যু তথা প্রিয়জনের বিয়োজন প্রভৃতি সকল কিছুই তাঁদের সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এই বিস্তৃত জীবনধারাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে গবেষণা শুরু হয়েছে। এই সকল পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমানে বৃদ্ধদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নানা মাত্রা পেয়েছে। বিগত ষাট বছরে ‘বার্ধক্য সমস্যা’ কেন্দ্রিক গবেষণা যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, সেই একই গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধদের জনসংখ্যা এবং পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক জীবনযাপনের ধারণাগুলি। পূর্বে গবেষকগণ শিশু, কিশোর ও যুবাদের নিয়ে অধিক হারে গবেষণায় আগ্রহ দেখাতেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পৃথিবীতে বৃদ্ধ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকায় এই জনগোষ্ঠীর জটিল জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গবেষকদের আগ্রহ প্রসারিত হয়েছে।

বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিস্তর পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্ক অবহিত হওয়া সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে বৃদ্ধদের সুদীর্ঘ জীবনধারা, কৃতকার্যতা এবং অকৃতকার্যতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা, বর্তমানের পরিবর্তিত প্রকৃতির সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের গতিপথের সহাবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে, বৃদ্ধরা কিভাবে আজকের যুগে নিজেদের বৃদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। এমনকি এর মধ্যে বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং কর্মপ্রক্রিয়ার রূপটিও যুক্ত হয়ে থাকে। অতএব ‘বার্ধক্য’ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল বৃদ্ধদের ব্যক্তিগত ধারণা, যার ভিত্তিতে তাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের নিজস্ব সামাজিক পৃথিবী, যা কি না দাঁড়িয়ে থাকে তাঁদের নিত্য জীবনের ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতার ওপর। আমরা সকলেই জানি, জীবনের নানা পরিস্থিতি এবং তার অর্থ নিরূপণকে কেন্দ্র

করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রোজকার জীবন। বৃদ্ধরাও তাঁদের নিত্যজীবনের চলমানতাকে তাঁদের নিজস্বতার শর্ত ও মত অনুযায়ী বুঝতে চান।

বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে এক নতুন জগৎ উন্মোচিত করে। যে জগৎ আমাদের কেবল কতকগুলি সংখ্যা, পৌনঃপুনিক সারণি (frequency table) অথবা পরিসংখ্যানমূলক কিছু তথ্যের সামনেই হাজির করে না, জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে যে জগৎ নির্মিত সেই বোধেও পৌঁছে দেয়। দৈনন্দিন জীবনের অর্থ বৃদ্ধদের কাছে কেবলমাত্র একটি স্বতন্ত্র বয়ঃসীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। বরং বোধ-বুদ্ধির কতকগুলি জটিল হিসেবের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে তাঁদের নিজস্ব পৃথিবী; যেমন—চিরদিনের বন্ধুত্ব, প্রিয়জনের যত্নাদি, যে কোনো নতুন পরিবেশকে ঘিরে প্রতিরোধ ইত্যাদি।

জীবনধারণের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের কাছে অভিন্ন। তবু কেবলমাত্র বয়ঃসীমার গণ্ডীই বৃদ্ধদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অবশিষ্ট জনসংখ্যা থেকে। 'বয়স' কেবল সময়ানুক্রমিক বয়ঃসীমার ওপর নির্ভরশীল নয়, বয়সের সম্পর্কে অনেকখানি মনের সঙ্গে, বয়সের ধারণা সেই অর্থে খানিকটা আত্মগত ও আপেক্ষিক। দৈনন্দিন জীবনের বৃদ্ধত্বের ভাবনা, বা বৃদ্ধ হওয়ার ধারণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নয়। বাস্তবে সমাজগত দৃষ্টিকোণ থেকে বয়সের অর্থ গড়ে ওঠে, এক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এইভাবে গড়ে তুলি যে, অন্যরা কি বলছে, কি ভাবছে, আমাদের সামনে কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হচ্ছে, গণমাধ্যমগুলি থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে। এইভাবে অসংখ্য পথ ধরে আমাদের সামনে অসংখ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। তবে একথাও ঠিক যে, চলমান পৃথিবী থেকে সংগৃহীত নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে সকলে একই ভাবে, একই পথে উপলব্ধি করে না; আবার সকলের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়াও একই ভাবে ঘটে না। নানা পথ ধরে তার সঞ্চয়ন ও বহিঃপ্রকাশ চলতে থাকে। এর পশ্চাতে অঞ্চলগত তারতম্যেরও বিশেষ ভূমিকা থাকে। যেমন, একটি নতুন সামাজিক উপলব্ধি আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নতুন সামাজিক ধারণা তৈরি হয়, তখন ব্যক্তিমনের ওপর তা ছায়া ফেলে। যেমন বলা যায়, অবসর প্রাপ্তিকে বুঝতে হলে আমাদের ব্যক্তির কর্মজীবনের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে।

আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকাই, আমাদের শরীরের নানারূপ ব্যাখ্যা আমরা দিয়ে থাকি, যা কিনা শরীরের বস্তুগত অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। এই ব্যাখ্যাগুলি কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি কিশোরবয়স্ক বলে দেখায় বা কিশোরকে বিপরীতভাবে প্রবীণ বলে মনে হয়, তাহলে তাতে সেই বিশেষ ব্যক্তি খুশি বা মর্মাহত হয়। আয়নায় আমাদের প্রতিকৃতি ও কল্পনার প্রতিচ্ছবির মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। আয়নায় প্রতিফলিত বস্তুগত প্রতিকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির রঙে অঙ্কিত প্রতিকৃতির পার্থক্য থাকে। বস্তুতঃ এই বিষয়গুলি নির্ভর করে—আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, আমাদের অবস্থান এবং কার ওপর তার প্রতিফলন ঘটছে, সেগুলির ওপর। আমাদের সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ আমাদের শরীরের ভাবগত অর্থ তৈরি করে দেয়। বৃদ্ধ হওয়ার সামাজিক তকমা বৃদ্ধদের ওপর একটি নেতিবাচক ধারণা আরোপ করে।

## ২.৪ বৃদ্ধত্ব যখন সমস্যার আকার নেয়, বার্ধক্যে পরিণত হয়, বার্ধক্য সমস্যার বৈশিষ্ট্য

আগের দুটি অংশে আশা করা যায়, বৃদ্ধত্ব নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাঁদের সামগ্রিক স্থান ও পরিস্থিতির কি ধরনের পরিবর্তন হয়।

এরপর আমরা প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে বৃদ্ধরা ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলি পর্যালোচনা করব।

(ক) জৈব—শরীরগত (bio physical) ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানাবিধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং হারায়। বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীরিক কর্মক্ষমতা কমে, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং নানাপ্রকার রোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

(খ) বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শক্তির ধারণ ক্ষমতা বা পরিধি (capacity) বদলায়, জীবনের লক্ষ্য সংকুচিত হয় এবং আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেখা দেয়।

(গ) সামাজিক স্তরে ব্যক্তি তাঁর যৌবনকালে নানাবিধ মিথস্ক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করে। যেমন, ব্যক্তি কর্মজগতে প্রবেশ করে, বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, পরিবারবদ্ধ হয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তির ক্রমশঃ দায়দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তির বয়সের মধ্যগগনের সূর্য যতই পশ্চিমে হেলে পড়ে, ততই ব্যক্তি দেখতে পায় পরিবারে এবং সমাজে তার ভূমিকাও অস্তমিত হচ্ছে এবং দায়-দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি খর্ব হচ্ছে। ফলতঃ ব্যক্তির বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিগত পরিবর্তনের ফলে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে যেতে তাকে।

এরপর আমরা পরিবর্তিত সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে বৃদ্ধদের পরিণতির চিত্রটি তুলে ধরব।

ইতিহাসের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বিধানের সম্ভাবনা জটিলতর হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রাক্‌শিল্প অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা আধুনিকীকরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জনতাত্ত্বিক অবস্থান্তরের ফলে আমরা জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যার বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। যেমন, একদিকে বর্ধিত আয়ুকাল, তেমন অপরদিকে সংকুচিত জন্মহার বৃদ্ধদের সংখ্যাবৃদ্ধির দুটি দিক।

শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণ সমাজের প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামোতে যে পরিবর্তন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, তার ফলে বৃদ্ধদের এই সমাজে নতুন ভাবে, নতুন পথে সংগতি বিধানে সচেষ্ট হতে হচ্ছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন অর্থে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার ফলেই বৃদ্ধদের নতুন ভাবে সংগতিবিধানের পথে চলতে হচ্ছে। প্রাক্‌শিল্প যুগে বয়সের ভারে হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা সমাজের অন্যান্যরাই ভরিয়ে দিতেন। বাকিটুকু বৃদ্ধরাই অর্জন করে নিতে পারতেন। এই সময় পরিবারগুলি উৎপাদনের একক হিসাবে অবস্থান করত, যার মূল নিয়ন্ত্রণ পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠের ওপর ন্যস্ত হত। বয়সের ভারে সব হারিয়ে ফেললেও তাঁদের মর্যাদা ও কর্তৃত্বের বিশেষ পরিবর্তন ঘটত না। পারিবারিক উদ্যোগে বৃদ্ধদের কায়িক ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁরা কর্ম নির্বাচন করতেন। এই অবস্থার ফলে তাঁদের বৃদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াও শ্লথ হত। অপরদিকে, আধুনিক শিল্পসমাজ, পরিবারগুলি তার উৎপাদনমূলক কার্যাবলীকে অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে। এই সমাজের তরুণ প্রজন্ম আজ আর অর্থনীতিগত ভাবে পরাধীন নয়। পারিবারিক কাঠামো এখানে যৌথ থেকে একক বা অণুতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিকাঠামোতে বৃদ্ধদের অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বলে মনে করা হয়। এছাড়া, শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তিমূলে বৃদ্ধরা উপার্জনকারী ভূমিকা পালন করতে পারছেন না এবং ক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তাঁদের অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য এবং সামাজিক প্রত্যাখ্যানের মতো দুটি অনিয়ন্ত্রিত (uncontrolled) কারণ সামাজিক জীবনধারায় বৃদ্ধদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। দারিদ্র্য এক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধানতম অন্তরায়। এক্ষেত্রে প্রামাণ্য এই যে, উন্নয়নশীল

দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বহু অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ দেখা গেছে যে, শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে অর্থ উপার্জন এবং সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধরা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েন। তাই বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বৃদ্ধরা হলেন সমাজের সবচাইতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। এছাড়াও বৃদ্ধরা কার্যকরীভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে না পারায় সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ তাঁদের আয়, সম্পদ, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওপর পড়ে। আমরা আগেও দেখেছি, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত রদবদলের ফলে পরিবারগুলির সদস্যদের বৃদ্ধদের সহায় সম্বল প্রদানের ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। সামাজিক হীনম্মন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, শারীরিক দুর্বলতা এবং নানাবিধ অসুস্থতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে থাকে সামাজিক অবহেলা। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, বার্ধক্য হল, নির্ভরতা এবং অক্ষমতার এক চরম অবস্থা বিশেষ, যাকে আমরা সবসময় বছরের হিসাবে পরিমাপ করতে পারি না।

বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সামাজিক ভূমিকা এবং অবস্থিতির (means) ক্ষেত্রসমূহে বিস্তর পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পরিবার তথা সমাজজীবনে তাঁদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। বৃদ্ধারা সমাজজীবনে ও পরিবারের অভ্যন্তরে যে সকল ভূমিকা পালন করেন, তা সমাজে খুব কমই স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য যে, বয়স্কদের সহায়তা ও প্রয়োজনগুলি লিঙ্গাভিত্তিক। কিন্তু এই জরুরী বিষয়টি সাধারণতঃ সমাজে অস্বীকৃতই থেকে গেছে। কারণ, আমাদের সচেতনতার অভাবের জন্য আমরা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সমরূপ দেখি। সমগ্র জীবনচক্র জুড়ে পুরুষ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করে। সমাজে পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। মহিলাদের আয়ুষ্কাল এবং অল্পবয়সে বিবাহের কারণে তাদের জীবনের শেষভাগে বৈধব্য বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টিও লিঙ্গাভিত্তিক হয়ে থাকে। কেননা, সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক বীমাসংক্রান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা থাকে বঞ্চিতা। নারীদের অধিকাংশ উপার্জনশীল না হওয়াই এর কারণ। আবার, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পদ এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুসামগ্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীদের নানাবিধ দুর্ভোগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব বৃদ্ধবীনে চরমভাবে অনুভূত হয়। গৃহজীবনে বৃদ্ধারা যে অবৈতনিক শ্রমদান করেন, তা ভবিষ্যতে তাঁদের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা দেবে, এমন কথা বলা যায় না। বৃদ্ধবয়সে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়টিও লিঙ্গাভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশে পুষ্টির দুর্বলতা, নানাবিধ স্ত্রীরোগের প্রাদুর্ভাব, অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনে হিংসাত্মক ঘটনার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি হলেও বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যমূলক পরিবেশে তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সন্তানধারণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে নারীরা যে সকল নানাবিধ ঝক্কি নিয়ে থাকেন, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বৃদ্ধ বয়সে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমরা বহুল পরিমাণে মানুষের প্রচরণ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে এবং গ্রাম থেকে শহরে দেখতে পাই। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কারণ, অন্যদিকে বলপূর্বক স্থানান্তরীকরণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, বহুবিধ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এই প্রচরণ ঘটেছে। এই প্রচরণের অনেক নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর পড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী চরম দুর্দশার শিকার হন। যেমন, ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা, গুজরাটের ভূমিকম্প এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে বৃদ্ধরা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। যদিও এই সকল পরিস্থিতিতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই বিপন্ন হয়ে থাকে, তবুও বৃদ্ধরাই এক্ষেত্রে চরম দুর্ভোগে পড়েন। কেননা, তাঁদের সার্বিক সহায়-সম্বলহীনতা ও শারীরিক দুর্বলতা তাঁদের আরও কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। পরিবার

এবং সম্প্রদায়ের সার্বিক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বয়স্করা সামগ্রিক জনগোষ্ঠী থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের ন্যূনতম আশা-ভরসার স্থানও ভেঙে খান খান হয়ে যায়। নিজেদের অস্তিত্বকেই তাঁরা খুঁজে পান না। পর্যাপ্ত খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রীর অভাবে উদ্ধার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধদের স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ পায় না। এক্ষেত্রে অনেকসময় বৃদ্ধদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণও ঘটে এবং ত্রাণকার্যে লিপ্ত বিভিন্ন সংগঠন তাদের উদ্ধারকার্যের অগ্রাধিকারে বৃদ্ধদের গুরুত্ব দেয় না।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধদের চিরাচরিত ও বিশেষ অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি জনসাধারণকে বিপদ থেকে উত্তরণের বিকল্প পথ দেখাতে পারে। তাঁরা সমাজে শান্তিস্থাপন ও সম্প্রদায়গত পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারেন। তাই বলা যায়, বৃদ্ধরা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে নন, বরং অনেক সময় সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বৃদ্ধাবস্থা সামাজিক সমস্যায় কেন ও কিভাবে পরিণত হয়েছে, এই সংক্রান্ত আলোচনার পর আমরা পরবর্তী বিভাগে যাব, যেখানে আমরা নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধদের স্থান ও তাঁদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

## ২.৫ বার্ধক্য সমস্যার ভারতীয় চিত্র

আমরা জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পাথেয় করে ভারতীয় বয়স্কদের সমস্যাগুলি পর্যালোচনার সূত্রপাত করব। ১৯৮১ সালে ভারতীয় মোট জনসংখ্যার ৪.৩ কোটি যেখানে বয়স্ক জনগোষ্ঠী ছিল, সেখানে ১৯৯১ সালে তা ৫.৫ কোটি, ২০০১ সালে ৭.৫ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী পঁচিশ বছরে তা ১২ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। যে কোনো আদর্শ বা মানের বিচারে এরূপ বলা যায় যে, যে কোনো প্রকল্প-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি দুঃস্বপ্ন বয়ে আনতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিশাল বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসনে স্থানান্তরিত করতে হলে কি বিশাল মানবসম্পদ এবং অর্থের প্রয়োজন। বৃদ্ধদের নির্ভরতার হার বুঝতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, ষাট-সত্তর বয়সের মানুষেরা পনের-ঊনষাট বছরের উৎপাদনশীল বয়ঃসীমার লোকেদের ওপর নির্ভর করে থাকে নিজেদের সংস্থানের জন্য। অতএব ষাট ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমায় বৃদ্ধ গোষ্ঠীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে নির্ভরতার হার। এইভাবে সমীক্ষা করে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সংখ্যাগতভাবে উৎপাদনশীল বয়ঃসীমা (পনের-ঊনষাট) গোষ্ঠীর প্রতিটি লোকের ওপর ক'জন বৃদ্ধ নির্ভরশীল। ১৯৮১ সালে নির্ভরশীল বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল বারো, ১৯৯১ সালে ছিল পনের, যা কিনা আরও পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধদের যে সামাজিক সেবার প্রয়োজন, তা গুণগতভাবে অন্যান্য সেবার থেকে পৃথক। অতএব বৃদ্ধদের শারীরিক যত্ন ও চিকিৎসা এবং তাঁদের আবাসনের ক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত গুরভার হয়ে পড়ে, যখন তাঁদের নির্ভরতা বাড়তে থাকে।

আমরা যদি লিঙ্গ অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখব, চিরকালই নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত সমান সমান না হলেও চিত্রটি বিপরীত; কারণ, বৃদ্ধদের অনুপাতে বৃদ্ধাদের সংখ্যা বেশি হয়। আবার, পুরুষ এবং নারীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের থেকে বৃদ্ধাদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সংখ্যা শহরের তুলনায় গ্রামে অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমতঃ, গ্রামের জন্মহার শহরের তুলনায় বেশি, দ্বিতীয়তঃ গ্রাম থেকে শহরে প্রচরণ এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় শহরগুলিতে অতি জনসংখ্যাগত চাপের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম থেকে শহরমুখী জনপ্রচরণ। প্রায়শঃ যুবকরা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা-কে

ফেলে শহরমুখী জীবনধারণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু অবসরপ্রাপ্ত বয়স্করা বিশেষ করে নিম্নবিত্তভোগীরা তাদের পুরনো গ্রামীণ জীবনে ফিরে যান। কেননা, শহর বসবাসযোগ্য গৃহের যথেষ্ট অভাব আছে।

বিশেষ করে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এই সময় তাঁরা দ্রুত বিবাহিত জীবনের সঙ্গীকে হারাতে থাকেন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধারা এই সময় নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হন।

বৃদ্ধ বয়সে সংগতি বিধানের অন্যতম হাতিয়ার হল, শিক্ষা। কারণ, তাঁদের এই বয়সে নতুন নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, যা শিক্ষার ফলে সহজতর হয়। যদিও সাধারণভাবে ভারতীয় শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। খুব সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষার হার ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। তাই আজকের বৃদ্ধদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। বৃদ্ধদের এই ন্যূনতম শিক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে তাঁদের ভূমিকা গ্রহণ এবং তার সঙ্গে সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারতে বয়স্কদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবহেলার ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এ যেন অবহেলার ফলে বৃদ্ধরা যুবাদের তুলনায় অধিক হারে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। তাছাড়া, অনেকে কতকগুলি বিশেষ রোগ—যেমন, বাতের ব্যথা, সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ এবং রক্তচাপজনিত রোগে ভোগেন। এছাড়া হৃদ্‌সংক্রান্ত রোগ, মূত্রাশয়জনিত রোগের নানাবিধ সমস্যাও এইসময় দেখা দেয়। এমনকি বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগের প্রকোপেও এই সময় থেকে দেখা দিতে থাকে। তবে শ্বাসকষ্টজনিত এবং বাতের সমস্যায় গ্রামের মানুষ অধিক হারে ভোগেন। অন্যদিকে রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ এবং মধুমেহ রোগে শহরের বয়স্করা বেশি সংখ্যায় কষ্ট পান।

সমাজের সঙ্গে বয়স্কদের সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান ও তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং উপার্জন ক্ষমতা একটা বড় ভূমিকা পালন করে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ফলে শুধু যে আয় হ্রাস পায় তা নয়, কর্মসূত্রে অর্জিত সামাজিক স্থানেরও বিচ্যুতি ঘটে। বৃদ্ধরা এক্ষেত্রেও মর্যাদা হারানোর যন্ত্রণা, কর্তৃত্ব হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেন। শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের তীব্র গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্থিক সংগঠনগুলিতে গুণগত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে বয়স্কদের অর্থনৈতিক ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে বৃদ্ধদের ওপর আরোপিত বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের নীতি তাঁদের সমস্যাবৃদ্ধির আরেকটি কারণ। এর ফলে তাঁদের অর্থের সূত্র হ্রাস পাচ্ছে। আর একদিকে বৃদ্ধদের কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার হারও কমছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখনও জায়মান (nascent) পর্যায়ে অবস্থান করছে। তবে ভারতবর্ষ তুলনামূলক ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জায়মান স্তরে থাকার দরুন আমরা এখনও বৃদ্ধদের কর্মলিপ্ততার হার বেশি দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ফলে এই হার কমে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে যেখানে অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের থেকে সংগঠিত আকারে বিকশিত, সেখানে বৃদ্ধদের কর্মক্ষেত্রে স্থান অত্যন্ত সংকুচিত অত্যন্ত স্বল্প আয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে আমরা বৃদ্ধদের কিছু কর্মনিয়োগ দেখতে পাই। তাই বৃদ্ধদের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক অর্থসংকট লেগেই থাকে।

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিক হচ্ছে, সামাজিক তথা পারিবারিক দিক থেকে অবহেলা। এটি বিশেষতঃ শহরকেন্দ্রিক সমস্যা হিসেবে নির্দেশিত। শহরের পরিবর্তিত জীবনধারা, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থাদির পরিকাঠামো এবং সামাজিক হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধদের সমস্যাকে আরও তীব্রতর করছে।

পেশাগত বিশেষ ধরন, সামাজিকীকরণের বিশেষ প্রক্রিয়া এবং ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনপঞ্জিতে বয়স্করা বড়ই একাকীত্বের শিকার হচ্ছেন। শহরাঞ্চলে সংকীর্ণ আবাসস্থল, গৃহনির্মাণের ধরন, ফুটপাত পার্কের অভাব, মুক্তাঞ্চলে ভ্রমণের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে বৃদ্ধরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা তুলতে পারেন না।

আবার শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় বৃদ্ধরাও সামাজিক উগ্রতা (violence) এবং অপরাধের ভয়ে ভীষণভাবে গুটিয়ে যাচ্ছেন। শারীরিক অক্ষমতা ও নানাবিধ রোগযন্ত্রণার ফলে এই ধরনের মানসিক ভীতি আরও বেশি করে তাঁদের মধ্যে চেপে বসেছে। এই সব কারণে শহরাঞ্চলের বৃদ্ধদের জীবনে মানের অবনমন ঘটেছে এবং তাঁদের ইচ্ছা-বিরোধী নানারূপ আপস করতে হচ্ছে।

এবার আমরা বুঝে নিতে চাইছি, পূর্ব-উল্লিখিত এই জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে কেমন করে বয়স্করা সংগতিবিধান করে চলেছেন।

প্রাচীন সামাজিক পরিস্থিতিতে বার্ধক্যকে কখনোই সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়নি। কেননা, আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি আজকের মতো তেমন জটিল ছিল না, তেমনি মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বয়স্কাদের প্রতি পরিবার তথা সমাজের সদস্যদের শ্রদ্ধা, সেবা এবং নৈতিক সহায়তা ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অনেকখানি পরিবর্তিত রূপলাভ করেছে এবং বয়স্কদের সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংগতি বিধানের মাধ্যমে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। বৃদ্ধদের যাবতীয় মর্যাদার স্থান ছিল তাঁদের যৌথ পরিবার প্রথায়, সেখানে কয়েকটি প্রজন্ম বয়স্কদের নিয়েই একত্রে বসবাস করত। সেখানে গুরুজনদের প্রতি পারিবারিক অর্থনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ায় বৃদ্ধদের প্রতি সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ত।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি পারিবারিক ভিত্তি থেকে শিল্পভিত্তিক হয়ে উঠলে বৃদ্ধদের মর্যাদাগত স্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, পরিবারগুলির সেবা-যত্নেরও পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে পারিবারিক উৎপাদন থেকে সরে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন উৎপাদনহীন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে থাকেন। এই সব ক্ষেত্রে নবীনরা শুধু বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের ঘেরাটোপ থেকেই অব্যাহতি লাভ করছে না, উপরন্তু তারা অন্যত্র চলে গিয়ে পৃথক সংসার গড়ে তুলছে।

আর বৃদ্ধরা ক্রমশঃ এই বয়সেও নিজেদের উপার্জিত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এইভাবে ভারতবর্ষে যৌথ পরিবারগুলির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক পরিবার গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলতঃ বৃদ্ধদের সম্পর্কের গণ্ডী সংকুচিত হচ্ছে। এর ফলে বয়স্কদের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে শহরের বিবাহিত সন্তানদের সঙ্গে বয়স্ক পিতামাতার বসবাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের জটিলতা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন বহু বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁদের সন্তানের ওপরই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। ফলে নিজেদের অস্তিত্বকে বিকিয়ে নিরাপত্তার আশায় নানাদিক মানিয়ে চলতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, পরিবারে বৃদ্ধদের সেবাযত্নের বিষয়টিকে আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই সব কারণে বৃদ্ধদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা ভারতীয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

অতীতের সমাজে বৃদ্ধরা পরিবারের শীর্ষে অবস্থান করতেন। এই সূত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়-দায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে পারিবারিক কর্তৃত্বের একক স্থান দখল করেছিলেন। সার্বিক দায়-দায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধরা কৃষিভিত্তিক অভিজ্ঞতা যেমন—চাষ করা, বীজ বোনা, ফসল কাটা; চিকিৎসা ক্ষেত্রে—রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কিংবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করা প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। খরা, বন্যা, মহামারীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবে সাধারণ মৃত্যুর হার অধিক ছিল। এর মধ্যে যাঁরা প্রবীণ বয়সে পা রাখতেন, তাঁদের সমাজ ও পরিবার শ্রদ্ধার

দৃষ্টিতে বরণ করে নিত। এছাড়া, সমান্ত প্রভুদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, জাতিব্যবস্থা পরিচালনায়, যজমানী সম্পর্কিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এবং সম্প্রদায়গত কর্তৃত্বের মাধ্যমে বৃদ্ধরা সহজেই সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন।

পারস্পরিক বিনিয়োগ ও নৈতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন সমাজে বয়স্কদের সেবা-শুশ্রুষার মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহযোগিতার সম্পর্ক অন্যান্য প্রজন্মদের মধ্যে গড়ে উঠত। তাছাড়া, সম্প্রদায়গত বিশেষ বিধিনিষেধও ছিল। বয়স্কদের প্রতি নৈতিক সমর্থন, তাঁদের প্রতি সেবামূলক মানসিকতা গঠন একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল। তথাকথিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজের একপ্রকার প্রতিবন্ধী সদস্য হিসাবে বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি বিশেষ নমনীয়তা প্রদর্শিত হত। তাই এঁদের প্রতি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, যত্নশীল আচরণ একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতার অধীনেই পড়ত। এই নৈতিকতাকে ধারবাহিক করতে গ্রাম পঞ্চায়েত সহ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করত। এই নৈতিকতাকে অমান্য করার অর্থ হল পঞ্চায়েত কর্তৃক শাস্তি প্রদান। তবে একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধদের সহায়তাদানের বিষয়টি অত্যন্ত অবহেলিতই ছিল।

কৃষি উন্নয়নকল্পে সবুজ বিপ্লবের গোড়ার দিকে ভারতীয় পরিবারগুলি সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে কৃষিজ উৎপাদনের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে জমিগুলির গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, সেই সঙ্গে পরিবারগুলির অভ্যন্তরে নানাবিধ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে দীক্ষালাভ করে। উপভোগবাদ প্রাধান্য পায়। অপরদিকে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ প্রচলিত হলে ভোগবাদ, মুনাফা, অতি-উপার্জন পাশাপাশি দেখা দিতে থাকে। মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর সূত্রপাত এই সময়ই ঘটে। এই ধরনের সার্বিক পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের চিরাচরিত সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বয়স্কদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলি বৃদ্ধদের কর্তৃত্বে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় যুবকরাই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে। কৃষিজ প্রযুক্তি, সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হলে যুবক শ্রেণীর সঙ্গে এই সংগঠনগুলি পারস্পরিক সহায়তা অটুট করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বেও পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শহরের আকর্ষণে গ্রামীণ যুবকরা গ্রাম ছাড়া হলে পরিবারগুলির ভাঙন সুনিশ্চিত হচ্ছে। তাই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উপভোগবাদের প্রাধান্য যতই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, পরিবারগুলি ততই বিভাজনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার এর দ্বারা নবীন-প্রবীণদের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমিহীন পরিবারগুলিতে সম্পদের অভাবে বৃদ্ধদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল পরিবারের বন্ধন অটুট রাখতে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা নানা ধরনের কায়িক শ্রমের সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত রেখে ক্রমশঃ শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে (কেন্দ্র এবং রাজ্য) বয়স্কদের সহায়তাদানের নামে যে প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে তার যথার্থতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে চিরাচরিত সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙে পড়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এরই হাত ধরে বয়স্কদের নৈতিক কর্তৃত্বও উপেক্ষিত হতে শুরু করেছে। অতীতের গ্রাম পর্ষদ ও জাতি পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়ায় তারা আর সমাজের তথাকথিত প্রতিবন্ধী সদস্য হিসাবে বৃদ্ধদের প্রতি তেমন নৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। সেই সঙ্গে গ্রামীণ যৌথ চেতনাও ভেঙে পড়েছে।

যেহেতু সবুজ বিপ্লবের প্রভাবে বৃহত্তর গ্রাম সমাজের জীবনধারাগত অগ্রগতি বিশেষ ঘটেনি, তাই গ্রামীণ যুবকরা যেমন শহরের জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে, তেমনি গ্রামীণ পরিবারগুলির বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হতে শুরু করেছে। নগরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এগুলি বাস্তবে বয়স্কদের জৈব-মানসিক প্রেক্ষাপটে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রভাবে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর ফলে বয়স্কদের অবস্থানে কতখানি অবনতি হয়েছে, এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহরে একক পরিবার দ্রুত বিকশিত হয়েছে। আর যে ক'টি যৌথ পরিবার শহরে বসবাস করে, তার অধিকাংশই ব্যবসায়ী পরিবার। এগুলিও সাম্প্রতিক কালে আবার ভাঙতে শুরু করেছে। এছাড়া বেড়েছে পরিবেশ সমস্যা, আবাসন সমস্যা ইত্যাদি, যা বৃদ্ধদের অবস্থানগত অবমূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বয়স্কদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পশ্চিমী উন্নত রাষ্ট্রগুলি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেও ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নয়নশীল বহুল জনসংখ্যার দেশে তা এখনও যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় সংবিধানের ৪১নং ধারায় সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিছু রাজ্য বয়স্ক ভাতা দিতে শুরু করেছে, তবু দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সার্বিক চাহিদার তুলনায় তা নগণ্যই বলা যায়। বিশেষ করে বয়স্কদের ন্যায় উৎপাদনহীন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টি নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষে বৃদ্ধরাও সমস্যার একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

## ২.৬ বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকার

উপরোক্ত অংশের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে একথা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাঁদের প্রতি সেবা-যত্নের অভাবের ফলে বৃদ্ধদের নানাবিধ কষ্ট বাড়ছে। তাই বৃহত্তর সমাজকেই বৃদ্ধদের সার্বিক সহায়তাদানে এগিয়ে আসতে হবে।

বৃদ্ধদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পশ্চিমী দেশে বৃদ্ধদের যথাযথ পরিমাণে সাহায্য দানের ব্যবস্থার দায়ভার রাষ্ট্রের ওপর থাকে। দেশের সঞ্চিত অর্থ বয়স্কদের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কাজে লাগে। অতএব এ সকল দেশে বয়স্কদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন না।

১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্কদের জন্য জাতীয় কর্মসূচী (policy) চালু করে। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় পরিষদ (National Council for Senior Citizens) গঠন করে। মূলতঃ তিনটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে এগুলি চালু করা হয়। প্রথমতঃ বৃদ্ধ পিতা-মাতা যাঁরা নিজেদের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁদের প্রতি তাঁদের সন্তানদের কর্তব্য আবশ্যিক করা। এই উদ্দেশ্যের ভিত্তি হচ্ছে, রাষ্ট্রের দিক থেকে পরিবারের চিরাচরিত সহায়ক ভূমিকার দায়বদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রটি বজায় রাখা। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা আজও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কেননা, সেবা-যত্নে অনিচ্ছুক সন্তানদের আইনের মাধ্যমে তা পেতে বৃদ্ধ বাবা-মা রাজী নন। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল প্রতিষ্ঠান এই ধরনের বৃদ্ধদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে তাদের জন্য কিছু সরকারি অনুদান সুনিশ্চিত করা এবং বৃদ্ধ ভাতা ও অন্যান্য সহায়তাদানের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়তঃ, অবসর প্রাপ্তিকালে বৃদ্ধদের প্রাপ্য পেনসন, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি দেয় ভাতাগুলি যেন তাঁদের নিয়োগ কর্তা প্রদান করেন, তা সুনিশ্চিত করা।

যদিও পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্যবোধের পতন ঘটছে, তবুও পরিবারই বৃদ্ধদের আশ্রয়দান ও সেবাদানের একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। তাই এই পরিস্থিতিতে পরিবার তথা সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ রূপ দিতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়িত্ব বহন করতে হবে, মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তবে এই কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে নানাবিধ সমস্যা আছে। সমাজতান্ত্রিক এবং মানবিক দিকগুলিকে বাদ দিলেও স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, আশ্রয় এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নত রাষ্ট্রগুলি সঞ্চিত মূলধন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সহায়তায় এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালনে নিয়োজিত আছে। কেবলমাত্র বৃদ্ধদের সামান্য ভাতা দিয়ে যে এদেশের ক্রমবর্ধিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দায়-দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়, তা সকলেরই জানা। নির্দেশমূলক নীতিতে ঘোষিত বয়স্কদের সুযোগ-সুবিধাগুলির সঠিক বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও জেগে ওঠেনি। ভারতের সীমাবদ্ধ অর্থনীতিই এর অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র অন্ততঃ সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধদের পাশে দাঁড়াবে এরূপ আশা করা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের যে দৃষ্টিবঙ্গি আমাদের সমাজে প্রচলিত, তাকে ভুলে গেলে চলবে না। তাছাড়া, পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধদের প্রয়োজন বা চাহিদাগুলির পরিবর্তিত ধারণাগুলিকেও মাথায় রাখতে হবে। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান, গ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সমাজকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় করে তুলে কল্যাণমূলক কর্মসূচীতে নিযুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনে সেই সেবাসূচীকে বাধ্যতামূলকও করে তুলতে হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সমস্যার গভীরতা এবং বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কল্যাণমূলক কর্মসূচীর বিকেন্দ্রীকরণ ও সহায়তাদানের রসদের যোগানকে ধারবাহিক করাই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের মতো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা এবং সহানুভূতি-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আশ্চর্যভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেখানে পশ্চিমী দেশের রাজনৈতিক দলগুলি বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে দেখে থাকে, সেখানে আমাদের দেশে তাদের অবহেলা করা হয়। এই কারণে সমাজের তৃণমূল স্তরে বৃদ্ধদের সমস্যা ও তাঁদের কার্যকরী ভূমিকাগুলি সম্পর্কে কোনরকম সচেতনতা বা সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাই না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় যতদিন যুব সম্প্রদায় পিছিয়ে থাকবে, ততদিন এটি সমস্যা আকারেই আমাদের সমাজে অবস্থান করবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলির দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাবে আমরা বৃদ্ধদের পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হই। আমলাতান্ত্রিক লালফিতা, কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের অনীহা ইত্যাদি বৃদ্ধদের সহায়তাদানে বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন (NGO) বয়স্কদের জন্য যে সকল সেবামূলক কর্মসূচী নিয়ে থাকে, বিশেষ করে—

(ক) বৃদ্ধদের আবাসস্থল (Old Age Home) গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা দান।

(খ) স্বেচ্ছামূলক পরিষেবা এবং পেশাগত নানাবিধ নানাবিধ চিকিৎসা (occupational therapy)

(গ) প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত পরিষেবা, যেমন—মনোচিকিৎসা, পুনর্বাসন, পুষ্টির যোগান, বিনোদন, পরামর্শ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনমূলক কর্মসূচী।

(ঘ) ডে কেয়ার সেন্টার

এই সকল পরিষেবা সরকারি অর্থানুকূল্যে বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমে চললেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যেমন নগণ্য, আবার এই সকল প্রকল্পে সরকারি অর্থলগ্নির পরিমাণ যেমন সামান্য, তেমনি নিয়মিত অর্থযোগানেরও নানাবিধ সমস্যা থেকে গেছে। তাছাড়া আছে, বেসরকারি সংগঠনগুলির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, পর্যাপ্ত পরিষেবা দানের অক্ষমতা, দক্ষ কর্মী নিয়োগের অনীহা। এতগুলি নঞর্থক পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠে বয়স্কদের যথাযথ পরিষেবা দান তখনই সম্ভব, যখন সকলে মিলে বৃদ্ধদের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা সকলেই সেই পরিণতির দিকে, সেই বাণপ্রস্থের দিকে সদা ধাবিত হয়ে চলেছি।

## ২.৭ সারাংশ

সাধারণ অর্থে বৃদ্ধরা আজ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এর অন্যতম কারণ হল, তাঁদের জীবনের শারীরিক, মানসিক

এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতি। তাঁদের জীবনের এই কঠিন পরিস্থিতিতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম তাঁদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সঙ্গে সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধাজনক হয়ে উঠছে, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি করছে।

অতীতের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি বয়স্কদের সন্তোষজনক সংগতিবিধানের পূর্ণ সহায়ক ছিল। বৃদ্ধদের আনুপাতিক সংখ্যাও যেমন যথেষ্ট কম ছিল, তেমনি পরিবারগুলি বয়স্কদের যথাযথ সহায়তা এবং সেবা-যত্ন দানেও সক্ষম ছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত রূপ লাভ করায় এগুলির সঙ্গে বৃদ্ধদের সংগতিবিধানে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিচ্ছে। বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্য এবং পরিবারের সংকুচিত ভূমিকার ফলে প্রয়োজন বিকল্প সহায়ক পরিষেবামূলক পরিকাঠামো গঠন, যা কি না তৈরি হয়ে উঠছে না।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের মতো বিষয়গুলির উন্নয়নকল্পে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে বৃদ্ধদের সার্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এদেশের বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীও ক্রমবর্ধমান। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক চাহিদা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা এবং সামাজিক চাহিদাগুলিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তনশীল পরিবারের কাঠামো বৃদ্ধদের যথাযথ সহায়তা দানের যোগ্য ব্যবস্থাপক হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে না।

তাই ভারতবর্ষের মতো দেশে বৃদ্ধদের সমস্যাগুলি ক্রমশঃ সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। এই সমস্যাকে নিবারণ করা সমাজের দায়িত্ব হিসাবে বর্তেছে। কিন্তু এই অবস্থায় সাধারণ (public) সহায়তামূলক ব্যবস্থাদি বিকল্প হিসাবে দ্রুত গড়ে উঠলে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হত, কিন্তু সে আশা সুদূর-পরাহত।

সার্বিক অর্থে, আমরা আপাতঃ পর্যালোচনার মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সমস্যার প্রকৃতি, জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী, শারীরিক ও মনোজাগতিক অবস্থা এবং বৃদ্ধদের সামাজিক সংগতিবিধানের ওপর পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া, এ সংক্রান্ত ভারতীয় প্রতিচ্ছবি, সহায়তামূলক কর্মসূচী ইত্যাদির ওপর আলোকপাত ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

## ২.৮ প্রশ্নাবলী

**(ক) দীর্ঘ প্রশ্ন ঃ-**

(১) সমাজে বয়স্ক হবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কি কারণে বার্ধক্য সমস্যায় পরিণত হয়?

(২) বয়স্কদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কোন বিষয়গুলি আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন?

(৩) 'ঐতিহাসিক দিক থেকে আজকের বৃদ্ধরা এমন কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন, যা আর কোনো যুগের বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতায় আসেনি'—এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

(৪) ভারতীয় সমাজে বার্ধক্য সমস্যার সামাজিক কাঠামোগত কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(৫) বার্ধক্য সমস্যার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকারগুলি ব্যাখ্যা করুন।

**(খ) মধ্যম প্রশ্ন ঃ-**

(১) ভারতীয় সমাজে, বয়স্কদের জনসংখ্যাগত পরিস্থিতি কি?

(২) বার্ধক্য সমস্যার লিঙ্গগত পার্থক্য বা লিঙ্গগত বৈষম্য নির্দেশ করুন।

(৩) আজকের তুলনায় অতীতে, সমাজের সঙ্গে বয়স্কদের সামঞ্জস্যবিধান বা সংগতিবিধান কি কারণে সম্ভব হত?

(৪) বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাগত স্তর ও মান কি তাঁদের সমস্যার একটি কারণ?

(৫) সমাজে বয়স্কদের অর্থনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

(৬) বয়স্কদের মনস্তাত্ত্বিক ও আন্তঃসম্পর্কজনিত ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

(৭) বার্ধক্য সমস্যা নিবারণে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

**(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ-**

(১) বার্ধক্য সমস্যার প্রধান তিনটি বিষয়গত দিক কি?

(২) ভারতীয় জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি?

(৩) বৃদ্ধদের নির্ভরতার হার (old dependency ratio) কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

(৪) শহরাঞ্চলের তুলনায়, গ্রামাঞ্চলে আমরা বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য কেন দেখতে পাই?

(৬) বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

(৬) বৃদ্ধদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাগুলির উল্লেখ করুন।

(৭) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সমস্যার মূল পার্থক্যগুলি কি?

(৮) বৃদ্ধদের সামাজিক সমন্বয়ে প্রধান দুটি প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করুন।

(৯) ভারতীয় বিবাহ রীতি বৃদ্ধদের জন্য কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে?

(১০)ভারতীয় বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকারের নীতিগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

## ২.৯ গ্রন্থপঞ্জী


1. Binstocks, Robert H. and Linda K. George, (edts.) 1990, *Handbook of Ageing and the Social Sciences,* San Diego: Academic Process Inc.
2. Dandekar, Kumudini, 1996, *The Elderly in India,* New Delhi: Sage.
3. Kimmel, Douglas C. 1980, *Adulthood and Ageing,* New York: John Wiley & Sons.
4. Kohli, A. S. 1996, *Social Situation of The Aged in India,* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
5. Kumar, S. Vinay. 1991, *Family Life and the Socio-economic Problems of the Aged,* New Delhi: Ashish Publishing House.
6. Lamb, Sarah, Sept.-Dec. 1999, *Ageing, Gender and Widowhood: Perspectives from Rural West Bengal,* in Contributions to Indian Sociology.
7. Pati, P. N. and B. Jena (edts.) 1989, *Aged in India: Socio-Demographic Dimensions,* New Delhi: Ashish Publishing House.
8. Randel, Judith. et. al. (edts.) 1999, *The Ageing and Development Report,* London: Earthscan.
9. Soodan, Kripal Singh, 1975, *Ageing in India,* Calcutta : Minerva.

বিভিন্ন ধরনের দূষণ প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দূষণ দেখতে পাই। প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তরোত্তর হ্রাস ও দূষণ পরিবেশের পক্ষে আর বহনীয় নয়। ফলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ধরনের দূষণ, অল্পবৃষ্টি, নিরক্ষীয় অরণ্যের সংকোচন, ওজোন স্তরে ছিদ্র এবং ভূমণ্ডলীয় তাপন ইত্যাদি আমাদের অবিবেচক পরিবেশ শোষণের সম্পর্কে সচেতন করেছে। এরই ফলে আমরা পরিবেশের গুণমান নির্ধারণের নিরাপদ সীমা নির্দিষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি এবং পরিবেশ-আইন ও আইন-অমান্যকারীর শাস্তি বিধান প্রণয়ন করেছি।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে সমস্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন হয়েছে তার মধ্যে মুখ্যগুলি হল—

(১) পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬।

(২) পরিবেশ (সংরক্ষণ) বিধি, ১৯৮৬।

(৩) বিপজ্জনক বর্জ্য (তদারকি ও পরিচালন) বিধি ১৯৮৯।

(৪) বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, গুদামজাতকরণ এবং আমদানি সংক্রান্ত বিধি, ১৯৮৯।

(৫) বিপজ্জনক জীবাণু ও জেনেটিক প্রযুক্তির সাহায্যে সৃষ্ট শেষ এবং জীবাণুর উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত বিধি, ১৯৮৯।

(৬) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪, ১৯৭৮ সালে এটি সংশোধন করা হয়।

(৭) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সংশোধিত আইন, ১৯৮৮।

(৮) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস আইন, ১৯৭৭।

(৯) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস (সংশোধিত) আইন, ১৯৯১।

(১০) বেঙ্গল স্মোক নুইসেন্স আইন ১৯০৫ (১৯৮০-র ১লা মার্চ পর্যন্ত এই আইন সংশোধিত হয়েছে)।

(১১) ভারতীয় বয়লার আইন, ১৯২৩।

(১২) খনি ও খনিজদ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন, ১৯৪৭।

(১৩) ফ্যাক্টরি আইন বা কলকারখানা সংক্রান্ত আইন, ১৯৪৮।

(১৪) শিল্প (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন, ১৯৫১।

(১৫) পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিক্‌ল্ আইন ও নির্দেশাবলী।

(১৬) বায়ুদূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১।

(১৭) পরিবেশ (সংরক্ষণ) তৃতীয় সংশোধিত বিধি, ১৯৮৯।

১৯৮৬ সাল থেকে ভারতবর্ষে পরিবেশ সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রিন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ-অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টে তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দূষণ রোধ করার জন্য যে সকল আইনী ব্যবস্থা হয়েছে, তা অনুযায়ী শাস্তিবিধান এই বেঞ্চের আওতায় পড়ে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও পরিবেশ বিনষ্টকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিচারব্যবস্থা কাজ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অধিবেশন, কনভেনশন ও সম্মেলনে মত বিনিময় হয়েছে। ১৯৭২ সালে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, স্টক হোম, সুইডেনে অন্তঃরাষ্ট্রীয় (বিভিন্ন

# একক ২ ❑ গবেষণা প্রক্রিয়া

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ সমাজ বিজ্ঞান

২.৪ সামাজিক গবেষণা

২.৪.১ সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ

২.৪.২ সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়

২.৪.৩ সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অপব্যবহার

২.৫ মূল্যবান নিরপেক্ষ সমাজ বিজ্ঞান

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ উত্তর সংকেত

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

- সামাজিক গবেষণার ধারণা
- সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ সংক্রান্ত ধারণা
- সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়
- সামাজিক ব্যবহার ও অপব্যবহারগত দিক

## ২.২ প্রস্তাবনা

সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আদলে, সমাজ বিষয়ক জ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞান কোনো বিশ্বাস, ঐতিহ্য অনুমান বা সংস্কার ভিত্তিক জ্ঞান নয়। বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সমাজ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ

জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া হল সামাজিক গবেষণা। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে উপস্থিত জ্ঞানের পরিমার্জন এবং নূতন জ্ঞানের সংযোজন ঘটে থাকে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি ভেদে সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। গবেষণা বর্ণনা মূলক, ব্যাখ্যামূলক, তাত্ত্বিক, প্রয়োগমূলক প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে সব গবেষণাই কতকগুলি পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পর্যায়গুলি গবেষণাকে এক সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া রূপে উপস্থাপন করে। তবে গবেষণার দ্বারা জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের পরিশীলন এবং কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধান করা হলেও অনেক সময় কোনো অবাঞ্ছিত লক্ষ্যেও গবেষণা করা হয়ে থাকে। যেমন, কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থের অনুকূল ভাবধারা প্রচারের জন্য গবেষণা করা হতে পারে। একইক্রমে, কোনো কর্মসূচীর রূপায়ণ সংক্রান্ত সংবাদকে অতিরঞ্জিত বা অববর্ণিত করার জন্য গবেষণা করা হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। তাই, গবেষণায় গবেষককে মূল্যমান নিরপেক্ষ হতে হয়। মূল্যমানক্রমে গবেষণায় বিষয় বা প্রশ্ন মনোনয়ন করা যায়। কিন্তু, গবেষণা প্রক্রিয়া মূল্যমান নিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

## ২.৩ সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের জনক অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) সমাজ তত্ত্বকে (Sociology) সকল বিজ্ঞানের রাণী হিসাবে অভিহিত করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণে সমাজের অনুশীলন করে সমাজ সংক্রান্ত সাধারণ সূত্র নির্ধারণ সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি দৃষ্টবাদী পদ্ধতি (Positvist Method) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি কয়েকটি অনুমান নির্ভর ঃ সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়মানুগভাবে অনুসৃত হয়, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার দ্বারা ঐ নিয়ম নির্দেশ সম্ভব হয়ে থাকে, ঐ নিয়ম সর্বজনীন এবং সর্বকালীন হয়ে থাকে। এমিল ডুর্খেম (Emile Durkheim) এই দৃষ্টিভঙ্গীর এক পথপ্রদর্শক প্রবক্তা। তাঁর মতে সামাজিক ঘটনার (social facts) পর্যবেক্ষণ সূত্রে তথ্যাবলীর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণসূত্রে ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনা ঘটনার সহগমন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায়। ডুর্খেম তাঁর 'আত্মহনন' (suicide) সংক্রান্ত গবেষণায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আত্মহননের সাথে সামাজিক সংহতির (social cohesion) সম্পর্ক খুঁজে পান। দৃষ্টবাদী পদ্ধতি অনুসরণে ডুর্খেমের এই দৃষ্টান্তমূলক (exemplary) গবেষণা-ধরন পরবর্তীকালে সফলভাবে খুব একটা অনুসৃত হয়নি (Lenski : 1986)। ফলে সমাজবিজ্ঞানে এখনো সামান্যীকরণস্তর (generalization level) অনুযায়ী উচ্চনীচক্রমে (hierarchically) সুবিন্যস্ত সাধারণসূত্র নির্ধারণ সম্ভব হয়নি, যা থেকে অবরোহী অনুমান (deductive inference) সূত্রে পরীক্ষাযোগ্য কোনো পূর্ব নির্দেশ (prediction) বা প্রকল্প গঠন (hypothesis) সম্ভব হতে পারে। এদিক থেকে তত্ত্ব খণ্ডনের (refutation) কোনও অবকাশ না থাকায় সমাজ বিজ্ঞানে বিজ্ঞানপদবাচ্যতা নিয়ে ওঠে। তাই কার্ল পপার (Karl Popper) সমাজবিজ্ঞানকে মেকি-বিজ্ঞান (pseudoscience) বলে অভিহিত করেন। এছাড়া, সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও (Perspective) সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। আন্তঃক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে (Interactionist Perspective) হুইটলেম ডিলথে (Whitlem Dilthey) এরূপ মত পোষণ করেন যে, সচেতন ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ কোনও নিয়মের নিগড়ে যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হয় না। মানুষ স্বাধীনভাবে তার ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানের অনুসরণে মানবিক আচরণের পূর্বনির্দেশ বা কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে (Phenomenological Perspective) হুসেরল (Husserl) দৃষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) নির্ভর বিজ্ঞান মনস্কতার সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনন (subjective meaning)-কেই মানবিক আন্তঃক্রিয়ার মূলসূত্র বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতেও (Postmodernist Perspective) সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিগত মননের স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিসত্ত্বার (self) ধারণা খন্ডন করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতিগূত্রে জাত সমাজ সম্পর্কে কোনা সামগ্রিক ধারণার (metanarrative) নিশ্চয়তা পরিহার করে সমাজসংক্রান্ত বহুবিধ বক্তব্যকে (multiple narrative) স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সব বক্তব্যই সমগুরুত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে কোনোটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয় না। বদ্রীলাড়ের (Baudrillard) মতে খণ্ডিত এবং সংগতিবিহীন আধুনিকোত্তর সমাজের সংব্যাখ্যানে সমাজবিজ্ঞান (sociology) অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু ই.সি.কাফ, ডব্ল্যু. ডব্লু শারক এবং ডি. ডব্ল্যু. ফ্রান্সিস (E. C. Cuff, W. W. Sharrock & D. W. Francis) এর মতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজ সম্পর্কে কোনো চরম সত্যের নির্দেশ না দিতে পারলেও সমাজের কোনো সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে এবং সমাধান সূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। গিডেনস্ (Giddens) এর মতে তাঁর ভাষায় এটা হল "recursiveness of social knowledge"। এদিক থেকে সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজনীয় হওয়ায় সমাজ বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে সামাজিক গবেষণাও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। দৃষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করুন।

২। ডুর্খেমের 'আত্মহনন' সংক্রান্ত গবেষণার দৃষ্টান্তমূলক দিক কী?

৩। কার্ল পপার সমাজবিজ্ঞানকে মেকি-বিজ্ঞান বলার কারণ কী?

৪। হুসেরল 'নৈর্ব্যক্তিকতা' পরিহারের নির্দেশ দেন কেন?

## ২.৪ সামাজিক গবেষণা

সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান বিভিন্ন সূত্রে পাওয়ায় যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব প্রচার মাধ্যম সাধারণ বোধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইসব সূত্রে অর্জিত বা প্রাপ্তজ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হয় না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্জন করতে হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়া হল সামাজিক গবেষণা। পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young) এর মতে সামাজিক গবেষণা হল যুক্তিসিদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ কৌশল প্রয়োগকারী এক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল পুরানো তত্ত্বের সত্যাসত্য বিচার করা, নতুন তথ্য আবিষ্কার এবং প্রচলিত কোনো তত্ত্বের নিরিখে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক

আচরণের বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা। ডি. স্লোসিংগার এবং এম. স্টিভেনসন (D. Slessinger & M. Stevenson) এর মতে সামাজিক গবেষণা হল উপস্থিত জ্ঞানের বিস্তার, পরিমার্জন এবং সত্যায়নের জন্য ধারণা প্রতীক এবং বস্তুসমূহের সুনিপুণ প্রয়োগ (The manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge)।

**অনুশীলনী - ২**

১। গবেষণা ছাড়া সমাজসংক্রান্ত জ্ঞানলাভের অন্যান্য সূত্রগুলি উল্লেখ করুন।

২। সামাজিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়?

## ২.৪.১ সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ

লক্ষ্য (motive), উদ্দেশ্য (purpose) এবং কালগত দিক (time dimension) থেকে সামাজিক গবেষণার বিভিন্নরূপ উল্লেখিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যগত দিক থেকে তাত্ত্বিক গবেষণা (pure research) এবং প্রয়োগমূলক গবেষণা (applied research), উদ্দেশ্যগত দিক থেকে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (exploratory research), বর্ণানামূলক গবেষণা (descriptive research), ব্যাখ্যামূলক গবেষণা, কালমাত্রার দিক থেকে সময়ান্তরে গবেষণা (longitudinal study) এবং আড়া-আড়ি এক অংশের গবেষণা (cross sectional study) উল্লেখিত হয়ে থাকে।

**তাত্ত্বিক গবেষণা ঃ**

নিছক জানার জন্য বা জ্ঞানলাভের জন্য অনুসৃত গবেষণা তাত্ত্বিক, মৌলিক বা শুদ্ধ গবেষণা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই গবেষণায় সমাজ এবং সমাজসংশ্লিষ্ট মানুষের আচরণ সম্পর্কে মৌল ধারণা, সাধারণসূত্র বা তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের গবেষণা সমাজে যা আছে তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। কী হবে বা কী করা উচিত তা নির্দেশ করে না। সাম্প্রদায়িকতা সমস্যার উৎস ও কারণ নির্দেশ এই ধরনের গবেষণার উদাহরণ। কোনো গণবিক্ষোভ বা উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপের কারণ অনুসন্ধান এই ধরনের গবেষণার আরেকটি উদাহরণ।

**প্রয়োগমূলক গবেষণা ঃ**

সমাজের বা সমাজসংশ্লিষ্ট মানুষের অবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সহায়ক জ্ঞানান্বেষণ হল প্রয়োগমূলক গবেষণা। সাধারণত সমাজের কোনো আশু সমস্যা নিরসনের পন্থা নির্দেশ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণা কোনো সমস্যার 'কী' থেকে 'কী করা উচিত' তা নির্দেশ করে থাকে। এই ধরনের গবেষণা তাত্ত্বিক গবেষণার অনুপূরক হয়ে থাকে। যেমন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কারণ নির্দেশের পর ঐ সমস্যা নিরসনের পন্থা সুপারিশ, এই গবেষণা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। বাজার সমীক্ষা, জনমত সমীক্ষা, সরকারি নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা বা সরকারি কর্মসূচীর মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা এই প্রয়োগমূলক গবেষণার উদাহরণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এই দুই ধরনের গবেষণা আপাত স্বতন্ত্র মনে হলেও বাস্তবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে গবেষণা বিভিন্নরূপের আলোচনা একক ৩ এর অন্তর্ভুক্ত ৩.৫.১ অংশে। অন্বেষণ মূলক গবেষণা নকশা এবং বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপক গবেষক নকশা দ্রষ্টব্য।

**সময়ান্তরের গবেষণা ঃ**

এই ধরনের গবেষণায় পর্যবেক্ষণ একক সমূহের বৈশিষ্ট্যাবলীকে একাধিক সময়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ একাধিক বৎসর, মাস এবং সপ্তাহ অন্তরে করা হতে পারে। একই পর্যবেক্ষণগোষ্ঠীকে সময়ান্তরে পর্যবেক্ষণ করলে ইহা একই তালিকাভুক্ত গবেষণা (panel study) নামে অভিহিত। একই সমগ্রকের থেকে ভিন্ন সময়ে নির্বাচিত দুই ভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ সমগোত্রীয় অংশের গবেষণা (cohort study) নামে পরিচিত থাকে। উল্লেখ্য, একই বৎসরে জাত, বা বিবাহিত ব্যক্তিরা সমগোত্রীয় গোষ্ঠী হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো এক পর্যবেক্ষণ একক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ান্তরে পর্যবেক্ষণ করলে ঐ গবেষণা প্রবণতা বীক্ষা (trend study) নামে পরিচিত। সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনগত দিকের আলোকপাতে এই ধরনের গবেষণা বিশেষ ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় ইহা বেশি কার্যকরী হয়।

**আড়াআড়ি অংশের গবেষণা ঃ**

আড়াআড়ি অংশ বলতে কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর এক নমুনা অংশকে বোঝায়। আড়াআড়ি অংশের গবেষণায় ঐ অংশকে এককালীন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই ধরনের গবেষণা সরলতম এবং স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হলেও সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনশীলতার দিক এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকরা সম্ভব হয় না। বর্ণনামূলক গবেষণায় এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। তাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

২। প্রয়োগমূলক গবেষণা ঔচিত্যমূলক কেন?

৩। প্রবণতা বীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৪। সময়ান্তরে গবেষণা বলতে কী বোঝায়?

## ২.৪.২ সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। গবেষণার এই পর্যায় সমূহ উল্লেখের ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিদদের মধ্যে মতান্তর থাকতে দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাতটি স্তর উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই স্তরগুলি হল যথাক্রমে - গবেষণার বিষয় মনোনয়ন (selection of research topic), প্রকাশিত রচনার পর্যালোচনা (review of literature), গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্মাণ (formulating research design), তথ্য সংগ্রহ (data collection), তথ্য বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান (analysis and interpretation of data) এবং প্রতিবেদন পেশ (report writing), এই স্তরগুলি আপাত স্বতন্ত্র মনে হলেও বাস্তবে পর্যায়গুলি

একে অপরের সাথে যুক্ত। এ প্রসঙ্গে কে. ডি. বেইলি যথার্থই বলেন যে গবেষণা হল পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবন্ধ পর্যায় সমূহের এক সুনিব্যস্ত প্রক্রিয়া। এখন উল্লিখিত পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

**গবেষণার বিষয় মনোনয়ন ঃ**

গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হল গবেষণা সংক্রান্ত একটি সাধারণ আলোচ্যবিষয় মনোনয়ন করা। সেলটিক্স, জাহোদা ও অন্যান্যদের মতে এই আলোচ্যবিষয় বা গবেষণামূলক বিষয় কোনো বাস্তবসমস্যা সংক্রান্ত বা শুদ্ধজ্ঞানান্বেষী হতে পারে, গবেষকদের ব্যক্তিগত সমস্যা অনেক সময় গবেষণার বিষয় সূচিত করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গবেষকের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি গবেষণায় অর্থমঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকে।

**মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা ঃ**

গবেষণামূলক বিষয় নির্ধারণ করার পরে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে চর্চিত এবং প্রাপ্ত জ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী দেখার দরকার হয়। এ উদ্দেশ্যে গবেষককে বিষয়সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত রচনাসমূহ যেমন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সরকারি প্রতিবেদন ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে হয়।

**গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্মাণ ঃ**

গবেষণা কার্য যথার্থ অর্থে গবেষণামূলক সমস্যা গঠন থেকেই শুরু হয়ে থাকে। গবেষণা বিষয় সম্পর্কে প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষক, মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা এবং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণামূলক সমস্যা নির্ধারণ করতে হয়। গবেষণামূলক সমস্যা প্রশ্নের আকারে লেখা হয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে গবেষণার চালানোর জন্য পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young), সেলটিস, জাহোদা এবং অন্যান্যদের (Seltiz, Jahoda) মতে গবেষণামূলক প্রশ্ন সংখ্যা স্বল্প হওয়া দরকার। বর্ণনামূলক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন যথেষ্ট হলেও ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্নের পরীক্ষণমূলক উত্তর ও প্রাক্‌নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষামূলক উত্তরকে প্রকল্প (hypothesis) বলে। সি. কোঠারি (C. Kothari) প্রকল্পকে পরীক্ষামূলক অনুমান (tentative assumption) বলে অভিহিত করেন। বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রাপ্তসংবাদ এবং গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে প্রকল্প গঠন করা হলে ইহা আরোহীসূত্রে (inductive) গঠিত প্রকল্প হয়ে থাকে। নিছক ধারণা, অনুমান এবং কোনো তত্ত্বসূত্রে অবরোহী (deductive) প্রক্রিয়ায়ও প্রকল্প গঠিত হতে পারে। সেলটিজ এবং অন্যান্যরা সামাজিক গবেষণায় তিন ধরনের প্রকল্পের উল্লেখ করেন সামাজিক অবস্থা বর্ণনাত্মক (assertive), একাধিক চলের সম্পর্ক নির্দেশক (associational) এবং কারণ নির্দেশক (causal) প্রকল্প কোনো গবেষণার আলোচ্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর নির্দেশ করে থাকে।

**গবেষণার নক্‌শা প্রস্তুত কর ঃ**

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা কার্য অনুসরণের জন্য গবেষণা নক্‌শা গঠন জরুরি হয়ে থাকে। কোঠারির মতে কম খরচে, অল্প সময়ে এবং প্রচেষ্টায় গবেষণা ক্রিয়া সমাপন করার দিক নির্দেশ গবেষণা নক্‌শা প্রদান করে থাকে।

পর্যবেক্ষণ, একক নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখ গবেষণা নক্শায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে গবেষণা নক্শায় এই দিকগুলি সাধারণভাবে উল্লেখিত থাকলেও বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় নক্শার কিছু স্বতন্ত্র্য বা তারতম্য থাকে।

**তথ্য সংগ্রহ ঃ**

তথ্য সংগ্রহ গবেষণার এক মূল পর্যায়। তথ্যের বিচারেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় এবং গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তথ্য দুই ধরনের হয়—প্রত্যক্ষ তথ্য (primary data) এবং পরোক্ষ তথ্য (secondary data), পর্যবেক্ষণ এককের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য হয় প্রত্যক্ষ তথ্য এবং অন্যের প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত ও সরকারি নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য হয় পরোক্ষ তথ্য। নিরীক্ষা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, একক বিশেষ সমীক্ষা ও পরীক্ষণ সূত্রে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা প্রয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

**তথ্য বিশ্লেষণ ঃ**

সংগৃহীত তথ্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করেনা। বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তথ্যাবলী অর্থবহ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সংগৃহীত তথ্যাবলী দুই ধরনের হয়ে থাকে— গুণবাচক তথ্য (qualitative data) এবং পরিমাণ বাচক তথ্য (quantitive data)। ক্ষেত্রগবেষণা একক বিশেষ গবেষণাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী মূলত গুণবাচক হয়ে থাকে। আবার নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক গবেষণাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী মূলত পরিমাণ বাচক হয়ে থাকে। এই দুই প্রকার তথ্যবিশ্লেষণ ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। প্রথম ধরনের তথ্যের বিশ্লেষণে গুণবাচক সংকেতায়ন (qualitative coding) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের (aspect) তথ্যাবলীকে আলাদা করে বিভিন্ন বর্গে (category) চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর এক বর্গের সাথে সম্পর্কান্বিত অপর বর্গ/বর্গসমূহকে একই বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করে এক একটি ধরন (pattern) চিহ্নিত করতে হয়। এখন বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা সূত্রে কোনো 'ভূমিস্থ' বা সামাজিক বাস্তব অযত্ন ও অকৃত্রিম পর্যবেক্ষণের ওপর গড়ে ওঠা তত্ত্ব (grounded theory) নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ধরন নির্দেশ করে প্রস্তাবিত তত্ত্বের ক্ষেত্রসীমিতকরণ বা পরিমার্জনও করা হয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে, পরিমাণগত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে পরিমাণগত সংকেতায়ন (quantitative coding) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পরিমাণগত তথ্যাবলীর সারণীবন্ধকরণ করা হয়ে থাকে। অতঃপর পরিসংখ্যান পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে তথ্যাবলী সংক্ষেপায়ন ও বিভিন্ন চলের (variable) মধ্যে সম্পর্ক (correlation) নির্দেশ পূর্বক তথ্যবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া আরোহী পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ায় (inferential statistics) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরীক্ষণ করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের (theory) সত্যায়ন (verification) বা পরিমার্জন (rectification) করা হয়ে থাকে।

**গবেষণার প্রতিবেদন ঃ**

গবেষণা প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত পর্যায় হল গবেষণার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হল গবেষণার তথ্য বা জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তি বা সমষ্টিকে জানানো। এ. কে. সিং (A. K. Singh) এর মতে গবেষণার সমস্যা

অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রাপ্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত গবেষণার প্রতিবেদনে পেশ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রতিবেদন মোটামুটিভাবে সাতটি অংশ সমন্বিত একটি ফর্মায় পেশ করা হয়ে থাকে এই অংশগুলি হল যথাক্রমে— গবেষণামূলক সমস্যা, নির্দেশ, প্রকাশিত রচনার পর্যালোচনা, প্রকল্প নির্দেশ বা গবেষণামূলক প্রশ্নের উল্লেখ, গবেষণা পদ্ধতি নির্দেশ, প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং উপসংহার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদন এইরূপ নির্দিষ্ট অংশসমূহে কদাচিত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে এই প্রতিবেদনে তত্ত্বনির্দেশকে তথ্য থেকে স্বতন্ত্র করা যায় না। ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদন, বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক এবং তত্ত্বনির্ভর হয়ে থাকে। বর্ণনাত্মক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে তথ্যসংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ একই সাথে অনুসৃত হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে তথ্যসাপেক্ষ সাধারণ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। এই প্রতিবেদনে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ ঘটে থাকে।

**অনুশীলনী** - ৪

১। গবেষণা প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলি পারস্পরিক সম্পর্কের কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন।

২। গবেষণা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট দিকগুলি কী কী?

৩। প্রকল্প কাকে বলে? প্রকল্পের কাজ কী?

৪। গবেষণা নক্‌শার কাজ কী?

৫। গবেষণা প্রতিবেদন বলতে কী বোঝায়?

## ২.৪.৩ সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অপব্যবহার

সামাজিক গবেষণা অনেকসময় সম্পূর্ণ নিরর্থক (completely worthless) এবং অনৈতিক (unethical) কার্যক্রম বলে সমালোচিত হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গবেষণার ব্যবহার এবং অপব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে সব গবেষণারই কিছু অবদান থাকে। রবার্ট মার্টন (Robert Merton) এর মতে এই অবদান দ্বিবিধ হয়ে থাকে—জ্ঞান সংযোজন এবং অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। এই দুই লক্ষ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যবহারসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক লক্ষ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর নিরুপদ্রবে থাকার বা গোপনতা রক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই কারণেই গবেষণার অপব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভালো। এখন থেরিসি বেকারের (Therese Baker) অনুসরণে সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অব্যবহার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যাক।

সামাজিক গবেষণা ব্যবহারগত দিক থেকে অর্থবহ হয় যদি—

(ক) গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার দিক উন্মোচিত করে।

(খ) গবেষণার লক্ষ্য এবং প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়ে থাকে।

(গ) গবেষণা কোনা ব্যতিক্রমী সামাজিক ঘটনা বা স্বল্প পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য বা জ্ঞান প্রতিবেদিত করে থাকে।

(ঘ) গবেষণা গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সাথে সংপৃক্ত হয়ে থাকে।

সামাজিক গবেষণার বিষয় মানব সমাজের এবং মানুষের আচরণের যে কোনো দিক যেমন, সমকামী সম্পর্ক, নগ্ন-স্নান ইত্যাদি ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। এই অপব্যবহার সাধারণত ছদ্ম-গবেষণায় (covert research), বলপ্রয়োগপূর্বক গবেষণায় (coercive research) এবং ব্যক্তিগত গোপনতায় হস্তক্ষেপকারী (research with invasion of privacy) গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ছদ্ম-গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বা গোষ্ঠীর সায় না নিয়ে বা অজান্তে গবেষক ক্রিয়া অনুসরণ করায় এবং নিজের আসল পরিচয় গোপন করে অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ রত হওয়ায় কাজটি নীতিগত দিক থেকে গর্হিত হয়। এছাড়া এই ধরনের গবেষণা প্রক্রিয়ায় অপরের ব্যক্তিগতক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করা হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকাসূত্রে অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। জোর করে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে গবেষণায় শামিল করার ক্ষেত্রেও নীতিগত বৈকল্যসূত্রে অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, কয়েদখানার তদারককারী আধিকারিকের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন শাসানি-ক্রমে কয়েদিদের কোনো গবেষণা প্রক্রিয়ায় শা মিল করানোর ক্ষেত্রে অপব্যবহার স্পষ্ট হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত গোপনতায় হস্তক্ষেপ ছদ্মগবেষণায় ঘটে থাকে। লাউড হামফ্রে (Laud Humphrey) অনুসৃত পুরুষ সমকামী সংক্রান্ত ছদ্মগবেষণা (১৯৭০) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হামফ্রে সাধারণ বিশ্রামকক্ষের (public restroom) দ্বাররক্ষীর কাছে নিযুক্ত বিশ্রাম কক্ষে সমকামিতা সম্পর্ক নিকট পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তাঁর এই গবেষকের ভূমিকা সমকামী পুরুষসঙ্গীদের জানা ছিলনা। ফলে, তাদের ব্যক্তিগত গোপন ক্ষেত্রে অযাচিত অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা সূত্রে অপব্যবহার ঘটতে দেখা যায়।

উপরিউল্লিখত ক্ষেত্র ছাড়া গবেষণায় অপব্যবহারের আর একটি ক্ষেত্র হল গবেষণার প্রতিবেদন। গবেষণা প্রতিবেদনে দুইরকম অপব্যবহার উল্লেখিত হয়ে থাকে। একটি হল গবেষণায় প্রস্তাবিত প্রকল্প, অনুমান বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্যাবলীর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার বা অনুকূল সংস্থাপন করা। সাইরিল বার্ট (Cytil Burt) অনুসৃত সমকোষী যমজসন্তানদের (স্বতন্ত্রভাবে পালিত) বুদ্ধাঙ্ক নির্ণায়ক গবেষণা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। তিনি ১৯৫৫, ১৯৫৮ এবং ১৯৬৬ সালে যথাক্রমে ২১ জোড়া, ৩০ জোড়া এবং ৫৩ জোড়া স্বতন্ত্রভাবে পালিত সমকোষী যমজদের বুদ্ধাঙ্ক সহগাঙ্ক অর্থাৎ .৭৭১ দেখান। সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যের ক্ষেত্রেই একই সহসম্বন্ধ সহগাঙ্ক উপস্থিত থাকে না। লিওঁ কামিন এই গবেষণা প্রতিবেদনে ত্রুটি নিরীক্ষণ করেন। তাঁর মতে উল্লিখিত তথ্যের অন্তরালে থাকা সাক্ষাৎসমূহ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে অপর এক অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয় অন্যের গবেষণার অংশ সূত্রস্বীকৃতি ছাড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করায়। ইহা প্রতারণার শামিল হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৫**

১। সামাজিক গবেষণার অবদান বলতে কী বোঝায়?

২। গবেষণা প্রতিবেদনে কী ধরনের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

৩। কোন কোন ধরনের গবেষণায় সাধারণ অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

## ২.৫ মূল্যমান নিরপেক্ষ সমাজতত্ত্ব

দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আদলে পক্ষপাতহীন, নৈর্ব্যক্তিক এবং মূল্যমান-নিরপেক্ষ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যেমন অসংপৃক্ত ভাবে জড়পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকে সমাজ বিজ্ঞানীও তদ্রূপ সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু দৃষ্টবাদী থেকে ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber), আলভিন গোল্ডনার (Alvin Gouldner), কার্ল ম্যানহাইম (Karl Manheim) প্রমুখ সমাজবিদরা সামাজিক গবেষণায় গবেষকের বিষয়ীগত মননের ভূমিকার (subjective role) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হ্বেবারের মতে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমধর্মী নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী জড়পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকে। এই জড়পদার্থের সাথে বিজ্ঞানীর কোনো প্রত্যক্ষ অনুভবের সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভজনের মাধ্যমে সামাজিক আচরণে গবেষণা করায় আন্তঃবিষয়ী (Inter-subjectivity) সম্পর্ক উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক মূল্যবোধের সূত্রেই সামাজিক আচরণ অর্থবহ হয়ে থাকে। তাই সমাজতত্ত্ব বাস্তব (facts) এবং মূল্যবোধকে (value) বিচ্ছিন্ন করা যায়না। যেমন, বর্ণবৈষম্য (racialism) সংক্রান্ত গবেষণায় জৈবিক পার্থক্য খুব বেশি প্রাসঙ্গিক না হয়ে ইহার সামাজিক দ্যোতনাই (social meaning) বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এছাড়া হ্বেবারের মতে সামাজিক গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকের স্বীয় অবস্থান থাকে। বস্তুতপক্ষে মূল্যবোধ জড়িত স্বীয় অবস্থান সূত্রেই তিনি গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে থাকেন। তবে, গবেষণা বিষয় মনোনয়নের পরে গবেষণার কৌশল প্রয়োগ, প্রাপ্ততথ্য বিশ্লেষণে এবং প্রতিবেদন পেশ করার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিককে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হওয়ার নির্দেশ হ্বেবার উল্লেখ করে থাকেন। গোল্ডনারের মতে মূল্যবোধজনিত নিরপেক্ষতার আড়ালে গবেষকের কোনো বিশেষ মূল্যবোধ গোপন করার চেষ্টা থাকে। এদিক থেকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাই একটি মূল্যবোধে পর্যবসিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন গবেষণায় সমাজতাত্ত্বিকের মূল্যবোধ স্পষ্ট করা দরকার। আবার সামাজিক প্রেক্ষিতেই ধারণা সৃষ্ট হওয়ায় কার্ল ম্যানহেম মূল্যমান নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণার তত্ত্ব বাতিল করে থাকেন। অতএব, সমাজতত্ত্ব ক্ষেত্রবিশেষে মূল্যমান সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৬**

১। সামাজিক গবেষণার কোন পর্যায় মূল্যবোধ যুক্ত থাকতে পারে?

২। সামাজিক গবেষণার কোন কোন পর্যায়ে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থাকা উচিত?

৩। মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাই একটি বিশেষ মূল্যবোধ কেন?

## ২.৬ সারাংশ

সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য অনুসারী বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখিত হয়ে থাকে। কিন্তু সচেতন ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচার আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে জড় বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্বাংশে প্রযোজ্য হয় না। এছাড়া মানুষের সামাজিক আচরণ যান্ত্রিকভাবে নিয়মানুগ না হওয়ায় এ সম্পর্কে কোনও সাধারণসূত্র নির্ধারণ সম্ভব হয় না। তবে সমাজের বিভিন্ন দিকের তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। এদিক থেকে সামাজিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিগত ভাবে সমাজের অনুশীলনই হল সামাজিক গবেষণা। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাল ইত্যাদি ভেদে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়—তাত্ত্বিক, প্রয়োগমূলক, অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক, সময়ান্তরের এবং আড়াআড়ি অংশের গবেষণা। সামাজিক গবেষণা সুসংবদ্ধভাবে বিভিন্নপর্বে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পর্বগুলি হল ঃ বিষয় মনোনয়ন, মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, গবেষণামূলক প্রজন্ম বা প্রকল্প গঠন, গবেষণা নক্‌শা প্রস্তুতকরণ, নমুনায়ন তথ্য সংগ্রহ, তথ্যবিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন। সামাজিক গবেষণা প্রতিবেদন সামাজিক অবস্থা বা সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে এবং ঐ সমস্যা নিরসনের পন্থা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে গবেষণা প্রক্রিয়ায় অপপ্রয়োগ সম্ভাবনাও থাকে। বিশেষ করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষকের পরিচয় ইত্যাদি না জানিয়ে ছদ্ম-গবেষণা সূত্রে এই অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে গবেষকের জানার অধিকারের সাথে ব্যক্তির গোপনতা রক্ষার অধিকারের সংঘাত ঘটে থাকে। এছাড়া, সামাজিক গবেষণা সম্পূর্ণ মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না। গবেষণার বিষয় নির্বাচনই মূল্যবোধসূত্রে ঘটে থাকে। তবে, গবেষণা বিষয় নির্বাচনের পরে গবেষণা প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্বে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বা মূল্যবোধনিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

## ২.৭ অনুশীলনী

১। সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞান পদবাচ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টবাদবিরোধী বক্তব্য কী?

২। আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ বিজ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় বলা হয় কেন?

৩। তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রয়োগমূলক গবেষণা কী একে অপর থেকে স্বতন্ত্র?

৪। আড়াআড়ি অংশের গবেষণা কাকে বলে? এই গবেষণার অসুবিধা কী?

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনগুলি উল্লেখ করুন। আরোহী এবং অবরোহী প্রকল্পের পার্থক্য কী?

৬। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তথ্য কাকে বলে?

৭। গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াগত দিক উল্লেখ করুন।

৮। ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট দিক উল্লেখ করুন।

৯। সামাজিক গবেষণার কয়েকটি ব্যবহারিক দিক উল্লেখ করুন।

১০। ছদ্ম-গবেষণায় কী ধরনের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

১১। বলপ্রয়োগপূর্বক গবেষণায় অপব্যবহারের অবকাশ কোথায়?

১২। সমাজবিজ্ঞানে বাস্তব ও মূল্যবোধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কেন?

## ২.৮ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী - ১**

১। দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি অনুমান হল ঃ

(ক) সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়মানুগভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে;

(খ) বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে ঐ নিয়ম নির্দেশ করা সম্ভব;

(গ) ঐ নিয়মগুলির সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা বিদ্যমান থাকে।

২। ডুর্খেমের 'আত্মহনন' তত্ত্বের দৃষ্টান্তমূলক দিক হল দৃষ্টবাদী পদ্ধতি অনুসরণে আত্মহনন সংক্রান্ত তথ্যাবলী পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে ঐ ঘটনার সাথে সামাজিক সংহতির সম্পর্ক নির্দেশ করা।

৩। সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো সুগঠিত না হওয়ায় ঐ তত্ত্ব থেকে প্রকল্প গঠন এবং খণ্ডন সূত্রে মূলতাত্ত্বিক কাঠামো খণ্ডনের অবকাশ না থাকায় সমাজবিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান হয়ে থাকে।

৪। হুর্সেল-এর মতে ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া ব্যক্তিগত অর্থবোধসূত্রে অনুসৃত হওয়ায় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কোন থেকে তা দেখা যথেষ্ট হয় না।

**অনুশীলনী - ২**

১। গবেষণা ছাড়া সমাজসংক্রান্ত জ্ঞানলাভের অন্যান্য সূত্রগুলি হল ঃ ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব, প্রচার মাধ্যম, সাধারণ বোধ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

২। সামাজিক গবেষণা হল যুক্তিসিদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ কৌশল প্রয়োগকারী এক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল পুরানো তত্ত্বের সত্যাসত্যের বিচার, নতুন তথ্য আবিষ্কার এবং উপস্থিত কোনো তত্ত্বের নিরিখে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক আচরণের বিশ্লেষণ মূলক তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা।

**অনুশীলনী - ৩**

১। নিছক জানা বা জ্ঞানার্জন হল তাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্য।

২। প্রয়োগমূলক গবেষণা সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়নের পন্থা পদ্ধতি সুপারিশ করায় ঔচিত্য মূলক হয়ে থাকে।

৩। কোনো পর্যবেক্ষণ একক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করলে উহা প্রবণতা বীক্ষা নামে পরিচিত হয়ে থাকে।

৪। পর্যবেক্ষণ একক সমূহের একাধিক সময়ে পর্যবেক্ষণকে সময়ান্তরের গবেষণা বলে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। সামাজিক গবেষণার পর্যায়গুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত থাকে, যেমন, গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্পের সাথে গবেষণা নকশা সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই গবেষণা নকশাই প্রকল্প পরীক্ষণের কৃৎ-কৌশল ও রূপরেখা নির্দেশ করে থাকে। আবার কী ধরনের তথ্য দরকার এবং কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তাও গবেষণা নকশায় পূর্বনির্দেশিত থাকে।

২। প্রকল্প হল পরীক্ষামূলক অনুমান। প্রকল্প কোনো গবেষণার আলোচ্য ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী নির্দেশ করে থাকে।

৩। গবেষণা নকশা হল কম খরচে, অল্প সময়ে এবং প্রচেষ্টায় গবেষণা ক্রিয়া চালানোর এক দিক নির্দেশ।

৪। গবেষণার প্রাপ্ত সংবাদ বা জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিদের অবহতির জন্য লিখিতভাবে পেশ করা হল গবেষণা প্রতিবেদন।

**অনুশীলনী - ৫**

১। সামাজিক গবেষণার অবদান হল জ্ঞানসংযোজন এবং অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

২। গবেষণা প্রতিবেদনে দুই ধরনের অপব্যবহার দেখা যায়। একটি হল গবেষণায় প্রস্তাবিত প্রকল্প বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্যাবলীর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করা। অপর অপব্যবহার হল অন্যের গবেষণার অংশ সূত্রস্বীকৃতি ছাড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩। অপব্যবহার সাধারণত ছদ্ম-গবেষণায়, বলপ্রয়োগ পূর্বক গবেষণায় এবং ব্যক্তিগত গোপনতা বিঘ্নকারী গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৬**

১। সামাজিক গবেষণায় গবেষণার বিষয় মনোনয়নে মূল্যবোধ জড়িত থাকে।

২। সামাজিক গবেষণায় তথ্যসংগ্রহে, তথ্যবিশ্লেষণে এবং প্রতিবেদনে মূল্যবোধজনিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়।

৩। কোনো বিষয়ে গবেষণা শুরু করার মধ্যে গবেষকের বা গবেষণার পৃষ্ঠপোষকের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা ধারণার আড়ালে ঐ মূল্যবোধ লুকানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা একটি বিশেষ মূল্যবোধ হিসাবে অবস্থান করে থাকে।

**অনুশীলনী ঃ**

১। সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টবাদবিরোধীদের বক্তব্য হল সমাজতত্ত্ব জড়পদার্থ নিয়ে আলোচনা করে না। মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। সচেতন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ কোনো নিয়মের নিগড়ে যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হয় না। মানুষ স্বাধীনভাবে অর্থবহ ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসরণে মানুষের আচরণের পূর্বনির্দেশ বা কার্যকারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিক থেকে সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞান পদবাচ্যতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

২। আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথাগত সামাজিক রীতি-নীতি ও কাঠামোর কর্তৃত্ব অস্বীকার হয়, এবং একইক্রমে ব্যক্তিগত মননের স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তিসঞ্জার ধারণা খণ্ডন করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতি সূত্রে জাত সমাজ সম্পর্কে সাধারণ নির্ধারণের নিশ্চয়তা অস্বীকার করা হয়ে থাকে। তাই খণ্ডিত এবং সংগতি বিহীন আধুনিকোত্তর সমাজের চিত্রায়নে প্রচলিত সমাজতত্ত্ব অনুপযোগী।

৩। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাত্ত্বিক গবেষণা এবং প্রয়োগমূলক গবেষণা ভিন্ন রকম হলেও বস্তুতপক্ষে একে অপরের সম্পূরক হয়ে থাকে। কোনো বিষয় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা ঐ বিষয়ের জটিলতার বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আবার, ঐ সম্পর্কসূত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু সমাধানসূত্রে প্রয়োগমূলক গবেষণায় নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কোনো নির্দেশনার মূল্যায়ন বা সত্যায়ন ঘটে থাকে। এদিক থেকে উল্লিখিত দুই ধরনের গবেষণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে।

৪। কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর এক নমুনা অংশকে এককালীন পর্যবেক্ষণ করাকে আড়াআড়ি অংশের গবেষণা বলে। এই গবেষণার অসুবিধাজনক দিক হল সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনশীলতার দিক থেকে এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণগুলি হল, বর্ণনাত্মক প্রকল্প, সম্পর্ক নির্দেশক প্রকল্প এবং কারণ নির্দেশক প্রকল্প। বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রাপ্তসংবাদ এবং গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে গঠিত প্রকল্প হল আরোহী প্রকল্প। আবার, নিছক ধারণা অনুমান এবং কোনো তত্ত্বসূত্রে গঠিত প্রকল্প অবরোহী প্রকল্প হয়ে থাকে।

৬। পর্যবেক্ষণ এককদের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য হল প্রত্যক্ষ তথ্য। অন্যের প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত ও সরকারি নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য পরোক্ষ তথ্য।

৭। গুণবাচক তথ্যবিশ্লেষণে গুণবাচক সংকেতায়ন প্রক্রিয়া করে তথ্যাবলীকে আলাদা করে বিভিন্ন বর্গে বিন্যস্ত করতে হয়, অতঃপর এক বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপর বর্গ/বর্গসমূহকে একই বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করে এক একটি ধরন নির্দেশ করতে হয়। এরপর, বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা সূত্রে কোনো ভূমিস্থ তত্ত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ব্যতিক্রমী ধরণ নির্দেশ করে প্রস্তাবিত তত্ত্বের ক্ষেত্র সীমিত করা হয়ে থাকে।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদত্ত হয় না। এই প্রতিবেদনের প্রাথমিক পর্যায়ে কখনো মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিবেদনের শেষস্তরে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এই প্রতিবেদনে তত্ত্ব ও তথ্যকে আলাদা করা যায় না। এই প্রতিবেদন তিন ধরনের হয়ে থাকে— বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক ও তাত্ত্বিক। বর্ণনাত্মক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। বিশেষণাত্মক প্রতিবেদনে তথ্যসংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে তথ্যসাপেক্ষ সাধারণ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে।

৯। সামাজিক গবেষণার কয়েকটি ব্যবহারিক দিক হল ঃ

(ক) গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যবলী সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার দিক উন্মোচিত করে।

(খ) গবেষণার প্রাপ্তসংবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়ে থাকে;

(গ) গবেষণা কোনো ব্যতিক্রমী সামাজিক ঘটনা বা স্বল্প পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে বেশি স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ বা জ্ঞান প্রতিবেদিত করে।

১০। ছদ্ম গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সায় না নিয়ে বা অজান্তে গবেষক গবেষণা অনুসরণ করায় এবং নিজের আসল পরিচয় গোপন করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণরত হওয়ায় কাজটি নীতিগত অপব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে থাকে। এছাড়া, এই ধরনের গবেষণা অপরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা নিরুপদ্রবে বসবাস করার ক্ষেত্রে অযাচিত বিঘ্ন সৃষ্টি করায় ব্যক্তির গোপনতা রক্ষার অধিকারে অন্তরায় হয়ে থাকে।

১১। বলপ্রয়োগমূলক গবেষণায় উত্তরদাতাদের উপর কর্তৃত্বের শাসানি বা প্রভাবসূত্রে অপব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১২। সমাজতাত্ত্বিক মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভবনের মাধ্যমে সামাজিক আচরণের গবেষণা করায় আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক মূল্যবোধের সূত্রেই সামাজিক আচরণ অর্থবহ হয়ে থাকে। তাই, সমাজতত্ত্বে বাস্তব ও মূল্যবোধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

## ২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেইলি. কে. ডি. মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (থার্ড এডন) ফ্রিপ্রেস নিউইয়র্ক, ১৯৮৭।

২। কোঠারি, সি. কে. রিসার্চ মেথডোলোজি ঃ মেথডস্ এন্ড টেকনিকস (সেকেন্ড এডন) উইলি হস্টার্ন লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

৩। বেকার, থেরিসি, এল. ডুইং সোশ্যাল রিচার্স (সেকন্ড এডন) ম্যাক গ্রহীল, ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৪। নিউম্যান, লরেন্স ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস্ - কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপ্রোচেস (থার্ড এডন) এলীন এন্ড বেকন, বোষ্টন, ১৯৯৭।

৫। চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (সেকন্ড এডন) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা ২০০২।

## একক ৩ ❑ গবেষণার নকশা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

৩.৪ গবেষণামূলক সমস্যা গঠন

৩.৫ গবেষণার নকশা

৩.৫.১ গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ

৩.৫.২ গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ উত্তরমালা

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল

- গবেষণার বিভিন্ন উদ্দেশ্য
- গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের বিভিন্ন দিক
- গবেষণা নকশা বিভিন্ন রূপ ও স্তর

## ৩.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্য তত্ত্বগত এবং প্রয়োগমূলক হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুসারে অনুসৃত গবেষণায় সাধারণত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। গবেষণার শুরুতেই ঐ গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করা হয়ে থাকে। এই প্রশ্ন গঠন বিভিন্ন সূত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেই তার উত্তর অন্বেষণ সহজ হয় না। এক্ষেত্রে গবেষণার নকশা প্রস্তুত করা দরকার। গবেষণা

নকশা গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পথ নির্দেশক করে থাকে। গবেষণা নকশা বিভিন্ন স্তর সম্বলিত হয়ে থাকে। তবে, গবেষণার রূপভেদ গবেষণা নকশারও রকমফের দেখা যায়। এখন এই এককে গবেষণামূলক প্রশ্নগঠন উল্লেখে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর ও রূপের পরিচয় দেওয়া হল।

## ৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

যদিও প্রতি গবেষণার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে সাধারণভাবে সামাজিক গবেষণা নিম্নবর্ণিত যে কোনো উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়ে থাকে।

১। সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া অথবা ঐ ঘটনা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা অন্বেষণমূলক গবেষণা বলে পরিচিত থাকে।

২। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলীর যথার্থ বিবরণ প্রদান। এই উদ্দেশ্য অনুসৃত গবেষণা বর্ণনামূলক গবেষণা নামে পরিচিত থাকে।

৩। কোনো ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয়। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যাখ্যামূলক বা গবেষণা নামে পরিচিত থাকে।

৪। একাধিক চলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশক প্রকল্প পরীক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা (প্রকল্প) পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে পরিচিত।

**অনুশীলনী - ১**

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা উদ্দেশ্য কী?

২। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা উদ্দেশ্য কী?

## ৩.৪ গবেষণামূলক সমস্যা গঠন

প্রকৃতপক্ষে গবেষণামূলক সমস্যা রচনাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সোপান হয়ে থাকে। গবেষণামূলক সমস্যা বলতে তাত্ত্বিক বা বাস্তবক্ষেত্রের কোনো জটিলতা নির্দেশকে বোঝায়। কোহেন এবং ন্যাগেলের (Cohen & Nagel) মতে এই জটিলতা বা সমস্যাই ঐ অনুসন্ধানের দ্যোতক হয়ে থাকে। তবে সব ধরনের গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন করতে হয় না। অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Exploratory research) গবেষণামূলক প্রশ্ন তৈরি করা দিয়ে শুরু করা হয় না; এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হল (পরিণতি) গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্দেশ করা। অন্যান্য গবেষণায় যেমন বর্ণনামূলক (Descriptive) ও ব্যাখ্যামূলক (Explanatory) গবেষণায়, গবেষণামূলক প্রশ্ন তৈরি এক জরুরি প্রাথমিক পদক্ষেপ। তবে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। গবেষণামূলক সমস্যা নির্দিষ্ট এবং পরীক্ষণযোগ্য হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young) প্রদত্ত কয়েকটি পরামর্শ বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। গবেষণামূলক সমস্যা রচনায় ঐ সমস্যা অনুসন্ধানে কত সময় পাওয়া যাবে যে সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। এছাড়া, উপকরণের সীমাবদ্ধতা এবং উপস্থিত পন্থা পদ্ধতির প্রযোজ্যতা সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া দরকার। সেলটিজ এবং অন্যান্যদের (Seltiz ctal) মতে গবেষণামূলক প্রশ্ন রচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত কোনো নির্দেশ দেওয়া যায়না। তবুও, অভিজ্ঞতাসূত্রে তাঁরা কয়েকটি সহায়ক পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। এগুলি হল—(ক) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া, (খ) গবেষণা বিষয় সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী (পুস্তক, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি) পাঠের দ্বারা বিষয় সম্পর্কে যথার্থ অবহিত হওয়া এবং (গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার দ্বারা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত হওয়া। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ বা অনুসরণ করে গবেষণা বিষয়ের অপেক্ষাকৃত জটিল সমস্যামূলক দিকগুলি অনুধাবন করতে হয় এবং মূল সমস্যাটি চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর, ঐ মূল সমস্যাকে কতকগুলি বিশেষ গবেষণা মূলক প্রশ্নে (specific question) সাজাতে হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই প্রশ্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক গবেষণায় এই প্রশ্ন হয় 'কী' বাচক; ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় এই প্রশ্ন হল 'কেন' বাচক। তবে, প্রশ্ন যে ধরনেই হোক সেলটিজ ও অন্যান্যদের এবং ইয়ং এর মতে গবেষণা সুপরিচালনার জন্য গবেষণামূলক প্রশ্ন সীমিত বা স্বল্প সংখ্যক হওয়া দরকার।

**অনুশীলনী - ২**

১। গবেষণামূলক সমস্যা কাকে বলে?

২। কোন ধরনের গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন প্রাথমিক সোপান হয় না?

৩। গবেষণামূলক সমস্যা কী রকম হওয়া দরকার?

৪। গবেষণামূলক প্রশ্নের ব্যাপকতা কেমন হওয়া দরকার?

## ৩.৫ গবেষণা নকশা

গবেষণা মূলক প্রশ্ন গঠন বা প্রকল্প নির্মাণের পর ঐ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ বা প্রকল্প পরীক্ষণের সুবিধার্থে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কম সময়ে কম খরচে গবেষণা ক্রিয়া অনুসরণে গবেষণা নকশা কার্যকরী নির্দেশ দিয়ে থাকে। গবেষণার লক্ষ্য, প্রস্তাব্য অর্থ, সময় ও মানবসম্পদ সাপেক্ষে গবেষণা নকশা তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল আগাম নির্ধারণ করে থাকে। কোঠারির (Kothari) মতে গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের, পরিমাপের এবং বিশ্লেষণের প্রতিচিত্র (blueprint for the collection, measurement and analysis of data)। গবেষণা নকশার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঃ

গবেষণা নকশা হল কোনো গবেষণামূলক সমস্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তথ্যসূত্রের নির্দেশক পরিকল্পনা।

গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের এবং বিশ্লেষণের রণনীতি।

গবেষণা নকশা হল সময় এবং অর্থের সঙ্গে গবেষণা ক্রিয়ার সঙ্গতি সাধক পরিকল্পনা।

**অনুশীলনী - ৩**

১। গবেষণা প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা হয়?

২। গবেষণা নকশা কাকে বলে?

৩। গবেষণা নকশার কার্যকারিতা কী?

## ৩.৫.১ গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ

গবেষণার উদ্দেশ্যভেদে গবেষণার বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। এই বিভিন্নরূপ গবেষণার নকশা ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। অন্বেষণমূলক গবেষণা, বর্ণনামূলক গবেষণা, ব্যাখ্যামূলক গবেষণা এবং পরীক্ষণমূলক গবেষণার নকশা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে, সমাজতত্ত্বে পরীক্ষামূলক গবেষণা সাধারণত অনুসৃত হয় না। এছাড়া, বর্ণনাত্মক এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকায় এই দুই গবেষণার পদ্ধতি সাধারণত একই সাথে (Description & Diagnostic) আলোচিত হয়ে থাকে। তাই, গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ বলতে অন্বেষণমূলক এবং বর্ণনামূলক গবেষণা নকশার আলোচনা করা হল।

**অন্বেষণ মূলক গবেষণা নকশা ঃ**

কোনে নতুন বিষয় বা স্বল্পচর্চিত বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান হল অন্বেষণ মূলক গবেষণা। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হল পরবর্তী পর্যায়ে সুবিন্যস্ত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্ধারণ করা। সেলটিজ, জাহোদা এবং অন্যান্যদের (Seltiz, Jahoda etc.) মতে এরূপ গবেষণার মাধ্যমে কোনো দৃশ্যবস্তুর সম্যক পরিচিতি এবং সারবস্তু নিরীক্ষণ ধরা যায় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি যথার্থ গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই ধরনের গবেষণার ধরা বাঁধা পন্থা পদ্ধতি না থাকায় এই গবেষণা হয় খোলা-মেলা, নমনীয় এবং সৃজনশীল। তবে, সেলটিজ জাহোদা এবং অন্যান্যরা তাঁদের গবেষণার অভিজ্ঞতা সূত্রে কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করেন যেগুলি নিম্নবর্ণিত ক্রমে আলোচনা করা হল।

**(ক) সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত রচনা বীক্ষা**

গবেষণা বিষয় সংক্রান্ত মুদ্রিত রচনা (গ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি) পাঠ বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। এই পাঠ সূত্র গবেষণা বিষয় সম্পর্কে কী অন্বেষণ করা হয়েছে কীভাবে করা হয়েছে, কী জানা গেছে ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া, কী জানা যায় নি তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সূত্রেই বিষয় সম্পর্কে গবেষণার প্রশ্ন বা প্রকল্প নির্দেশ করা যায়, যা পরবর্তী গবেষণার সূত্র হয়ে থাকে।

**(খ) অভিজ্ঞতা বীক্ষা**

গবেষণা বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমীক্ষা গবেষণা বিষয় সম্পর্কে

অন্তর্দৃষ্টি গঠনে সহায়ক হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে বা যারা ঐ বিষয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন, অথবা বিষয় সম্পর্কে বস্তুগত বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী তাদের সমীক্ষা করতে হয়। এই সমীক্ষা সংগঠিত বা অসংগঠিত সাক্ষাৎকার ধর্মী হতে পারে। তবে, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা গঠন এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ উত্তরদাতাদের ঐ প্রশ্নমালা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে নেওয়া সুবিধাজনক হয়। তবে এই সাক্ষাৎকার অনমনীয় হবে না। উত্তরদাতাদের বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষক প্রশ্ন তোলার সুযোগ দিতে হবে, যাতে বিষয়টির বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়।

**(গ) অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বিশেষ সমীক্ষা**

যে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে পথনির্দেশক অভিজ্ঞতার অভাব থাকে সে বিষয়ে বা ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বিশেষ সমীক্ষা বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বলতে সাধারণত বিপরীত ব্যক্তি বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ব্যক্তিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আগন্তুক, প্রান্তিক মানুষ, বিভিন্ন স্তরের মানুষ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এইসব মনোনীত একক সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত নাম পর্যালোচনা, অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এইসব প্রক্রিয়া অবলম্বনে অনুসৃত সমীক্ষা সূত্রে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প গঠন করা হয়ে থাকে।

**বর্ণনামূলক (ও কারণ নিরূপক) গবেষণা নকশা ঃ**

বর্ণনামূলক গবেষণায় কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ নিরূপণকারী বা ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কোনো কিছু ঘটায় পরিসংখ্যা নির্ধারণ এবং অন্য কোনো ঘটনার সাথে উহার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কোনো অবস্থা, ঘটনা ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ সংবাদ প্রতিবেদন এই দুই ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য হওয়ার পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য দুই ক্ষেত্রেই অতি সতর্কতার সহিত গবেষণা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। এই পদ্ধতিগত দিক সহ গবেষণা নকশার অন্যান্য দিকগুলি নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়।

গবেষণা নকশার প্রথম পদক্ষেপ হল নৈর্ব্যক্তিকভাবে গবেষণামূলক প্রশ্ন করা। এই প্রশ্ন যথেষ্ট নির্দিষ্টভাবে করা দরকার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করার জন্য। এই পর্বেই গবেষণামূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণা কার্যকরীকরণ করা হয় ঐ ধারণা যথার্থ পরিমাপের জন্য।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কেশল নির্ধারণ করা। তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল যেমন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নথি পর্যালোচনা প্রশ্নমালা ইত্যাদি উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। গবেষককে গবেষণার ক্ষেত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য, শুদ্ধতামাত্রা ইত্যাদি বিচার করে গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল মনোনয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অত্যাবশ্যক নির্দেশক নীতি হিসাবে পালনীয় হয়ে থাকে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল পর্যবেক্ষণ একক মনোনয়ন করা। বেশির ভাগ গবেষণাই নমুনা সমীক্ষামূলক হওয়ায় নমুনায়ন এক্ষেত্রে এক বিশেষ কৌশল হিসাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। নমুনায়ন সম্ভাবনা নির্ভর বা সম্ভাবনা অ-নির্ভর হয়। তবে, নির্ভরযোগ্যতা শুদ্ধতা এবং সাধারণীকরণের দিক থেকে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নই যথার্থ।

নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ-একক মনোনয়নের পর উল্লিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তথ্যের শুদ্ধতা রক্ষার্থে তথ্য সংগ্রহে সতর্কতা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যের পূর্ণাঙ্গতা, বোধগম্যতা, সামঞ্জস্য এবং নির্ভরযোগ্যতা নিরীক্ষা করতে হয়।

অতঃপর সংগৃহীত তথ্যাবলী প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ গবেষণা নকশার এক বিশেষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য সংকেতায়ন প্রক্রিয়া, তথ্যসারণী বদ্ধকরণ ও অন্যান্য পরিসংখ্যানগত কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের উপায় বা কৌশল প্রণয়ন পর্বে আগাম নির্ধারণ করতে হয়।

এই গবেষণা নকশার শেষ স্তর হল গবেষণা প্রতিবেদন পেশ। গবেষণার প্রাপ্ত সংবাদ অপরের কাছে প্রতিবেদিত করার জন্য প্রতিবেদনের যথার্থ পরিকল্পনা করা দরকার।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণকারী গবেষণার গবেষণা নকশার বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সামাজিক গবেষণার (নিরীক্ষামূলক গবেষণার) বিভিন্ন স্তরের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

**অনুশীলনী - ৪**

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশা কী ধরনের হয়?

২। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণমূলক গবেষণার মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণ কী?

৩। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণমূলক গবেষণা নকশার বিশেষ দিকগুলি কী?

## ৩.৫.২ গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে গবেষণার বিভিন্ন রূপ থাকায় গবেষণা নকশার তারতম্য থাকা সত্ত্বেও গবেষণা নকশার কতকগুলি সাধারণ স্তর উল্লেখিত হয়ে থাকে। থেরেসে বেকার (Therese Baker) গবেষণা নকশার (research plan) এগারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। এই পর্যায় বা স্তরগুলি নিম্নক্রমে আলোচনা করা হল।

**১। বিষয় নির্ধারণ**

গবেষণা বিষয়টি প্রথমে নির্দিষ্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত তথ্যের নিরিখে উপস্থাপন করতে হয়। যেমন, কোনো জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সাথে উগ্রপন্থার সম্পর্ক গবেষণার বিষয় হলে বিষয়টিকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত বাস্তব সংবাদের ভিত্তিতে সংবাদের ভিত্তিতে উত্থাপন করতে হয়।

**২। বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্বেষণ**

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধীত জ্ঞান বা গবেষণাকৃত সংবাদ পর্যালোচনা করে বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্তজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক পরিচয় দেওয়া দরকার। এই পরিচিতি সূত্রেই গবেষণা বিষয়টির উত্থাপন বিশেষ মাত্রা পেয়ে থাকে।

**৩। ধারণার স্পষ্ট সংজ্ঞা রচনা**

গবেষণা বিষয়ের সাথে অন্বিত বিভিন্ন ধারণাবলীর যথাযথ এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা দরকার। ধারণা যথার্থ স্পষ্ট হলেই তা পরিমাপযোগ্য হয়। যেমন, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা উগ্রপন্থা বলতে কী বোঝান হচ্ছে তা স্পষ্ট করা দরকার।

**৪। তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ**

প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র এবং তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি উল্লেখ করা দরকার। এক্ষেত্রে তথ্যলভ্যতাও উল্লেখ করা দরকার।

**৫। ধারণা কার্যকরীকরণ**

গবেষণা নকশায় গবেষণা বিষয় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণাবলী কীভাবে কার্যকরী করা হবে তা উল্লেখ করা দরকার। নিরীক্ষামূলক গবেষণায় সাধারণত প্রশ্নমালা, সূচক এবং স্কেল এর মাধ্যমে ধারণা কার্যকরীকরণ করা হয়ে থাকে।

**৬। নমুনায়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ**

কাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হবে বা পর্যবেক্ষণ-একক নির্ধারণে নমুনাচয়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা দরকার। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ভর বা সম্ভাবনা অ-নির্ভর নমুনাচয়নের কোন কোন কৌশল অবলম্বন করা হবে তা যুক্তিসহ উল্লেখ করা দরকার।

**৭। গবেষণার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য উল্লেখ**

গবেষণা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য, উপস্থিত জ্ঞানের সত্যয়ান, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য করা হতে পারে। কোন উদ্দেশ্যে গবেষণা করা হচ্ছে তা উল্লেখ করা দরকার।

**৮। তথ্যসংগ্রহ**

তথ্যসংগ্রহ পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতির আগাম নির্দেশ দেওয়া অসুবিধাজনক। কিন্তু, নিরীক্ষা বা পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ পরিকল্পনা যথাযথভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

**৯। তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ**

সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের যোগ্য করার জন্য সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়ার উল্লেখ গবেষণা নকশায় করা দরকার।

পরিমাণগত তথ্য হলে কীভাবে পরিগণকে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে তা উল্লেখ করা দরকার। গুণবাচক তথ্য হলে সেগুলির শ্রেণি বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়া উল্লেখ করা দরকার।

**১০। তথ্য বিশ্লেষণ**

তথ্য বিশ্লেষণের বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ গবেষণা নকশায় থাকা দরকার।

**১১। গবেষণা প্রতিবেদন**

যে কোন গবেষণার শেষ কিন্তু মুখ্য পর্যায় হল প্রতিবেদন পেশ। কী ধরনের প্রতিবেদন পেশ করা হবে, প্রতিবেদনের কাঠামো বা মর্ম কী হবে তার ইঙ্গিত গবেষণা নকশায় দেওয়া দরকার।

**অনুশীলনী - ৫**

১। গবেষণা নকশায় সাধারণত কতগুলি স্তর থাকে?

২। এই স্তরগুলি কী একে অপরের থেকে বিযুক্ত থাকে?

৩। গবেষণা প্রতিবেদন কী গবেষণা নকশার এক জরুরি পর্যায়?

## ৩.৬ সারাংশ

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুসৃত হয়ে থাকে। কোনো নতুন ক্ষেত্র বা স্বল্পচর্চিত ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা, কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দান, কোনো ঘটনার একাধিক চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা এবং কোনো ঘটনার কার্যকরণ সূত্র নির্দেশে প্রকল্প পরীক্ষার জন্য গভেষণা অনুসৃত হয়ে থাকে। এই বিবিধ উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন নামে—অন্বেষণমূলক গবেষণা, বর্ণনামূলক গবেষণা, কারণ নিরূপক বা ব্যাখ্যামূলক সমস্যা গঠন দিয়ে শুরু হয়ে থাকে। এই গবেষণামূলক সমস্যা তাত্ত্বিক বা বাস্তব সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত হয়ে থাকে। মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন সূত্রে গবেষণামূলক সমস্যা গঠন করা হয়ে থাকে। এই গবেষণামূলক সমস্যা দিয়ে গবেষণাক্রিয়া শুরু হলেও গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর উন্বেষণ করার জন্য গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা দরকার হয়। গবেষণা নকশা সীমিত অর্থ, সময় ও মানব সম্পদের মিতব্যয়ে গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণার নকশা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অন্বেষণমূলক গবেষণায় কোনো দুষ্পরিবর্তনীয় পথনির্দেশ থাকে না। তবুও, মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বীক্ষা ও অন্তঃর্দৃষ্টি প্রদানকারী একক বিশেষের সমীক্ষা এক্ষেত্রে নির্দেশিত পাথেয় হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপক গবেষণার মধ্যে সাদৃশ্যসূত্রে একই ধরনের গবেষণা নকশা অনুসৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তরগুলি মোটামুটিভাবে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারী হয়ে থাকে। পরীক্ষণমূলক গবেষণা প্রক্রিয়া সাধারণত সামাজিক গবেষণায় অনুসৃত হয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়গুলি কিছু বিশ্লিষ্ট হয়ে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

## ৩.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। কারণ নিরূপক বা ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

২। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনে কোন কোন দিকের প্রতি নজর রাখতে হয়?

৩। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের সহায়ক পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।

৪। গবেষণা নকশার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৫। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশার বিভিন্ন পর্যায়গুলির পরিচয় দিন।

৬। গবেষণা নকশার বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।

## ৩.৮ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী - ১**

১। অন্বেষণমূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া অথবা ঐ ঘটনা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা।

২। ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হল কোন ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় করা এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

**অনুশীলনী - ২**

১। গবেষণামূলক সমস্যা বলতে তাত্ত্বিক বা বাস্তব ক্ষেত্রের কোনো জটিলতা নির্দেশকে বোঝায়।

২। অন্বেষণমূলক গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন প্রাথমিক সোপান হয় না।

৩। গবেষণামূলক সমস্যা সুনির্দিষ্ট এবং পরীক্ষণযোগ্য হওয়া দরকার।

৪। গবেষণামূলক প্রশ্ন সীমিত এবং স্বল্প সংখ্যক হওয়া দরকার।

**অনুশীলনী - ৩**

১। গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন বা প্রকল্প নির্মাণের পরে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করতে হয়।

২। গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের, পরিমাপের এবং বিশ্লেষণের প্রতিচিত।

৩। কম সময়ে কম খরচে গবেষণাক্রিয়া অনুসারণের জন্য গবেষণা নকশা কার্যকরী নির্দেশ দিয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশা হয় খোলামেলা। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

২। বর্ণনামূলক এবং কারণনিরূপক গবেষণামূলক বিষয় সম্পর্কে বিশদ এবং যথার্থ বর্ণনা দিয়ে থাকে। এছাড়া, এই দুই ধরনের গবেষণায় নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করতে হয়।

৩। বর্ণনামূলক ও কারণনিরূপক গবেষণা নকশার বিশেষ দিকগুলি হল ঃ

গবেষণামূলক প্রশ্নগঠন, তথ্যসংগ্রহ, পদ্ধতি ও কৌশল নির্দেশ, পর্যবেক্ষণ-একক মনোনয়ন প্রক্রিয়া নির্দেশ, তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কৌশল নির্ধারণ, প্রতিবেদন কাঠামো নির্দেশ।

**অনুশীলনী - ৫**

১। গবেষণা নকশার ১১টি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২। না। স্তরগুলি একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে অবস্থান করে।

৩। হ্যাঁ। গবেষণার প্রাপ্তসংবাদই হল গবেষণার কার্যকরী অংশ। এই প্রাপ্তসংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমেই অন্যের গোচরে আসায় গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা নকশার এক জরুরি স্তর হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী**

১। কারণনিরূপক গবেষণার উদ্দেশ্য হল কোন ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় করা এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোন ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

২। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনে সময়লভ্যতা, উপকরণের সীমাবদ্ধতা ও উপস্থিত পন্থা পদ্ধতির প্রযোজ্যতার প্রতি নজর দিতে হয়।

৩। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের সহায়ক পদক্ষেপগুলি হল ঃ

(ক) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া। (খ) গবেষণা বিষয় সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী পর্যালোচনা, (গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা।

৪। গবেষণা নকশার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

গবেষণা নকশা হল কোনো গবেষণামূলক সমস্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তথ্যসূত্রের নির্দেশক পরিকল্পনা;

গবেষণা নকশা হল তথ্যসংগ্রহের এবং তথ্যবিশ্লেষণের রণনীতি;

গবেষণা নকশা হল সময় এবং অর্থের সঙ্গে গবেষণা ক্রিয়ার সঙ্গতি সাধক পরিকল্পনা।

৫। অন্বেষণমূলক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়গুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিষয়সংক্রান্ত মুদ্রিত রচনা পাঠের দ্বারা গবেষণা ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

(খ) গবেষণা বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হওয়া;

(গ) অন্তর্দৃষ্টি প্রদানকারী একক বিশেষের সমীক্ষা করে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া।

৬। গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তরগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, (খ) বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্তজ্ঞান পর্যালোচনা, (গ) ধারণা স্পষ্টীকরণ, (ঘ) তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি নির্দেশ, (ঙ) ধারণা কার্যকরী করণ, (চ) নমুনায়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ, (ছ) গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লেখ, (জ) তথ্যসংগ্রহ, (ঝ) তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ কৌশল উল্লেখ, (ঞ) তথ্যবিশ্লেষণ কৌশল উল্লেখ, (ট) গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামো নির্দেশ।

## ৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। কোঠারি, সি. কে. ঃ রিসার্চ মেথডোলোজি ঃ মেথডস্ এন্ড টেকনিকস্ (দ্বিতীয় সংস্করণ) উইলি ইষ্টার্ন লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

২। ঘোষ, বি. এন. ঃ সাইনটিফিক মেথডস্ এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪।

৩। বেকার, থেরেসে এল. ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহিল, ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস, সামাজিক গবেষণা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।

# একক ৪ ❑ ধারণা স্পষ্টীকরণ ও কার্যকরীকরণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা

৪.৪ সিদ্ধতা

৪.৫ নির্ভরযোগ্যতা

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ সংকেত

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা
- সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা

## ৪.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প ধারণা সমবায়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, এই ধারণা সমূহ কোনো আদর্শায়িত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ধারণাসমূহের সাধারণ অর্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ অর্থ থাকে। কিন্তু, ধারণাগত অস্পষ্টতা বা ভিন্নর্থতা সূত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসরণ করা যায় না। তাই, ধারণার অর্থগত স্পষ্টতা বা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন জরুরি। আবার ধারণা শুধু স্পষ্ট হলেই চলে না পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য হওয়া দরকার। তাই ধারণা স্পষ্ট করার সাথে ধারণাকে প্রয়োগযোগ্য করা দরকার। এক্ষেত্রে ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে তা পরিমাপযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু, এই উপায়গুলি ধারণাকে যথার্থ পরিমাপ করতে পারে কিনা বা এই পরিমাপ যাচাইযোগ্য কিনা তা দেখার দরকার হয়। এদিক থেকে পরিমাপের সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা ধারণা প্রয়োগযোগ্য করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

থাকে। তাই, এই এককে ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা এবং তার সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

## ৪.৩ ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ অর্থবোধের দিক থেকে স্পষ্ট নাও হতে পারে। বলতে চাওয়া হয় তা ব্যবহৃত শব্দে প্রকাশিত হতে পারে। আবার, ব্যবহৃত শব্দ সবক্ষেত্রে একই অর্থ প্রকাশ করে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এরূপ অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর শব্দ ব্যবহারযোগ্য হয় না। গবেষণায় শব্দ উপযোগী করার জন্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত অর্থ বা ধারণা স্পষ্ট করতে হয়। আর্ল ব্যবির (Earl Babbie) মতে ধারণা স্পষ্টীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে (we specify precisely what we mean) যেমন, অবসর কালে বয়স্কদের সামাজিক সংগতিবিধান (social adjustment) যদি গবেষণার বিষয়বস্তু হয় সেই সামাজিক সংগতি বিধান শব্দটির যথার্থ অর্থ বা ধারণা নির্দেশ করা দরকার হয়। ব্যবির মতে এই প্রক্রিয়াটি হল কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক (dimension) নির্দিষ্ট করে প্রতি দিকের নির্দেশক (indicator) নির্দিষ্ট করা। এক্ষেত্রে সামাজিক সংগতিবিধান ধারণাটির বিভিন্ন দিক বলতে বয়স্কদের পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক, পারিবারিক ক্ষেত্রের বাইরে পাড়াপড়শি, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক, অবসর যাপন, কোনো শখ অনুসরণ প্রভৃতিকে বোঝায়। এই প্রতিটি দিকের ব্যবহারিক প্রকাশ হল উল্লিখিত নির্দেশক। যেমন, পারিবরিক ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশক হল ঃ ছোটদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা, সকালে দুধ আনা, খবরের কাগজ আনা, গাছের পরিচর্যা ইত্যাদি। এইভাবে কোনো শব্দ বন্ধ ধারণাকে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশক দ্বারা প্রকাশ করাকে ধারণা স্পষ্টীকরণ বলে। আবার, এই বিভিন্ন দিক নির্দেশকগুলিকে মাপনি (Scale) বা প্রশ্নমালা (Questionnaire) অন্তর্ভুক্ত করে ঐ ধারণা পরিমাপের উপায় (Instruments) প্রস্তুত করলে ধারণা প্রয়োগযোগ্য (operationalization) হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো শব্দবন্ধ ধারণাকে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথা পরিমাপযোগ্য করা হয়ে থাকে। এই কার্যকরীকরণ সূত্রেই কোনো ধারণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দের অসুবিধা কী?

২। ধারণা স্পষ্ট করা কাকে বলে?

৩। ধারণা প্রয়োগযোগ্য করা বলে?

৪। ধারণা প্রয়োগযোগ্য কীভাবে করা হয়?

## ৪.৪ সিদ্ধতা

সিদ্ধতা বলতে বোঝায় যা পরিমাপ করতে চাওয়া হয় পরিমাপের উপায়ে তা পরিমাপ করার সাধ্যতা। বেইলির (Bailey) মতে পর্যবেক্ষণযোগ্য সামাজিক বস্তুর সকল পরিমাপ সম্ভব হয় যদি পরিমাপের উপায়

সংশ্লিষ্ট ধারণাকেই পরিমাপ করে এবং ঐ ধারণাটিকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে। বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ কোনো উপায়ই প্রস্তুত করা যায় না। সিদ্ধতা মাত্রা বাড়ানো যায় মাত্র। সাধারণত তিন ধরনের সিদ্ধতা উল্লেখিত হয়ে থাকে— অন্তঃসার সিদ্ধতা (content validity) নির্ণায়কজনিত সিদ্ধতা (criterion validity) এবং বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা (construct validity)।

**অন্তঃসার সিদ্ধতা ঃ**

এক্ষেত্রে বিচার করা হয় পরিমাপের উপায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে কিনা। এ উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলিকে সংশ্লিষ্ট ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশক প্রশ্নসমূহের আদর্শ নমুনা হিসাবে অবস্থান করতে হয়। এই প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যায়। তবে, উত্তরদাতাদের কাছে (respondents) এই প্রশ্নসমূহের সিদ্ধতা সহজেই অনুমেয় হওয়া দরকার। এদিক থেকে এই সিদ্ধতা অপাতসিদ্ধতা (free validity) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

**নির্ণায়ক সিদ্ধতা ঃ**

এই সিদ্ধতায় ধারণার বহুমুখী পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একটি পরিমাপের প্রাপ্তাঙ্ক থেকে (predictor) অপর চলের (criterion) পূর্ব নির্দেশ করা যায়। যেমন, কোনো শ্রেণীতে ভর্তির পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে কোনো ছাত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্যের নির্দেশ করা যায়। পূর্ব নির্ধারক এবং নির্ধারিতব্য ছাত্রের প্রাপ্তাঙ্কের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক (correlation coefficient) সূত্রেই এই পূর্বনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পূর্ব নির্ধারণ দুই ভিন্ন কালক্রমে করা হলে ইহা পূর্বনির্ধারণজনিত সিদ্ধতা (predictive validity) বলে পরিচিত থাকে। আবার, এই পূর্বনির্ধারণ একই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা হলে ইহা সহবর্তমানমূলক সিদ্ধতা (concurrent validity) নামে পরিচিত থাকে।

**বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা ঃ**

সামাজিক সংহতি, বিধিশূন্যতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ন্যায় বির্মূত ধারণাগুলি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ যোগ্য হয় না। অন্য প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ধারণার দ্বারা বিমূর্ত ধারণা প্রত্যায়িত হতে পারে। এই দ্বিতীয় ধরনের পর্যবেক্ষণযোগ্য ধারণা বা চলের দ্বারা বিমূর্ত ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন করা হয়ে থাকে। বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা বলতে ঐ ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের যথার্থতাকে বোঝায়।

**অনুশীলনী - ২**

১। অন্তঃসার সিদ্ধতায় কী বিচার করা হয়?

২। নির্ণায়ক সিদ্ধতায় কী করা হয়ে থাকে?

৩। বিমূর্ত ধারণা কীভাবে প্রয়োগযোগ্য করা হয়ে থাকে?

৪। বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা কাকে বলে?

## ৪.৫ নির্ভরযোগ্যতা

নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় কোনো পরিমাপের উপায়ের নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে সদৃশ্য তথ্য পরিবেশনের সক্ষমতা। কোনো উপায়ের নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এগুলি হল যথাক্রমে—স্থিতিশীলতা, সমতুল্যতা এবং সমধর্মিতা। এই তিন দিক পরিমাপে তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই কৌশলগুলি হল যথাক্রমে—পুনঃপরীক্ষণ, বহুপরীক্ষণ এবং দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়া।

**পুনঃপরীক্ষণ ঃ**

এই প্রক্রিয়ায় একই নমুনার উপর একাধিক সময়ে একই উপায়ে প্রয়োগ করে দুই স্বতন্ত্র প্রস্তাব বণ্টন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই দুই বন্টনের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক নির্ভরযোগ্যতা গুণাঙ্ক (Reliability coefficient) হয়ে থাকে। এই গুণাঙ্ক যত বেশি পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা তত বেশি হয়। বিপরীতক্রমে, এই গুণাঙ্ক যত কম হয় উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা তত কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দুই পরীক্ষণের মধ্যে এক পক্ষকাল পার্থক্য রাখা বহুজনস্বীকৃত হয়ে থাকে।

**বহুপরীক্ষণ ঃ**

এক্ষেত্রে একই নমুনার উপর কোনো এক ধারণা পরিমাপের জন্য দুই বা ততোধিক সমতুল পরিমাপের উপায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই একাধিক উপায় একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া প্রস্তাব বণ্টনের সহগাঙ্গ গুণাঙ্ক দুই পরিমাপের সমতুলতা নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রেও দুই পরিমাপের মধ্যে এক পক্ষ কাল অন্তর রাখা বহুজনস্বীকৃত পদ্ধতি।

**দ্বিভাজিত পরীক্ষণ ঃ**

এই প্রক্রিয়ায় একই পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলিকে দুটি সমানভাগে ভাগ করে আপাতদৃষ্টিতে দুটি উপায় প্রস্তুত করা হয়। এখন এই নমুনার উপর একই সময়ে ঐ দুটি উপায় একত্রে প্রয়োগ করে উত্তর নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের প্রস্তাব বন্টনের বা প্রাপ্ত সংবাদের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক সংশ্লিষ্ট পরিমাপের উপায়ের অন্তঃসঙ্গাতি নির্দেশ করে থাকে। এই অন্তঃসঙ্গাতি গুণাঙ্ক বেশি হলে পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা বেশি হয়। আবার অন্তঃসঙ্গাতি গুণাঙ্ক কম হলে পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা কম হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। নির্ভরযোগ্যতা কাকে বলে?

২। নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা উল্লেখ করুন।

৩। পুনঃপরীক্ষণ ও বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুই পরীক্ষণের মধ্যে অন্তর কী রকম থাকা বাঞ্ছনীয়?

## ৪.৬ সারাংশ

প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা আর সমাজের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ভাষা এক হয় না। পূর্বক্ষেত্রে শব্দের অর্থ ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এছাড়া শব্দের মাধ্যমে বক্তব্য যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় না। সুনির্দিষ্ট ও যথার্থ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় শব্দবন্ধ ধারণা স্পষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য করতে হয়। ধারণা স্পষ্টীকরণ হল কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশক পর্যবেক্ষণযোগ্য ব্যবহারিক প্রকাশ চিহ্নিত করা। ঐ নির্দেশক সমন্বিত উপায় গঠন করে সংশ্লিষ্ট ধারণাকে পরিমাপযোগ্য করা হলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগযোগ্য হয়। কিন্তু, উপায়গুলি সংশ্লিষ্ট ধারণাকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে কিনা তা দেখা দরকার। ইহা উপায়ের সিদ্ধতা বিচার নামে পরিচিত হয়ে থাকে। তিন ধরনের সিদ্ধতা উল্লেখিত হয়ে থাকে—অন্তঃসার সিদ্ধতা, নির্ণায়ক সিদ্ধতা এবং বির্মূত ধারণার সিদ্ধতা। প্রথম ক্ষেত্রে উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নদফাগুলির সিদ্ধতা বিচার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো চলের এক অবস্থান বা বর্তমান অবস্থান সূত্রে ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রে অনুসারী চলের উল্লেখ সংশ্লিষ্ট চলের সিদ্ধতা বিচার করা হয়ে থাকে। নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় উপায়গুলি একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে একই সংবাদ প্রদানের সম্ভাব্যতা। এক্ষেত্রে তিন ধরনের নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ উল্লেখিত হয়ে থাকে—পুনঃপরীক্ষণ, বহুপরীক্ষণ এবং দ্বিভাজিত পরীক্ষণ। প্রথম ক্ষেত্রে একই উপায় একাধিকবার প্রয়োগ করা হয়ে থকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমধর্মী একাধিক উপায় প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে একই উপায় দ্বিভাজিত করে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিক্ষেত্রেই একই ধরনের সংবাদ পাওয়া যায় কিনা তা দেখা হয়ে থাকে।

## ৪.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

**অনুশীলনী**

১। ধারণা কীভাবে স্পষ্ট করা হয়?

২। সামাজিক বস্তুর সফল পরিমাপ কীভাবে সম্ভব হয়?

৩। অন্তঃসার সিদ্ধতা কীভাবে বিচার করা হয়?

৪। পূর্ব নির্ধারণজনতা সিদ্ধতা ও সহবর্তমানমূলক সিদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়?

৬। পুনঃপরীক্ষণ ও দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে পার্থক্য কী?

## ৪.৮ উত্তরমালা

**অনুশীলনী -১**

১। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ অস্পষ্ট হয়, এবং যা বলতে চাওয়া হয় তা যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

২। ধারণার স্পষ্টীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্ভুক্ত অর্থ যথার্থভাবে বিশেষায়িত করা হয়।

৩। ধারণা কার্যকরীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো শব্দবন্ধ ধারণাকে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথা পরিমাপযোগ্য করা হয়ে থাকে।

৪। কোনো ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশগুলিকে মাপনি বা প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করে ঐ ধারণাকে পরিমাপযোগ্য করার মাধ্যমে ধারণা প্রয়োগযোগ্য করা হয়।

**অনুশীলনী - ২**

১। অন্তঃসার সিদ্ধতায় বিচার করা হয় পরিমাপের উপায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নাবলী সংশ্লিষ্ট পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে কিনা।

২। নির্ণায়ক সিদ্ধতায় একটি পরিমাপের প্রাপ্তাঙ্ক থেকে অপর চলের প্রাপ্তাঙ্কের পূর্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে।

৩। অনুসারী ধারণার দ্বারা বিমূর্ত ধারণার কার্যকরীকরণ করা হয়।

৪। বির্মূত ধারণার সিদ্ধতা বলতে ঐ ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের যথার্থতাকে বোঝায়।

**অনুশীলনী - ৩**

১। নির্ভরযোগ্যতা হল কোনো পরিমাপের উপায়ের একই নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে একই ধরনের সংবাদ পরিবেশনের সাধ্যতা।

২। নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা হল যথাক্রমে ঃ স্থিতিশীলতা, সমতুলতা এবং সহধর্মিতা।

৩। পুনঃপরীক্ষণ এবং বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুই পরীক্ষণের মধ্যে এক পক্ষকাল অন্তর বহুজন স্বীকৃত হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে প্রতি দিকের নির্দেশক সূচিত করার মাধ্যমে ধারণাস্পষ্টীকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, 'সামাজিক সংগতি বিধান' ধারণাটির বিভিন্ন দিক হল যথাক্রমে—

পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ, অবসর যাপন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা ইত্যাদি। এই দিকগুলির আবার বিভিন্ন নির্দেশক নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা বলতে বোঝায় ছোটদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও বাড়ি নিয়ে আসা, সকালে দুধ আনা, গাছে জল দেওয়া ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে এইরূপ নির্দেশক সূচিত করার মাধ্যমেই কোনো ধারণা স্পষ্ট করা হয়ে থাকে।

২। সামাজিক বাস্তবতার সফল পরিমাপ সম্ভব হয় যদি পরিমাপের উপায় সংশ্লিষ্ট ধারণাকে পরিমাপ করে এবং ঐ ধারণাটিকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে।

৩। অন্তঃসার সিদ্ধতা বিচারে পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নদফাগুলি পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা দেখা হয়। এছাড়া, অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি ধারণা সংশ্লিষ্ট নির্দেশ সমূহের আদর্শ নমুনা হয় কিনা তা দেখা হয়। তবে উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্নসমূহের গ্রাহ্যতা সিদ্ধতা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

৪। বর্তমানে কোনো এক চলের প্রস্তাব থেকে পরবর্তীকালের জন্য চলের প্রাপ্তঙ্ক নির্দেশ পূর্ব নির্ধারণমূলক সিদ্ধতায় করা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, সহবর্তমান মূলক সিদ্ধতা নির্ণয় প্রক্রিয়ায় একই সময়ে কোনো এক চলের প্রাপ্তঙ্ক সূত্রে অন্য চলের প্রাপ্তঙ্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

৫। বহুপরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ায় কোনো উপায়ের সিদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য একই নমুনার উপর দুই বা ততোধিক সমতুল পরিমাপের উপায় একই বা ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তঙ্ক বণ্টনের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপায়ের পরিমাপের নির্ভরযোগ্য নির্ধারণ করা হয়।

৬। পুনঃপরীক্ষণ ও দ্বিভাজিত পরীক্ষণের পার্থক্য হল পুনঃপরীক্ষণে একই নমুনার উপর একই উপায় একাধিক সময়ে প্রয়োগ করে দুই ধরনের প্রাপ্ত তথ্য বা প্রাপ্তঙ্ক বণ্টন সংগ্রহ করা হয়; কিন্তু দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় একই পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একই নমুনার উপর এক সঙ্গে প্রয়োগ করে দুই ধরনের প্রাপ্তসংবাদ বা প্রাপ্তঙ্ক বণ্টন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

## ৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেরী, আর্ল ঃ দ্য প্র্যাকটিশ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (সপ্তম সংস্করণ) বেলমন্থ, সি.এ.ওয়ার্ডসওয়র্থ, ১৯৯৫।

২। বেইলি কে. ভি ঃ মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) নিউ ইয়র্ক, ফ্রি প্রেস, ১৯৮৭।

৩। বেকার থেরেসে এল ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাক গ্র হীল ইংক।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, কোলকাতা, আরামবাগ বুক হাউস, ২০০২।

# একক ৫ ❑ গুণবাচক গবেষণা কৌশল

গঠন


৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ গুণবাচক গবেষণা প্রক্রিয়া

৫.৩.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

৫.৩.২ সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা

৫.৩.৩ একক বিশেষ সমীক্ষা

৫.৩.৪ কথ্য বিবরণ, বর্ণন, জীবনকথা, উদ্ভব বৃত্তান্ত

৫.৩.৫ সারবস্তু বিশ্লেষণ

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ উত্তর সংকেত

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী


## ৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- গুণবাচক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া
- গুণবাচক গবেষণার বিভিন্ন তথ্যসূত্র
- গুণবাচক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

## ৫.২ প্রস্তাবনা

বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা মূলত পরিমাণ বাচক (নিরীক্ষামূলক গবেষণা) হলেও, গুণবাচক গবেষণাসূত্রেও বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তথ্য হয় মূলত গুণবাচক, এবং গবেষণা পদ্ধতি বলতে মূলত ক্ষেত্রগবেষণা ও একক বিশেষ গবেষণা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বিশেষ তথ্যসূত্র হিসাবে কথ্য বিবরণ, বর্ণন, জীবন কথা, উদ্ভব

বৃত্তান্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সারবস্তু বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। দৃষ্টবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাত উল্লিখিত গুণবাচক গবেষণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

## ৫.৩ গুণবাচক গবেষণা প্রক্রিয়া

সমাজবীক্ষণে পরিমাণমাত্রিক গবেষণা (Quantitative research) বিশেষ গুরুত্ব লাভ করলেও, বোগডানের (Bogdan) মতে সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে গুণবাচক গবেষণার অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। প্রতীকী আন্তক্রিয়াবাদী (Symbolic interactionism) তত্ত্বের আধারে সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের সংব্যাখ্যানমূলক উপলব্ধি (Interpretative understanding) এই গবেষণার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গুণবাচক গবেষণায় গবেষক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র এবং ঐ সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রতীক, আচার, সামাজিক ভূমিকা ও অন্যান্য সাংগঠনিক উপাদানের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে অর্থবহ করে তা উপলব্ধ করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অপরিমেয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের তথ্য শব্দ, বাক্য এবং পরিচ্ছেদ সমন্বিত হয়ে থাকে। তবে এই গবেষণা অনুসরণে কোন কেতাবি পদ্ধতি বর্ণিত থাকে না। ক্ষেত্র ও গবেষণার প্রয়োজন সাপেক্ষ বাস্তব যুক্তি (a logic in practice) অনুসারে কৌশল ও প্রক্রিয়া ঠিক করা হয়ে থাকে। তবে, অনেকসময় পূর্বেকার গবেষণা প্রতিবেদন পাঠ এবং ঠেকে শেখা সূত্রে বা কোন অভিজ্ঞ গবেষকের শিক্ষানবীশ থাকা সূত্রে গবেষণার দিকনির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু, গুণবাচক গবেষণা এক নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে (linear path) অনুসৃত হয় না। ইহা সর্পিল (spiral) ও বৃত্তাকার (circular) ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। একই পর্যায় ঘুরে ফিরে আসতে পারে। এই আবর্তন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গুণবাচক গবেষণা কোনো ধারণা পরীক্ষণের উদ্দেশ্য অনুসৃত হয় না, বরং নতুন ধারণা গঠনের জন্য অনুসৃত হয়ে থাকে। এছাড়া গুণবাচক গবেষণা কোনো গবেষণামূলক প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয় না। গবেষণা প্রক্রিয়াতেই কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানুষের চিন্তা ভাবনার সূত্রেই স্বাভাবিক ভাবে গবেষণার প্রশ্ন উঠে আসে। তবে, গুণবাচক গবেষণায় কোনো প্রক্রিয়া বা কৌশলগত নির্দিষ্ট তা না থাকলেও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানুষের জীবনের অর্থবোধ উপলব্ধি করার জন্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল উল্লিখিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। এছাড়া তথ্যসূত্র হিসাবেও কিছু দিক উল্লিখিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কথ্য বিবরণ (oral history), বর্ণন (narrative), জীবন কথা (biography) ও উদ্ভব বৃত্তান্ত (geneology) সুবিদিত থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। গুণবাচক গবেষণা কোন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে থাকে?

২। গুণবাচক তথ্য কেমন হয়ে থাকে?

৩। গুণবাচক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

৪। গুণবাচক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন কীভাবে গঠিত হয়?

## ৫.৩.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে (participant observation) গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে নিজের গবেষক পরিচয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে ঐ গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ঐ গোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষক দীর্ঘদিন ব্যাপী সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করে ঐ গোষ্ঠীর জীবন ধারায় পুনঃ সামাজিকীকৃত হয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বার্জেস এর (Burges) মতে এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে সুবিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে (detailed data based on observation in natural settings) স্প্র্যারাডলি (Spradley) এই পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেন। এগুলি হল ঃ স্থান (space), কাল (time), ক্রিয়া (activities), কর্তা (actor), ঘটনা (events), লক্ষ্য (goal), অনুভব (feelings) ইত্যাদি। বার্জেসের মতে এই উল্লিখিত প্রতিদিক সম্পর্কে আরও বিশেষ বিশদ প্রশ্ন উত্থাপন করে পর্যবেক্ষণ সূত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যেমন, কর্তার (actor) বয়স-লিঙ্গ-দৈহিক চেহারা ভেদে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিক হল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা গবেষণা বিষয়ে আগাম অবগত হওয়ায় নিজেদের স্বাভাবিক সামাজিক আন্তঃক্রিয়া অনুসরণ নিয়মিত করতে পারে। এছাড়া, অনেক সময় গবেষক বেশি অংশগ্রহণ সূত্রে নিজের গবেষক অবস্থান রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। ফলে, দুই ক্ষেত্রে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ যথার্থ হয় না। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের তথ্য নথিভুক্তিকরণ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে। এই পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী তাৎক্ষণিক ভাবে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার যেমন, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, ভিডিও-টেপ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে যান্ত্রিক সামগ্রী সবক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (jotted notes) বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে যান্ত্রিক সামগ্রী সামাজিক প্রক্রিয়ায় অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনা। এছাড়া ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের কাছে যান্ত্রিক সামগ্রী সবক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (jotted notes) বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। এই লিপিতে কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি উদ্রেককারী শব্দ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি, কিছু অস্পষ্ট হস্তাঙ্কন অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যা পরবর্তীকালে বিশদ বিবরণ লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। এই বিশদ বিবরণ ক্ষেত্র থেকে ফেরার পরেই লিখতে হয়। বেশি সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি লোপের সম্ভাবনা থাকে। এই বিশদ বিবরণ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপি (direct observation notes) নামে পরিচিত থাকে। এখানে পর্যবেক্ষণের সংবাদ ছাড়াও গবেষকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, পর্যবেক্ষণ প্রাপ্ত সংবাদের বিশ্লেষণ সূত্রে অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তমূলক লিপি (inference notes) এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশলগত দিক উল্লেখ করার জন্য পদ্ধতি সংক্রান্তলিপি (methodological note) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ২**

১। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কাকে বলে?

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সামগ্রীর উপযোগিতা কতটা?

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কালে কীভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়?

৪। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ গবেষক কীভাবে তথ্যসংগ্রহে সমর্থ হয়ে থাকে?

## ৫.৩.২ সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎকারের নির্দেশিকা

পরিমাণ বাচক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নিরীক্ষামূলক গবেষণায় সাক্ষাৎকার (interview) তথ্যের উৎস হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বলতে সুগঠিত প্রশ্নমালা (structured questionnaire) নির্ভর প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। গুণবাচক গবেষণায়ও সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনের (conversation) সমান। এই সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, মুক্তপ্রান্ত এবং হার্দিক। যে সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা তা বুঝতেই পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীল মেলা-মেশার সূত্রে সখ্যতা-স্থাপন করতে হয়। তারপর বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনের মাধ্যমে আন্তঃগ্রাহী সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসা প্রশ্নগুলির উত্তর এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং তার অর্থ জানা একই সঙ্গে ঘটে থাকে। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকার শুধু গবেষক ও কোনো একক সদস্যের মধ্যে হয় না, কোনো গোষ্ঠী বা একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সাথে অনুসরণ করা যেতে পারে।

গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার মূলত কথোপকথনমূলক হলেও প্রতি বসবাসকারীর কাছ থেকে একই বিষয় সংক্রান্ত সংগতিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ নিরপেক্ষভাবে সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (interview guide) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন দিকগুলির উল্লেখ সাক্ষাৎকার নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই দফাওয়ারী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে পাত্রবিশেষে দফাগুলির পরম্পরা পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রশ্নে শব্দের ব্যবহারও নমনীয় হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হল এই যে সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা সূত্রে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণে এবং বিশ্লেষণে সুবিধাজনক হয়ে থাকে। এছাড়া, এই উপায় প্রয়োগে অনুসৃত সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর প্রতিবেদন শ্রোতৃমণ্ডলী এবং পাঠকের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কিছুক্ষেত্রে আদর্শায়িত মুক্তপ্রাপ্ত সাক্ষাৎকার (Standardized open ended interview) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এখানে প্রশ্নাবলী যেভাবে জিজ্ঞসা করা হবে ঠিক সেই ক্রমেই আগে থেকে লেখা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় গবেষকের পক্ষপাতিত্ব রদ করা যায়। এছাড়া, সীমিত সামর্থ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সাক্ষাৎকারে এই প্রক্রিয়া বেশি যথার্থ হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ সংরক্ষণের জন্য টেপরেকর্ডারের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। তবে সামাজিক প্রক্রিয়ার সবকিছু টেপরেকর্ডার ধরতে পারে না। তাই পরিবর্তক বা সমান্তরাল হাতিয়ার (tool) হিসাবে ক্ষেত্র লিপি (field note) বা ক্ষেত্রপত্রিকা (field journal) লেখা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়?

৩। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কীভাবে উত্তরদাতাদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করা হয়?

৪। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা ব্যবহারের কারণ কী?

### ৫.৩.৩ একক বিশেষ সমীক্ষা

একক বিশেষ সমীক্ষা (case study) বলতে কোনো বিশেষ গবেষণা এককের ঘনিষ্ঠ এবং সার্বিক সমীক্ষাকে বোঝায়। এই একক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল ইত্যাদি হতে পারে। বেকারের (Baker) মতে কোনো সিদ্ধান্ত বা নীতিও একক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট একককে স্বাভাবিক পরিবেশে সমীক্ষা করে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। একক বিশেষ সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত এইরূপ তথ্যকে সামাজিক অনুবীক্ষণ (social microscope) বলা হয়ে থাকে। ইন (Yin) এর মতে সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে এই সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। বার্জ (Berg) এর মতে এই সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট এককের। জীবনক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে স্বাভাবিক যেমন, জীবন গাথা, কথ্য-বিবরণ, বিভিন্ন নথি, ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। এই সমীক্ষার দুটি রূপ দেখা যায়—অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষা (intrinsic case study) এবং উপায়মূলক সমীক্ষা (instrumental case study)। প্রথম ধরনের সমীক্ষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এককবিশেষকে কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ ব্যতিরেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের সমীক্ষা (ideographic case study) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের সমীক্ষায় এককবিশেষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিকের নিবিড় তথ্যসংগ্রহ করা হয় কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ পরিমার্জন/পরিশীলন করার জন্য বা, পরবর্তী কোনো গবেষণার পথনির্দেশ প্রদানের জন্য। এছাড়া একক বিশেষ সমীক্ষার আর একটি বিশেষরূপ উল্লেখ করা যায়। এটি হল একক সমষ্টির সমীক্ষা (collective case study)। এক্ষেত্রে একাধিক এককবিশেষকে সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই সমীক্ষায় এক এককবিশেষের প্রাপ্ত সংবাদ সূত্রে অনুমিত অবধারণ অন্য একক বিশেষের প্রাপ্ত সংবাদের নিরিখে গৃহীত বা বর্জিত হয়ে একটি তত্ত্বনির্ধারণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই ধরনের তত্ত্ব ভূমিস্থ তত্ত্ব (ground theory) নামে পরিচিত থাকে।

এককবিশেষে সমীক্ষার কিছু বিশেষ সুবিধাগত দিক উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় সুবিধামত যেকোনো কৌশলই অবলম্বন করা যায়। এছাড়া, স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে সমীক্ষা করায় এককবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। এই গবেষণা সরাসরি তত্ত্ব নির্মাণে সহায়ক না হলেও সংগৃহীত তথ্য দ্বারা পূর্বে নির্মিত কোনো ধারণা, প্রকল্প বা তত্ত্বের সত্য বিচার করে বিশ্লেষণমূলক সামান্যীকরণের সহায়ক হতে পারে। এছাড়া, ব্যতিক্রমী এককের তথ্য সূত্রে প্রচলিত কোনো তাত্ত্বিক অবধারণার পরিবর্তন বা পরিশীলন সম্ভব হয়ে থাকে। সর্বোপরি, এই গবেষণার মাধ্যমে পরবর্তী কোনো গবেষণার পরিচায়ক তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।

এই সমীক্ষার কিছু বিশেষ অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। গবেষক পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ না থাকায় গবেষণায় মানসিকতার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, এই গবেষণায় এককবিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক না

হওয়ায় এবং তথ্যাবলী পরিমাণ বাচক না হওয়া পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো নির্ভরযোগ্য সামগ্রীকরণ করা সম্ভব হয় না। তবে এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও কোনো গবেষণায় যথেষ্ট তথ্যাবলী সংগ্রহে একক বিশেষ সমীক্ষা উপযোগী হয়ে থাকে। এই সমীক্ষার তথ্যাবলীকে 'শুদ্ধতম সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাবলী' (The perfect type of sociological material) বলে অভিহিত করেন।

**অনুশীলনী - ৪**

১। একক-বিশেষ সমীক্ষা কাকে বলে?

২। একক-বিশেষ বলতে কী বোঝায়?

৩। একক-বিশেষ সমীক্ষায় তথ্যসংগ্রহের কৌশলগুলি উল্লেখ করুন।

৪। একক-বিশেষ সমীক্ষা বিশেষ উপযোগী হয় কেন?

৫। একক-বিশেষ সমীক্ষায় বিশেষ অসুবিধাজনক দিকটি কী?

## ৫.৩.৪ কথ্যবিবরণ, বর্ণন, জীবনকথা, উদ্ভব বৃত্তান্ত

**কথ্য-বিবরণ**

গ্রীক যুগ বা তার পূর্ববর্তী কাল থেকে বহুশত বর্ষ ধরে ঐতিহাসিকরা মৌখিক বিবরণকে (oral history) এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কারকরাও এই তথ্যসূত্র ব্যবহার করেন। তবে, তথ্যসংগ্রহের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে কথ্যবিবরণ যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালান নেভিনস (Allan Nevins) এর লেখনিতে সূচিত হয়ে থাকে। ক্রমে, ৭০ এর দশকে এই পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কথ্য-বিবরণ প্রক্রিয়া হল অতীত অভিজ্ঞতার মৌখিক বিবরণ সংকলন (collection of oral accounts of past experiences)। যাদের কোনো জীবনীকার থাকে না এবং যাদের জীবনকথা লিখিত হয় না তাদের কথা এই উপায় অবলম্বনে নথিভুক্ত করা হয়। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রে কোনো ঘটনার প্রাথমিক সংবাদ এই কথ্য-বিবরণসূত্রে পাওয়া যায়। প্রথাগত গবেষণা প্রতিবেদনে ও কর্তৃত্বাধীন নথিপত্রে যাদের সংবাদ উল্লেখিত হয় না সেই বঞ্চিত, নিগৃহিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যেমন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, উদ্বাস্তু গোষ্ঠী, শ্রমজীবী গোষ্ঠী ইত্যাদির স্মতিচারণ জাত সংবাদ এই পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হয়। এই সংবাদ উল্লিখিত গোষ্ঠীর পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা যেমন যুদ্ধের স্মৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত স্মৃতিবিজড়িত হতে পারে। ইয়ো'র (Yow) মতে এই পদ্ধতিতে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মুক্ত (open-door) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অবিধিবদ্ধ নিয়ম, ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক জীবন, প্রতীকের নিহিত অর্থও ব্যবহার ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়। রিচির (Ritchie) মতে কথ্যবিবরণ নথিভুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কথ্যস্মৃতি ও ব্যক্তিগত ভাষ্য সংগ্রহ করে থাকে (oral history collects spoken

memories and personal commentaries of historical significance through recorded interview)। এই সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনমূলক (conversational narrative)। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা হয় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা হয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী। এদিক থেকে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটি হয় দ্বিপাক্ষিক (dialogic discourse)। গ্লাক (Gluck) উদ্দেশ্য ভেদে কথ্যবিবরণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন ঃ বিষয় কেন্দ্রিক কথ্যবিবরণ (topical interview), জীবনকথামূলক কথ্যবিবরণ (biographical oral history) এবং আত্মজীবনীমূলক কথ্যবিবরণ (autobiographical interview)। প্রথম ধরনের কথ্যবিবরণ, বিশেষ ঘটনা বা সামাজিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দান করে। দ্বিতীয় ধরনের কথ্যবিবরণ, গোষ্ঠীসাপেক্ষে ব্যক্তির পেশাগত সম্প্রদায়গত, প্রজন্মগত বৃত্তান্ত দিয়ে থাকে। তৃতীয় ধরনের কথ্যবিবরণ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত পেশ করে থাকে। এই কথ্যবিবরণের কিছু ত্রুটি উল্লেখিত হয়ে থাকে। এইরূপ বলা হয় যে, কথ্যবিবরণ সাম্প্রতিককালের লিখিত সূত্রের মত নির্ভরযোগ্য হয় না। ফিনেগানের (Finnegan) মতে কথ্যবিবরণ উত্তরদাতার মৌখিক প্রতিক্রিয়া হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্মৃতিচারণসূত্রে দেওয়া কথ্যবিবরণের মধ্যে প্রচারমাধ্যম, পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদির প্রভাব সাপেক্ষে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে যা লিখিত তথ্য বা নথির ক্ষেত্রে থাকে না। এ প্রসঙ্গে কথ্যবিবরণের পক্ষে বলা হয় যে, গবেষকের প্রভাব নিরপেক্ষ কথ্যবিবরণের পুনারাবৃত্তি সম্ভব হয়। এছাড়া সমানে শ্রমজীবী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, উদ্বাস্তু প্রভৃতির ন্যায় অত্যাচারিত নিপীড়িত ও কর্তৃত্বহীন মানুষের অব্যক্ত বেদনাময় কাহিনী তাদের নিজের মুখে ব্যক্ত করার সাহস দিতে এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রভাবশীল ও কার্যকরী হয়ে থাকে। গ্লাক (Gluck) কথ্যবিবরণজনিত সংবাদকে নতুন সাহিত্য (new literature) বলে অভিহিত করেন। গ্রেলের (Grele) মতে কথ্যবিবরণ ইতিহাসের গণতন্ত্রীকরণের এক নতুন সম্ভাবনাময় পদ্ধতি (opportunity to democratise the nature of history)।

**বর্ণন ঃ**

গুণবাচক গবেষণায় 'বর্ণন' বিভিন্ন অর্থে উল্লেখিত হয়ে থাকে। যেমন, বর্ণন (narrative) হল সামাজিক বাস্তবক্ষেত্রের স্বাভাবিক বক্তব্য তথ্য উপস্থাপন (any data that are in the form of natural discourse or speech)। এছাড়া, বর্ণন অনেক সময় সংগৃহীত তথ্যের রূপকে বোঝায় (to describe the form of the collected body of data they have gathered for analysis)। মূলার (Muller) এর মতে বর্ণন ব্যক্তির বসবাস প্রসূত অভিজ্ঞতা ((lived experience), বহুবৃত্তান্ত (multiple perspective) এবং ক্ষেত্রনিবন্ধ সামাজিক বাস্তবতার বিমূর্ত রূপকে (context bound constructed social realities) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বর্ণন এর যথার্থ সংজ্ঞা হল ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার গল্পাঞ্জলী। এদিক থেকে বর্ণন হল গল্প (story) এবং অনুসন্ধান (investigation) এর দ্বৈরথ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বর্ণনামূলক ব্যাখ্যায় কোনো একক পদ্ধতি নেই। রিসম্যান (Reisman) ব্যক্তি কীভাবে সামাজিক ক্ষেত্র সংজ্ঞায়িত করে, সমাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কালাম সোয়ান (Cullum Swan) এর মতে বর্ণনে কথকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং বিভিন্ন শ্রোতার কাছে বর্ণন বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। জোসেলসন এবং লেইবলিচ (Josselson and Leiblich) মনে করেন বর্ণন প্রক্রিয়া বোধের ক্ষেত্রে গবেষক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। এই বর্ণনের মাধ্যমে উত্তরদাতার সান্নিধ্যে আসা যায়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জীবনক্ষেত্রের প্রাপ্ত সংবাদের অর্থ নির্ণয় করে এক নতুন বিবৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবে অপরের অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে সংশ্লিষ্ট

ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হয়ে থাকে। জোসেলসন (Josselson) এর মতে আমরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি—বর্ণনের যুগ, যা বহুবিদ্যার ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে (We have .... entered a new age, the age of narrative, an interest that is sweeping a range of academic disciplines)।

**জীবনকথা ঃ**

জীবনকথা হল কোনো ব্যক্তির নিজের ভাষায় লেখা জীবনবৃত্তান্ত (full length book account of one person's life in his own words)। জীবনকথায় ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা (self) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কীভাবে ব্যক্তির সামাজিক বোধ গঠিত হয় তা এক্ষেত্রে দেখা হয়ে থাকে। তবে, জীবনকথা লেখা এক সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বৃত্তান্ত ও টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা বৃত্তান্ত বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। এছাড়া, ঐ ব্যক্তির জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র ও ছবিও বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। টমাস ও ৎসন্যানেকি (Thomas & Znaniecki) 'দ্য পলিশ পিস্যান্টাস্ ইন ইউরোপ অ্যান্ড অ্যামেরিকা' (The Polish Peasants in Europe and America) গ্রন্থের এক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত চিকাগোতে আসা এক পলদেশীয় কৃষকের (Wladek Wisniewski) জীবন বৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। এই জীবনবৃত্তান্তে (Waldek) তাঁর কর্মকার পরিবারে জন্ম ও গ্রাম্য জীবনযাপন, প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা, রুটির ব্যবসা, জার্মানিতে এসে কর্মের সন্ধান ও পরিশেষে চিকাগো এসে দুর্দশার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই জীবনবৃত্তান্তের আর এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল রবার্ট বোগডান (Roberd Bogdan, 1974) লিখিত জেনি ফ্রাই (Jane Fry) এর জীবনবৃত্তান্ত এক্ষেত্রে তিন মাস যাবৎ সপ্তাহে বিভিন্ন সময়ে ১০০ ঘণ্টার একান্ত আলাপসূত্রে পাওয়া ফ্রাই-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের-ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৈবাহিক, বিদ্যালয় জীবন, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবনযাপন, আত্মহত্যার চেষ্টা সংবাদ নথিভুক্ত ও সম্পাদিত করে ২০০ পৃষ্ঠার জীবনকথা প্রকল্প করা হয়ে থাকে। এইভাবে চিকাগো ও পলিয় সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে (Show Bertaux) জীবনকথা এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হাতিয়ার হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশকে বোগডান (Bogdan, 1974), প্লুমার (Plummer, 1983), ডেনজিন (Denzin, 1989) প্রমুখ সমাজবিদের গবেষণায় জীবনকথার সুবিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেলেও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবনকথার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সোশিওলোজিক্যাল এসোসিয়েশানের ১৯৯৩ সালের 'সোশিওলোজি' পত্রিকাকে জীবনকথার উপর এক বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় উহার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়ে থাকে। স্ট্যানলির (Stanley) মতে জীবনকথা গবেষক ও লেখকের গবেষণাসূত্রে মৌলনীতি নির্ধারণের দাবি অগ্রাহ্য করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লেখা ও বর্ণনসূত্রে ব্যক্তির জীবন সংক্রান্ত জটিলতার উপর আলোকপাত করে থাকে। জীবনকথার এইরূপ ভূমিকার নিরিখে সামাজিক গবেষণার প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা ও নির্দিষ্টতার দাবি খারিজ করা হয়ে থাকে (biography ....... displaces the referential and foundational claim of writers and researchers by focusing on the writing/ speaking of lives and the complexities of reading/hearing them. It also thereby unsettles

notion of sciences, problemtises the referential claims of social research)। বস্তুতপক্ষে, জীবনকথা মূলত মননির্ভর (subjective) হওয়ায় সত্যতার (truth) ভরসা দেওয়া যায় না। গবেষকের সতর্কদৃষ্টিই জীবনকথা সদ্ব্যবহারের একমাত্র উপায় হয়ে থাকে।

**উদ্ভববৃত্তান্ত ঃ**

প্রথাগত (traditional) ইতিহাসের আদর্শগত নির্দেশ (ideal signification) ও অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবাদ (indefinite telelogics) অন্বেষণের এক পদ্ধতি হল উদ্ভববৃত্তান্ত (genealogy)। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক ঘটনার উৎসসূত্র বা আধিবিদ্যক মূল উপাদান (essence) অন্বেষণ করে না। অপাঙক্তেয় উৎস (ignoble beginings) এবং ঘটনার অনিশ্চিত বিন্যাস অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত ইতিহাস চর্চায় অতি ঐতিহাসিক (supra-historical) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ইতিহাসকে বস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতিতে ইতিহাসকে ঐতিহাসিকের সামাজিক অবস্থানগত (situated) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথাগত ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন সাধন করা হযে থাকে। ফুকো (Foucault) উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে আধুনিক সমাজের ক্ষমতা (power), অনুশাসন (regulation) ও নিয়ন্ত্রণের (control) অনুশীলন করেছেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে হল ঃ অন্বেষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্দেশ করা; সংশ্লিষ্ট ঘটনার সমস্যামূলক দিকগুলি চিহ্নিত করা; সংশ্লিষ্ট ঘটনার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করা। ফুকোর (Foucault) 'নিয়ম ও শাস্তি বিধান' (Discipline and Punish, 1977) এই পদ্ধতি প্রয়োগের এক বিশেষ উদাহরণ। এই গ্রন্থে বর্তমান সমাজে শাস্তিবিধানের ক্ষমতার স্বীকৃত সূত্র হিসাবে তিনি বর্তমান সমাজের বৈজ্ঞানিক আইনানুগ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি বর্তমানের কোনো সামাজিক সমস্যাকে যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখার চেষ্টা করে সমস্যাটি সম্পর্কে এর বেশি গ্রহণযোগ্য বক্তব্য পেশ করে থাকে। ডেভিড হাওয়ার্থ (David Hawarth) এর ভাষায় এই পদ্ধতিতে কোনো ঘটনাকে ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়ে থাকে (contextualizing the facts)।

**অনুশীলনী - ৫**

১। কথ্যবিবরণ কাকে বলে?

২। কথ্যবিবরণে কাদের কথা বলা হয়ে থাকে?

৩। বর্ণন বলতে কী বোঝায়?

৪। জীবনকথা কাকে বলে?

৫। উদ্ভববৃত্তান্ত কী?

৬। উদ্ভববৃত্তান্তে কীভাবে সামাজিক ঘটনাকে অনুশীলন করা হয়?

### ৫.৩.৫ সারবস্তু বিশ্লেষণ

লিখিত ও মুদ্রিত নথিপত্র, গণমাধ্যম সম্প্রচারিত সংবাদ, চিত্র, গ্রন্থ, অসংগঠিত সাক্ষাৎকার, বর্ণন প্রভৃতি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য (available materials) বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় বা সামান্যীকরণের (generalization) উপযোগী প্রক্রিয়া হিসাবে সারবস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) অনুসৃত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswel) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংবাদ আদান-প্রদানের গবেষণায় এই পদ্ধতিকে বিশেষ পরিচিত করে তোলেন। কিন্তু বার্নাড বেরেলসন (Bernard Berelson, 1959) এর লেখায় এই পদ্ধতি এক নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে থাকে। তাঁর মতে সারবস্তু বিশ্লেষণ সংবাদ আদানপ্রদানের প্রকাশিত বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক, সুসংবদ্ধ এবং পরিমাণবাচক বর্ণনার এক গবেষণা কৌশল। রোসেনথাল এবং রসনো'র (R. Rosenthal & R. L. Rosnow) মতে সারবস্তু বিশ্লেষণ হল একটি নৈর্ব্যক্তিক ও সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়ার যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিগঠিত (decomposed) করে বিভিন্ন বিষয়কে শ্রেণিবন্ধ করে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে। গার্ডনার (Gardner, 1975) সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন—নৈর্ব্যক্তিকতা, সুবিন্যস্ততা, সামান্যকরণ সম্ভব্যতা ও পরিমাণ মাত্রিকতা, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ ক্রিয়া অনুসৃত হওয়ায় একাধিক গবেষকের ক্ষেত্রের একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হওয়ায় এই পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ও সংগতিপূর্ণ নির্ণায়ক (criterion) অনুসারে বিভিন্ন বর্গ (categary) মনোনীত হওয়ায় প্রকল্পের অনুকূল সংবাদ সংগৃহীত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, পদ্ধতিগত দিক থেকে এই প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত থাকে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বর্গের বর্ণনা দেওয়া ছাড়াও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে তত্ত্বনির্দেশ বা সামান্যীকরণও করান হয়ে থাকে। এছাড়া, পরিসংখ্যা (frequency) সূত্রে তথ্যাবলীর পরিমাণগত পরিমাপও করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির প্রক্রিয়াগত দিক থেকে চারটি পদক্ষেপের উল্লেখ করা যায়। গবেষণামূলক সমস্যার উল্লেখ (specifying the problem), নমুনায়ন (sampling), আলোচনার একক মনোনয়ন (choosing units of analysis), ও ধারণা গঠন (category construction)। প্রথমক্ষেত্রে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করতে হয়। যেমন ব্যবসায়ী অপহরণ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে প্রশ্ন গঠন করা যেতে পারে—কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ী অপহরণ করা হয়ে থাকে? অপহৃত ব্যবসায়ীর ধর্মীয় অবস্থান কী? অপহরণকারী পুরুষ না মহিলা? ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নমুনায়ন বলতে খবরের কাগজ, পত্রিকা, গ্রন্থ, টি. ভি. ধারাবাহিক ইত্যাদি তথ্যসূত্রের নমুনায়ন বোঝায়। তৃতীয় ক্ষেত্রে আলোচনার একক নির্ধারণ বলতে শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, সম্পূর্ণ গ্রন্থ ইত্যাদিকে বোঝায়। চতুর্থ পর্যায় ধারণা গঠন হল নমুনা অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলীর শ্রেণি নির্দেশ করা। এই ধারণাগুলি সাধারণত অনুসৃত তাত্ত্বিক অবধারণ সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধারণা হতে পারে ঃ উল্লিখিত ব্যবসায়ীর পদমর্যাদা, ব্যবসার ধরন, ব্যবসার অঞ্চল ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এই ধারণাগুলির মধ্যে থাকা সম্পর্ক সূত্রে কোনো তাত্ত্বিক অবতারণা বা সামান্যীকরণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির কতিপয় বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। এই পদ্ধতি উত্তরদাতাদের সরাসরি বিরক্ত করে না। উত্তরদাতাদের লিখিত নথিই এক্ষেত্রে কাম্য উপকরণ হওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত

উত্তর (নথিসূত্রে) পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে হয়। এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। তথ্যসূত্র যথার্থ তথ্য পেশ করে কিনা তা মূল্যায়ন করা দুরূহ হয়ে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র নাগালে পাওয়া যায় না। ফলে তথ্যগত দিক থেকে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের অসুবিধা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। গার্ডনারের (Gardner) মতে প্রকল্প পরীক্ষণ ও তত্ত্বনির্মাণের উদ্দেশ্য এই পদ্ধতি একক ভাবে বা অন্যান্য পদ্ধতির সহিত যৌথভাবে ক্রমবর্ধিত হারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৬**

১। সারবস্তু বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির কয়েকজন প্রবক্তার নাম উল্লেখ করুন।

## ৫.৪ সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানে পরিমাণবাচক গবেষণা প্রাধান্য লাভ করলেও সামাজিক ক্ষেত্রের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গুণবাচক গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশকের পর থেকে এই গবেষণা পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই গবেষণায় গুণবাচক তথ্য যেমন, শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বর্ণনা, ধারণা গঠন এবং তাত্ত্বিক অবতারণা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে মূলত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে গবেষণা ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় ও গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে ক্ষেত্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনধারার অংশীদার হয়ে তাদের সম্পর্কে আন্তঃগ্রাহী তথ্য সংগ্রহ তথা নথিভুক্ত করে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক তথ্যসংগ্রহের জন্য অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকার হয় পারস্পরিক আলাপের ন্যায়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট কতকগুলি দিক ঠিক করা হলেও কোনো লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয় না। এই গবেষণায় উত্তরদাতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রস্থ ঘটনা সম্পর্কে উত্তরদাতার স্মৃতিচারণ, বর্ণন, জীবনকথা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সারবস্তু বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় গুণবাচক তথ্যকে শব্দ, বাক্য পরিচ্ছেদ্য ইত্যাদি সাপেক্ষে বিভিন্ন বর্গে শ্রেণিবন্ধ করে শ্রেণি সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে ঘটনায় বা গবেষণা বিষয়ের বর্ণনা, ধারণা ও তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সামাজিক গবেষণায় পরিমাণবাচক পদ্ধতির সাথে গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

## ৫.৫ অনুশীলনী

১। গুণবাচক গবেষণায় পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ কীভাবে পাওয়া যায়?

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিকটি উল্লেখ করুন।

৪। সংক্ষিপ্ত লিপি কাকে বলে?

৫। এককবিশেষ সমীক্ষার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষার উদ্দেশ্য কী?

৬। উপায়মূলক সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৭। এককবিশেষ সমীক্ষায় কয়েকটি সুবিধার উল্লেখ করুন।

৮। কথ্যবিবরণ সূত্রে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যায়?

৯। কথ্যবিবরণে সাক্ষাৎকারকারী এবং উত্তরদাতার ভূমিকা কেমন হয়?

১০। কথ্যবিবরণের অসুবিধাজনক দিক উল্লেখ করুন।

১১। জীবনকথার উপাদানগুলি উল্লেখ করুন।

১২। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি প্রয়োগের পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।

১৩। সারবস্তু বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াগত পদক্ষেপ হিসাবে নমুনায়ন ও বর্গ গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখ করুন।

১৪। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির অসুবিধাজনক দিক উল্লেখ করুন।

## ৫.৬ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী - ১**

১। গুণবাচক গবেষণা সংব্যাখ্যানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে থাকে।

২। গুণবাচক গবেষণার তথ্য হয় গুণবাচক যেমন, শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩। গুণবাচক গবেষণায় গবেষক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র এবং কীভাবে মানুষ ঐ সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রতীক, আচার, ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থবহ করে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

৪। গুণবাচক গবেষণা গবেষণামূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে না, গবেষণা প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতাদের চিন্তা ভাবনা সূত্রেই স্বাভাবিক ভাবে গবেষণামূলক প্রশ্ন উঠে আসে।

**অনুশীলনী - ২**

১। গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে নিজের গবেষক পরিচয় প্রদান করে ঐ গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ঐ গোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, ভিডিও টেপের ন্যায় যান্ত্রিক সামগ্রী বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে, যান্ত্রিক সামগ্রী সামাজিক প্রক্রিয়ার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণকালে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি উদ্রেককারী শব্দ। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাক্য কিছু অস্পষ্ট হস্তাঙ্কন সংক্ষিপ্ত লিপিতে উল্লেখ করে সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৪। দীর্ঘকাল গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করে ঐ গোষ্ঠীর জীবন ধারার অংশীদার হওয়ার সুবাদেই গবেষক তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনমূলক। এছাড়া, এই সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, মুক্তপ্রান্ত ও হার্দিক।

২। পর্যবেক্ষণসূত্রে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসা প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়।

৩। সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীল মেলামেশার মাধ্যমে সম্যতা স্থাপন করা হয়ে থাকে।

৪। প্রতি উত্তরদাতার কাছ থেকে একই বিষয় সংক্রান্ত সংগতিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। এককবিশেষ সমীক্ষা বলতে কোনো বিশেষ গবেষণা এককের ঘনিষ্ঠ এবং সার্বিক সমীক্ষা বোঝায়।

২। এককবিশেষ বলতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল ইত্যাদি বোঝায়।

৩। এককবিশেষ সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের কৌশলগুলি হল যথাক্রমে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার, জীবনকথা, কথ্যবিবরণ ইত্যাদি।

৪। এককবিশেষ সমীক্ষা সূত্রে যথেষ্ট তথ্যসংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় ইহা গবেষণায় উপযোগী হয়ে থাকে।

৫। এককবিশেষ সমীক্ষার অসুবিধাজনক দিক হল ঃ এককবিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক হয় না, এছাড়া পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গবেষণায় মানসিক ছাপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

**অনুশীলনী - ৫**

১। কথ্যবিবরণ হল অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণজাত মৌখিক বিবরণ।

২। প্রথাগত গবেষণা প্রতিবেদনে ও কর্তৃত্বাধীন নথিপত্রে যাদের তথ্য উল্লেখিত হয় না সেই বঞ্চিত, নিগৃহীত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর—ধর্মীয় সংখ্যালঘু, উদ্বাস্তু, শ্রমজীবী ইত্যাদি - স্মৃতিচারণজাত সংবাদ এই পদ্ধতিতে নথিভুক্ত হয়ে থাকে।

৩। বর্ণন হল সমাজের বাস্তবক্ষেত্রের স্বাভাবিক বক্তব্য জ্ঞাপক তথ্য উপস্থাপন।

৪। জীবনকথা হল কোনো ব্যক্তির নিজের ভাষায় নথিভুক্ত জীবন বৃত্তান্ত।

৫। প্রথাগত ইতিহাসের আদর্শগত নির্দেশ ও অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবাদ অন্বেষণের এক পদ্ধতি হল উদ্ভব বৃত্তান্ত।

৬। উদ্ভব বৃত্তান্ত পদ্ধতিতে সামাজিক ঘটনাকে ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৬**

১। সারবস্তু বিশ্লেষণ সংবাদ আদান প্রদানের প্রকাশিত বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক, সুসংবদ্ধ এবং পরিমাণবাচক বর্ণনার এক গবেষণা কৌশল।

২। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, নৈর্ব্যক্তিকতা, সুবিন্যস্ততা, সামান্যীকরণ সম্ভাব্যতা, ও পরিমাণমাত্রিকতা।

৩। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকজন প্রবক্তা হলেন ঃ হ্যারড ল্যাসওয়েল, বার্নাড বেরেনসন ওগার্ডনার।

**অনুশীলনী - ৭**

১। গুণবাচক গবেষণার পদ্ধতিগত দিক নির্দেশ বাস্তব যুক্তিবোধ সূত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্বগবেষণার প্রতিবেদন পাঠ; অভিজ্ঞ গবেষকের কাছে শিক্ষানবিশী সূত্রে পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ পাওয়া যায়।

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট দিকগুলি হল ঃ স্থান, কাল, ক্রিয়া, কর্তা, ঘটনা, লক্ষ্য, অনুভব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, উল্লিখিত দিকসমূহের বিশেষ খুঁটিনাটি সংবাদও পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিক হল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা গবেষণা বিষয়ে আগাম অবগত হওয়ায় নিজেদের স্বাভাবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া, অনেক সময় বেশি অংশগ্রহণসূত্রে পর্যবেক্ষক গবেষকের ভূমিকা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণে সমর্থ হয় না। ফলে, যথার্থ তথা সংগ্রহ ব্যাহত হয়ে থাকে।

৪। সংক্ষিপ্ত লিপি হল পর্যবেক্ষণকালে ক্ষেত্রে লেখা নথি। এই লিপিতে স্মৃতি উদ্রেককারী কিছু শব্দ, বিশেষ উক্তি, অস্পষ্ট হস্তাক্ষর অনুর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই লিপি পরবর্তীকালে ক্ষেত্র থেকে ফেরার পর বিশদ ক্ষেত্র লিপি লেখার থেকে স্মারক হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫। অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এককবিশেষকে কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ ব্যতিরেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার চেষ্টা করা হয়।

৬। উপায়মূলক সমীক্ষায় একক বিশেষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিকের নিবিড় তথ্য সংগ্রহ করা হয় কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ পরিমার্জন করার জন্য বা, পরবর্তী গবেষণার পথনির্দেশ দানের জন্য।

৭। এককবিশেষ সমীক্ষার কয়েকটি সুবিধা হল ঃ

পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় সুবিধামত যে কোনো কৌশলই অবলম্বন করা যায়। স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে সমীক্ষা করায় এককবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যতিক্রমী এককের সংবাদ সূত্রে প্রচলিত কোনো তাত্ত্বিক পরিবর্তন বা পরিশীলন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৮। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রে কোনো ঘটনার প্রাথমিক তথ্য এই কথ্যবিবরণসূত্রে পাওয়া যায়। এই তথ্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অবিধিবব্ধ নিয়ম, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক সম্পর্ক, প্রতীকের নিহিত অর্থ ও প্রয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত হয়ে থাকে।

৯। কথ্যবিবরণে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা হয় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা হয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী।

১০। কথ্যবিবরণের অসুবিধা হল কথ্যবিবরণ সাম্প্রতিক কালের লিখিত সূত্রের মত নির্ভরযোগ্য হয় না। কথ্যবিবরণ উত্তরদাতার মৌখিক প্রতিক্রিয়া হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে স্মৃতিচারণজাত বিবরণের মধ্যে প্রচার মাধ্যম, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদির প্রভাব সাপেক্ষে পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। এদিক থেকে কথ্যবিবরণের তথ্য নির্ভরযোগ্যতা বিচারে প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে।

১১। জীবনকথার উপাদানগুলি হল ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বৃত্তান্ত, টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা বৃত্তান্ত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ছবি, আত্মীয়সজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎকার লব্ধ সংবাদ ইত্যাদি।

১২। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতির পদক্ষেপগুলি হল ঃ অন্বেষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্দেশ করা, সংশ্লিষ্ট ঘটনার সমস্যামূলক দিকগুলি চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্ট ঘটনার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করা।

১৩। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নমুনায়ন বলতে তথ্যসূত্রের নমুনায়ন অর্থাৎ খবরের কাগজ, পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদির নমুনায়নকে বোঝায়। নমুনায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্গগঠন হল নমুনা অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলীর শ্রেণি নির্দেশ করা। সাধারণত অনুসৃত তাত্ত্বিক অবধারণ সাপেক্ষে এই বর্গগঠন করা হয়ে থাকে।

১৪। সারবস্তু বিশ্লেষণের অসুবিধা হল তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যথার্থ তথ্য পেশ করে কিনা তা মূল্যায়ন দুরূহ হয়ে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র হাতে পাওয়া যায় না। ফলে, তথ্যগত দিক থেকে যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতার অভাব থাকার সম্ভাবনা থাকে।

## ৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। নিউম্যান, লরেন্স ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস—কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপ্রোচেস (তৃতীয় সংস্করণ) এলিন এ্যান্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৭।

২। রবার্টস, ব্রায়োন ঃ বায়োগ্র্যাফিক্যাল রিসার্চ, ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রেস, বাকিংহাম ফিলাডেলফিয়া, ২০০২।

৩। ব্রুস, এল, বার্জ ঃ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথডস ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস (থার্ড এডন.) এলিন এন্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৮।

৪। হাওয়ার্থ, ডেভিড ঃ ডিসকোর্স, (ফার্স্ট এশিয়ান এডন.) ভিভাবুকস প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ২০০২।

৫। আহুজা, রাম ঃ রিসার্চ মেথডস, রাওয়াত পাবলিকেশন, জয়পুর এন্ড নিউ দিল্লী, ২০০১।

৬। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।

## একক ১ ❑ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

১.৩.১ সাধারণ উপাদান

১.৩.২ প্রশ্নমালা পরিলেখ

১.৩.৩ প্রকারভেদ

১.৩.৪ মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা

১.৩.৫ নিরীক্ষার যথার্থ ক্ষেত্রবিচার

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ উত্তর সংকেত

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

## ১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- নিরীক্ষামূলক গবেষণার কলা কৌশল।
- নিরীক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন রূপগত প্রক্রিয়া।
- নিরীক্ষামূলক গবেষণা প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র।

## ১.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণা হল সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের এক সুসংবদ্ধ ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি, কৌশল ও হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারী সামাজিক গবেষণায় নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সামাজিক গবেষণায় এই পদ্ধতিরই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ থাকায় এক এক ক্ষেত্রে এক এক

রকম প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তবে, এই পদ্ধতির কিছু সাধারণ উপাদান থাকে। এখন, এই পদ্ধতির পরিচয়ার্থে উল্লিখিত সাধারণ উপাদান এবং প্রকারভেদে প্রক্রিয়াগত কলা কৌশলের তারতম্য ও প্রয়োগের যথার্থক্ষেত্র আলোচনা করা হল।

## ১.৩ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

নিরীক্ষামূলক গবেষণা দ্বারা কোনো সামাজিক ঘটনার বৃহৎক্ষেত্রের পরিমাণ গত তথ্য (Quantitative data) সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট আলোচনা একক (Unit of analysis) প্রকৃত একক (Unit of observation)* হিসাবে অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণা দু'ভাগে বিভক্ত থাকে—সমগ্রক সমীক্ষা (Census study) এবং নমুনা সমীক্ষা (Sample study)। সমগ্রক সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল একককেই সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এটা জনগণনা দপ্তরের ন্যায় বৃহৎ সংগঠনের পক্ষে করা সাধ্য হয়ে থাকে। নমুনা সমীক্ষায় সমগ্রকের এক নির্দিষ্ট অংশকে সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই ধরনের সমীক্ষা সময় ও খরচ সাশ্রয়ী হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের সমীক্ষা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। প্রথমত, এই সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট নমুনার সামাজিক অবস্থা, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদির বর্ণনাত্মক প্রতিবেদন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই সমীক্ষা সূত্রে কোনো ঘটনার সঙ্গে অপর কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নমুনা সমীক্ষায় প্রাপ্ত সংবাদ থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সামান্যীকরণ করা হয়ে থাকে বাজার সমীক্ষা, দূরদর্শনের সমীক্ষা, মতামত সমীক্ষা ইত্যাদি হল নমুনা সমীক্ষার উদাহরণ। ৭০ এর দশক থেকে নিরীক্ষা মূলক গবেষণা এদেশে বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে থাকে।

*গবেষণার একক বলতে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কর্মসূচী, জাতি ইত্যাদি বোঝায়, যাদের বৈশিষ্ট্যাবলী গবেষণায় বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। প্রকৃত একক বা পর্যবেক্ষণ একক হল গবেষণার এককের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করুন ঃ

(ক) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় গুণবাচক ❑ / পরিমাণ গত ❑ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(খ) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় ক্ষুদ্রক্ষেত্রের ❑ / বৃহৎক্ষেত্রের ❑ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২। সমগ্র সমীক্ষা ও নমুনা সমীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? (চারটি বাক্যে উত্তর দিন)

৩। নমুনা সমীক্ষা বেশি অনুসরণ করার কারণ কী?

### ১.৩.১ সাধারণ উপাদান

নিরীক্ষামূলক গবেষণা, গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প (Hypothesis) দিয়ে শুরু হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক গবেষণায় (Descriptive research) কোনো ঘটনার কী (What) কেমন (How) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় (Explanatory research) কোনো ঘটনার কেন (Why) প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। সেলটিজ ও অন্যান্যদের (Seltizefal) মতে গবেষণা বিষয়ে মগ্নতা, প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনাপাঠ ও অভিজ্ঞতা বীক্ষা সূত্রে গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর. কে. মার্টিন (R. K. Marton) এর মতে এই প্রশ্ন সাধারণ (Originating question) থেকে বিশেষায়িত (Specifying question) রূপে গঠিত হয়ে থাকে। অনেক সময় গবেষণামূলক প্রশ্নের পরীক্ষামূলক আগাম উত্তর অনুমান করে নিরীক্ষামূলক গবেষণা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষামূলক উত্তর প্রকল্প (Hypothesis) হিসাবে পরিচিত থাকে। এই প্রকল্প অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, গবেষণা প্রতিবেদন, তাত্ত্বিক কাঠামো প্রভৃতি সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রকল্প বর্ণনাত্মক, দুই ঘটনার বা চলের মধ্যে সম্বন্ধসূচক (Associational) এবং নমুনা থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত মূলক (Generalizational) হয়ে থাকে। বর্ণনাত্মক প্রকল্পের উদাহরণ হল ঃ (কোনো এলাকার) বস্তিবাসীদের শিক্ষার মান অনুন্নত থাকে। তথ্যদ্বারা এই প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। সম্বন্ধসূচক প্রকল্পের উদাহরণ হল ঃ (কোনো এলাকার) বস্তিবাসীদের আর্থিক অনগ্রসরতার সাথে শিক্ষাগত অনগ্রসরতা সম্পর্কান্বিত থাকে। এই দুই প্রকল্প নমুনা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রকল্প সমগ্রক সংশ্লিষ্ট হলে তৃতীয় ধরনের প্রকল্প হয়ে থাকে। তৃতীয় ধরনের প্রকল্প পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে নঞর্থক (Null hypothesis) এবং সদর্থক (Alternative hypothesis) ভেদে দুই রূপে গঠিত হয়ে থাকে। তবে, প্রকল্প পরীক্ষণের পূর্বে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ধারণাসমূহের কার্যকরীকরণ (operationalization of concepts) করা দরকার। কার্যকরীকরণের অর্থ হল ধারণাকে (concept) পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য করা। এখানে উল্লিখিত দুটি ধারণা—অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতা—কার্যকরীকরণ করা দরকার। এক্ষেত্রে ঐ দুই ধারণার পর্যবেক্ষণযোগ্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করতে হয়। এখন, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সূচক হতে পারে—নিম্ন আয়, পারিবারিক সদস্য সংখ্যার আধিক্য, খাদ্যসংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। শিক্ষাগত অনগ্রসরতার সূচক (Index) হয় শিক্ষাপ্রাপ্তদের স্বল্প হার, শিক্ষার নিম্নমান শিক্ষাগ্রহণে অনীহা ইত্যাদি। ধারণা কার্যকরীকরণের পরে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য সংবাদ প্রদানকারী প্রকৃত গবেষণা একক নির্দিষ্ট করতে হয়। নিরীক্ষামূলক গবেষণায় এক্ষেত্রে সাধারণত নমুনায়ন প্রক্রিয়া (Sampling technique) অনুসরণ করা হয়ে থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্য সামান্যীকরণ (Generalization) হলে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনা চয়ন (Probability sampling) প্রক্রিয়ায় যথার্থ কৌশল—সরল সম্ভাবনানির্ভর নমুনায়ন (Simple random sampling) সুবিন্যস্ত নমুনা চয়ন (Systematic random sampling) স্তরবিন্যাসী নমুনা চয়ন (Stratified random sampling) গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অন্যক্ষেত্রে সম্ভাবনা অনির্ভর নমুনা চয়ন (Non probability sampling) প্রক্রিয়ার যথার্থ কৌশল—সুবিধাজনক নমুনায়ন (convenience sampling), উদ্দেশ্যজনক নমুনায়ন (Purposive

Sampling), নির্ধারিত সংখ্যক নমুনায়ন (Quota sampling), ক্রমপুঞ্জীত নমুনায়ন (Snow-ball sampling)—প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রকৃত একক নির্ধারণ করার পরে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে হাতিয়ার (Instrument) হিসাবে প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ২**

১। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্নিত করুন—

ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কী ❑ কেন ❑ কেমন ❑ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়।

২। গবেষণামূলক প্রশ্নের কয়েকটি উৎস সূত্রের উল্লেখ করুন।

৩। প্রকল্পের বিভিন্ন রূপগুলি কী কী?

## ১.৩.২ প্রশ্নমালা পরিলেখ

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ সংবাদ সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে প্রশ্নমালা গঠন করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা পরিকল্পনা অনুসরণ করা দরকার। এই পরিকল্পনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যাক।

প্রশ্নমালার একেবারে ওপরে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা সংস্থার নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রশ্নমালায় গবেষণার উদ্দেশ্যের নীচে বন্ধনীর মধ্যে অনেক সময় সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এরপর, বামদিকে উত্তরদাতার সাংকেতিক সংখ্যা এবং ডানদিকের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময় উল্লেখিত থাকে। এরপর নীচে প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

নিউম্যান (Neuman) প্রশ্নাবলী বিন্যাসে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেন—আদ্য, মধ্য ও অন্তভাগ। প্রথম স্তরে উত্তরদাতার কাছে সহজ, আকর্ষক ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রশ্ন রাখা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত উত্তরদাতার পরিচয় সংক্রান্ত নাম, ঠিকানা, শিক্ষা ইত্যাদি—প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে গবেষণা বিষয়ের সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একই বিষয়সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পূর্বাপরক্রমে একই সাথে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ের সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করার পর ঐ বিষয়ের বিশেষ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটা ফানেল পদ্ধতি (Funnel Sequence) নামে পরিচিত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে উল্টো ফানেল পদ্ধতিও (Inverse Funnel Sequence) অনুসরণ করা যায় বিশেষ করে যেখানে উত্তরদাতা কোনো বিষয়ের সাধারণ দিক সম্পর্কে অনবহিত থাকে। বেইলি (Bailey) এবং মসার ও ক্যালটনের (Moser & Kalton) মতে প্রশ্নমালার অন্তভাগে আয়, যৌনাচার ইত্যাদি সংক্রান্ত স্পর্শকাতর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে, যে কোনো স্তরেই ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন (factual question) করার পর মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন (Opinion question) অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এছাড়া, প্রশ্নগুলি একটি স্বাভাবিক ক্রমে বিন্যস্ত থাকা দরকার যাতে উত্তরদাতা বিভ্রান্ত না হয়ে সাবলীলভাবে উত্তর দিতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রশ্ন মুক্তপ্রায় এবং বন্ধ হতে পারে। মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের (Open ended question) কোনো উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

থাকে। বন্ধপ্রশ্নের (Close ended question) ক্ষেত্রে উত্তরের কয়েকটি প্রতিকল্প ইঙ্গিত দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা প্রযোজ্য উত্তরটি মনোনয়ন করে থাকে। তবে, প্রশ্নাবলী বেশি দীর্ঘায়ত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত ৩-৪ পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা যথেষ্ট হয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলীর একেবারে নীচে সাক্ষাৎকারীর মন্তব্যস্থান নির্ধারিত করতে হয়। এছাড়া, ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশ্নমালা শেষ করতে হয়। তবে, চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনের আগে খসড়া প্রশ্নমালা গঠন করতে হয়। ঐ খসড়া প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ (Pretesting) সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা (final questionnaine) গঠন করা বিধেয়। প্রাক-পরীক্ষণ বলতে গবেষণায় প্রয়োগের আগে গবেষণা এককের কিছু অংশের মধ্যে খসড়া প্রশ্নমালার পরীক্ষণমূলক প্রয়োগকে বোঝায়। এর মাধ্যমে খসড়া প্রশ্নমালার ত্রুটি, বিভ্রান্তি, ঘাটতি ইত্যাদি পরখ করে এবং খসড়া প্রশ্নমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠন করা হয়।

**অনুশীলনী** - ৩

১। ফানেল পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

২। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্নিত করুন

(ক) স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রশ্নমালার আদ্যভাগে ❑ / মধ্যভাগে ❑ / অন্তভাগে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(খ) ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের পূর্বে ❑ / পরে ❑ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৩। সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রশ্নমালায় কোথায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

## ১.৩.৩ প্রকারভেদ

তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াগত দিক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণার কয়েকটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল ঃ গোষ্ঠী নিরীক্ষা (Group survery) ডাকযোগে নিরীক্ষা (Mail survey) মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face to face interview) এবং দূরভাষ নিরীক্ষা (Telephone survey)। গোষ্ঠী নিরীক্ষায় কোনো প্রতিবেদক গোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে প্রশ্নমালা দেওয়া হয় স্বপরিচালিত (Selfadministered) হয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য। কোনো সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ, কোনো গ্রন্থাগারের সদস্যগণ ঐ গোষ্ঠীর উদাহরণ হতে পারে। এই ধরনের নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেক সময় গবেষক উপস্থিত থাকে প্রশ্ন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এবং উত্তরদাতাদের হাল্কা চাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই ধরনের নিরীক্ষায় খরচ কম হয়। এছাড়া, গবেষক একক প্রচেষ্টাতেই এই গবেষণা চালাতে সক্ষম হয়।

ডাকযোগে নিরীক্ষাতেও স্বপরিচালিত হয়ে প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ডাকযোগে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়ে থাকে। প্রশ্নাবলীর যথার্থ উত্তর পাওয়ার জন্য একটি

নির্দেশনামা পাঠানো হয়। এছাড়া, একটি আবৃত চিঠি দেওয়া হয় প্রশ্নমালার (নির্দেশ অনুযায়ী) উত্তর দান করে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করে। ফেরত পাঠানোর জন্য গবেষকের ঠিকানা লেখা এবং ডাকটিকিট সাঁটা একটি খামও পাঠানো হয়ে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রশ্নমালার ফর্মা চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালার কাগজ ও মুদ্রণ উৎকৃষ্টমানের হওয়া দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার সিদ্ধ। এছাড়া, কিছুক্ষেত্রে আর্থিক উদ্দীপক প্রদানও অপরিহার্য হয়ে থাকে। তবে, স্যানডার্স ও পিনহের (Sanders & Pinhey) মতে গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখিত সুচারু আবৃতপত্র বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ধরনের গবেষণা খরচের দিক থেকে সাশ্রয়ী হয়ে থাকে। এছাড়া, নমুনা অন্তর্ভুক্ত সব উত্তরদাতাকে পাওয়া এই গবেষণায় সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, এই গবেষণার অসুবিধা হল উত্তরদাতারা সকলেই উত্তর পাঠায় না। এছাড়া, এই প্রক্রিয়ায় গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সূত্রে তথ্য সম্ভব হয় না।

---

**অনুশীলনী - ৪**

১। গোষ্ঠীনিরীক্ষায় গবেষকের উপস্থিতি কেন প্রয়োজনীয়?

২। ডাকযোগে নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের প্রশ্নাবলীর উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কী করণীয়?

---

## ১.৩.৪ মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সুসংগঠিত প্রশ্নমালা অনুযায়ী উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করে এবং প্রাপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে। এই সাক্ষাৎকার সাধারণত মুখোমুখি হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Numan) মতে এটা দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এক সামাজিক আন্তক্রিয়া বিশেষ (Social interaction between two strangers)। এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকারকারীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। সাক্ষাৎকারকারীকে প্রথমে উত্তরদাতাদের সাথে পরিচিত হতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কোনো সংস্থার পরিচয়পত্র বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। এছাড়া, গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন ও নেতৃত্বস্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ ও পরিচয়পর্ব সুগম করে থাকে। পরিচিতির পর সাক্ষাৎকারকারীকে উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালা অনুযায়ী প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তর লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই ভূমিকায় সাক্ষাৎকারকারী উত্তরদাতাদের কোনো প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেবে না। প্রশ্ন বুঝতে, অসুবিধা হলে প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করতে পারে। কিন্তু, প্রশ্নের উত্তরের কোনো ইঙ্গিত (leading question) করা যাবে না। বরং, অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (prove question) করে যথার্থ উত্তর জানা যেতে পারে। বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নে (close ended question) এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয় কারণ, প্রশ্নে প্রদত্ত পরিবর্তন উত্তরগুলির মধ্যে উত্তরদাতার মনোনীত উত্তরটি চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের (Open ended question) ক্ষেত্রে কাজটি কিছু জটিল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত উত্তরটি অপরিবর্তিত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার কাজটিকে সহজ করে থাকে। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন উত্থাপন এবং প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও সাক্ষাৎকারকারীর আর একটি বিশেষ ভূমিকা উল্লেখিত হয়ে থাকে, এই ভূমিকা হল উত্তরদাতার সামাজিক

পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গী, উত্তরদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ (observation) করা এবং পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ করা। এই তথ্যাবলী উত্তরদাতার উত্তরগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (face to face interview) এর বিশেষ সুবিধা হল উত্তরদাতা স্বয়ং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রশ্নের মর্ম বোঝার অসুবিধা হলে সাক্ষাৎকারকারীর সহযোগিতা লাভ করা যায়। এছাড়া, একই সাথে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলায় প্রদত্ত উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, উত্তরদাতাদের খুঁজে বার করা, কাছে পাওয়া খরচাবহুল এবং সময় সাধ্য হয়ে থাকে। এছাড়া, সাক্ষাৎকারকারীর উপস্থিতিহেতু অনেক সময় উত্তরদাতারা স্পর্শকাতর প্রশ্নের উত্তরদান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। ফলে, ঐসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন হয়।

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় আর এক ধরনের সাক্ষাৎকার হল দূরভাষ নিরীক্ষা। এটি হল অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। ১৯৮৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিরীক্ষার সাক্ষাৎকারে দূরভাষের ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় দূরভাষ নির্দেশিকা (Telephone Directory) থেকে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনা চয়ন প্রক্রিয়ার সুবিন্যস্ত নমুনায়ন কৌশল প্রয়োগ করে নমুনা চয়ন করা হয়ে থাকে। অতঃপর, দূরভাষ সংযোগে নমুনা অন্তর্ভুক্ত এককদের সাথে প্রশ্নমালা নির্ভর সংলাপ বিনিময় করা হয়ে থাকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের (face to face interview) সাথে দূরভাষ নিরীক্ষার (Telephone Survey) তুলনামূলক বিচারে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার কিছু বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা উন্মেষ করা যায়। দূরভাষ নিরীক্ষা খরচ সাশ্রয়ী এবং কম সময়সাধ্য হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে আগ্রহী হয়। প্রশ্নকর্তা সামনে না থাকায় স্পর্শকাতর বিষয়ের উত্তরও যথাযথভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল দূরভাষ নির্দেশিকায় যাদের নাম নেই তারা নমুনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার, যাদের নামে একাধিক দূরভাষ সংযোগ থাকে তারা একাধিকবার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে, নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বমূলক হয় না। এছাড়া, দূরভাষ নিরীক্ষায় বেশিক্ষণ কথা বলা না যাওয়ায় সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, সাক্ষাৎকারকারী উত্তরদাতার মান ঠিক অবস্থা এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পারায় উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায় না।

---

**অনুশীলনী - ৫**

১। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে পর্যবেক্ষণের ভূমিকা কী?

৩। দূরভাষ নিরীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

## ১.৩.৫ নিরীক্ষামূলক গবেষণার যথার্থ ক্ষেত্র

নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির যথার্থ ক্ষেত্র গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ব্যাপকতা বিচারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই গবেষণার উদ্দেশ্যগত দিক ১.৩ অংশে নিরীক্ষামূলক গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। ব্যাপকতার দিক থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অন্বেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যথার্থ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে রুবিন এবং বেবীর (Rubin & Babbie) বক্তব্য হল নিরীক্ষা পদ্ধতি নমুনায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগে

মনোনীত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সমগ্রক বা বৃহৎ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। নিউম্যানের মতে অধিক সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব, মতামত, অতীত ও বর্তমানের আচরণ গত বৈশিষ্ট্য জানার জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে। এছাড়া, একসাথে একাধিক বিষয়ের অবহিতি, একাধিক চলের পরিমাপ এবং একাধিক প্রকল্পের পরীক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে।

## ১.৪ সারাংশ

সমাজে বৃহৎক্ষেত্রের নিরিখে ব্যক্তির বিশ্বাস, মনোভাব আচরণ ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক ঘটনার বর্ণনাত্মক, ব্যাখ্যামূলক এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত মূলক প্রশ্নের বা প্রকল্পের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষামূলক গবেষণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নমুনা সমীক্ষা রূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নমুনায়ন প্রক্রিয়ার যথার্থ কৌশল অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ একক মনোনীত করা হয়ে থাকে। অতঃপর প্রশ্নমালা নির্ভর তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠী সমীক্ষা, ডাকযোগে সমীক্ষা, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি সাধারণ ফর্মায় স্থানান্তরিত করে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত সংবাদ প্রতিবেদিত করা হয়ে থাকে।

## ১.৫ অনুশীলনী

১। নিরীক্ষামূলক গবেষণা কী উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে?

২। ধারণার কার্যকরীকরণ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

৩। মুক্তপ্রান্ত এবং বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ বলতে কী বোঝায়? চূড়ান্ত প্রশ্নামালা গঠন প্রাক পরীক্ষণের ভূমিকা কী?

৫। ডাকযোগে নিরীক্ষার উপাদানগুলি লিখুন।

৬। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা কী?

৭। দূরভাষনিরীক্ষার অসুবিধাজনক দিকগুলি উল্লেখ করুন।

## ১.৬ উত্তরসংকেত

**অনুশীলনী - ১**

১। (ক) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় গুণবাচক ☐ / পরিমাণগত ☑ / তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(খ) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় ক্ষুদ্রক্ষেত্রের ☐ / বৃহৎক্ষেত্রের ☑ / তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২। সমগ্রক সমীক্ষা ও নমুনা সমীক্ষার মধ্যে পার্থক্য হল সমগ্রক সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল একককেই

সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু নমুনা সমীক্ষায় সমগ্রকের একটি অংশকে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

৩। সময় ও খরচ সাশ্রয়ী হওয়ায় নমুনা সমীক্ষা বেশি অনুসরণ করা হয়।

---

**অনুশীলনী - ২**

১। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কী ❑ কেন ❑ কেমন ❑ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়।

২। গবেষণামূলক প্রশ্নের উৎস বলতে গবেষণা বিষয়ে মগ্নতা, প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনা পাঠ ও অভিজ্ঞতাবীক্ষার উল্লেখ করা যায়।

৩। প্রকল্পের রূপগুলি হল ঃ বর্ণনাত্মক, দ্বি-চলের সম্বন্ধসূচক ও নমুনা থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তমূলক।

---

**অনুশীলনী - ৩**

১। কোনো বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তির পর বিশেষ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তিকে ফানেল পদ্ধতি বলে।

২। (ক) স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রশ্নমালার আদ্য-ভাগে ❑ / মধ্যভাগে ❑ / অন্তভাগে ☑ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(খ) ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের পূর্বে ☑ / পরে ❑ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৩। প্রশ্নমালায় গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লেখের নীচে বন্ধনীর মধ্যে সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী - ৪**

১। গোষ্ঠী সমীক্ষায় প্রশ্ন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এবং উত্তরদাতাদের হালকা মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গবেষকের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে।

২। ডাকযোগে নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালায় উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আলাদা খামে একটি আবৃতি চিঠি দেওয়া হয়। ঐ চিঠিতে গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয় এবং প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে প্রশ্নমালায় যথার্থ উত্তর লিপিবদ্ধ করে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করা হয়ে থাকে। ফেরত দেওয়ার জন্য গবেষকের ঠিকানা লেখা এবং ডাকটিকিট আঁটা ফিরতি খাম উত্তরদাতাকে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় প্রশ্নমালার ফর্মা চিত্তাকর্ষক করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে উদ্দীপক স্বরূপ কিছু অর্থও পাঠানো হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী - ৫**

১। সাক্ষাৎকার হল দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এক সামাজিক আন্তঃক্রিয়া। নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকারকারী সুসংগঠিত প্রশ্নমালা অনুযায়ী উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করে এবং প্রাপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে।

২। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তরদাতার সামাজিক পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গী, উত্তরদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ অবহিতি লাভ করা যায় যার মাধ্যমে উত্তরগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

৩। দূরভাষ নিরীক্ষা বলতে দূরভাষ সংযোগে নমুনা অন্তর্ভুক্ত এককদের সাথে প্রশ্নমালা নির্ভর সংলাপ করাকে বোঝায়।

## সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। নিরীক্ষামূলক গবেষণা সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সামাজিক অবস্থা, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদির বর্ণনাত্মক প্রতিবেদন পেশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, এই সমীক্ষায় কোনো ঘটনার সাথে অপর কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নমুনার বৈশিষ্ট্য থেকে সামান্যীকরণ সূত্রে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা।

২। ধারণার কার্যকরীকরণের অর্থ হল ধারণাকে পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য করা। এক্ষেত্রে ধারণাটির প্রয়োজনীয় সূচক নির্দেশ করতে হয়। যেমন, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা একটি ধারণা। একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য করার জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূচক হল ঃ শিক্ষা গ্রহণে অনীহা, শিক্ষার নিম্নমান, শিক্ষা প্রাপ্তদের স্বল্প হার।

৩। মুক্তপ্রান্ত এবং বন্ধপ্রাপ্ত প্রশ্নের পার্থক্য হল ঃ মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নে কোনো উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় না। কিন্তু বন্ধ প্রশ্নে প্রশ্নের একাধিক বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। এছাড়া, মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নে উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু বন্ধপ্রশ্নে উত্তরদাতা প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে কোনো একটি মনোনয়ন করে মাত্র।

৪। প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ বলতে বোঝায় মূল গবেষণায় প্রয়োগের পূর্বে খসড়া প্রশ্নমালা গবেষণা এককের এক ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনে প্রাকপরীক্ষণের ভূমিকা হল খসড়া প্রশ্নমালার ত্রুটি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি পরখ করে যথার্থ চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনে সহায়তা করা।

৫। ডাকযোগে নিরীক্ষার উপাদানগুলি হল ঃ

প্রশ্নমালার সাথে উত্তরদানের নির্দেশনামা পাঠানো;

একটি আবৃত পত্র দিয়ে উত্তরদানে অনুরোধ করা,

উত্তরসংবলিত প্রশ্নমালা ফেরত পাঠানোর জন্য ডাকটিকিট লাগানো এবং গবেষকের ঠিকানা সংবলিত ফিরতি খাম পাঠানো;

কিছু ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে অর্থ প্রদান;

সর্বোপরি, প্রশ্নমালা ফর্মা চিত্তাকর্ষক করা।

৬। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারকারীকে কিছু ভূমিকা পালন করতে হয় ;

প্রথমে সাক্ষাৎকারকারীকে উত্তরদাতাদের সাথে পরিচিতির সূত্রে আবন্ধ হতে হয়;

অতঃপর প্রশ্নমালা অনুসারে উত্তরদাতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়;

উত্থাপিত প্রশ্নে উত্তরগুলি যথার্থভাবে লিপিবন্ধ করতে হয়;

এছাড়া, উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিবেশ, মনোভাব, উত্তরদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য লিপিবন্ধ করতে হয়।

৭। দূরভাষ নিরীক্ষার অসুবিধা জনক দিকগুলি হল ঃ

দূরভাষ নির্দেশিকায় যাদের নাম থাকে না তারা নমুনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার, যাদের নাম একাধিকবার থাকে তারা একাধিকবার নমুনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে, নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্ব মূলক হয় না।

দূরভাষে বেশিক্ষণ সংলাপ চালানো যায় না। ফলে প্রাপ্তসংবাদ সম্পূর্ণ হয় না।

এছাড়া, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্ভব না হওয়ায় প্রাপ্ত উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায় না।

## ১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেইলি. কে. ডি. মেথডস অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) ফ্রি প্রেস্ নিউইয়র্ক, ১৯৮৭।

২। বেকার থেরিসি এল. ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহীলস ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৩। ঘোষ, বিনয় ঃ সাইনটিফিক মেথডস এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) স্ট্যালিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।

# একক ২ ❑ ক্ষেত্রগবেষণা ও পর্যবেক্ষণমূলক অন্বেষণ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ ক্ষেত্রগবেষণা
২.৩.১ ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদান
২.৩.২ ক্ষেত্রগবেষণার রূপরেখা
২.৩.৩ বিশ্লেষণী পদ্ধতি
২.৩.৪ সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা
২.৩.৫ ক্ষেত্রগবেষণার যথার্থ বিচার
২.৪ সারাংশ
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ উত্তর সংকেত
২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

## ১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

- ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতির কৌশলগত বিভিন্ন দিক
- ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতির সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা
- ক্ষেত্রগবেষণার যথার্থ ক্ষেত্র

## ২.২ প্রস্তাবনা

আন্তঃক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক গবেষণার আর এক বিশেষ পদ্ধতি হল ক্ষেত্রগবেষণা (Field research)। এই পদ্ধতি গুণবাচক গবেষণার (Qualitative research) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কোনো সামাজিক ক্ষুদ্রক্ষেত্রের জনগোষ্ঠীর অন্তঃগ্রাহী গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই গবেষণার তথ্যাবলী মূলত গুণবাচক হয়ে থাকে। ফলে, তথ্যসংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাঁধা-ধরা কোনো রীতি অনুসরণ করতে হয় না। গবেষকের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। তবে, এই

গবেষণায় কতকগুলি সাধারণ উপাদান উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই এককে ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদানগুলি আলোচনা করে এই গবেষণার সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

## ২.৩ ক্ষেত্রগবেষণা

ক্ষেত্রগবেষণা হল কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে পর্যবেক্ষকের এক সংবেদনশীল সম্পর্ক সূত্রে অনুসৃত অন্তঃগ্রাহী গবেষণা। বেইলির (Bailey) মতে এই গবেষণা অনেক সময় মানবজাতির বিবরণ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে (The term ''field study'' is often used almost simultaneously with the term ''ethnographic study'' or ''ethnography'') এই গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিবরণ গবেষকের বহিস্থ দৃষ্টিভঙ্গীজাত (etic) বিবরণ নয়। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তঃস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর (emic) বিবরণ হয়ে থাকে। যদিও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও অভিযানকারীদের ভিনসংস্কৃতির বিবরণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ উল্লেখিত হয়ে থাকে। বি. ম্যালিনৌস্কির (B. Malinowski) 'আর্গনাটস অফ দি ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক' (Argonauts of the Western Pacific, 1992) এই গবেষণা পদ্ধতির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকাগো স্কুলের (Chicago school) এজরা পার্ক (Ezra park) টি. ওয়াশিংটন (T. Washington) প্রমুখ সমাজবিদরা এই গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণার বিপরীতে এই গবেষণা পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। ক্ষেত্রগবেষণা কাকে বলে?

২। ক্ষেত্রগবেষণার অপর আর এক নাম কী?

৩। ক্ষেত্রগবেষণার পথপ্রদর্শক কোন্ গবেষণা?

## ২.৩.১ ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদান

বেকার (Baker) ক্ষেত্রগবেষণার কতকগুলি সাধারণ উপাদানের উল্লেখ করেন। এই উপাদানগুলি হল ঃ গবেষণা ক্ষেত্র (Setting), একটি সাধারণ বিষয় (A General Subject), নির্দিষ্ট কর্মসূচি (Time frame) এবং পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন দিক (Things to observe)।

**(ক) গবেষণা ক্ষেত্র ঃ**

ক্ষেত্রগবেষণার জন্য একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া, ঘটনা ইত্যাদি ঘটে থাকে। গবেষণাক্ষেত্র মনোনয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি দিক নজরে রাখতে হয়। এগুলি হল ঃ যথেষ্ট তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রাপ্তব্য তথ্যের যথার্থতা এবং ক্ষেত্রসম্পর্কে অনবহিতি। অপরিচিত ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ সহজ হয়ে থাকে। তবে, ক্ষেত্রে প্রবেশের সাধ্যতা বিচারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আইনগত

ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। যেমন, কোনো সংরক্ষিত আদিবাসী এলাকায় বাইরে থেকে কেউ গিয়ে গবেষণা করতে পারেনা।

**(খ) একটি সাধারণ বিষয় ঃ**

যদিও ক্ষেত্রগবেষণার দিক নির্দেশ গবেষণা চলাকালীনই হয়ে থাকে, তবুও একটি সাধারণ বা বিশেষ লক্ষ্য /বিষয় নিয়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ সুবিধাজনক হয়ে থাকে। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এলিজা এ্যান্ডারসন (Elijah Anderson) জেলির শুঁড়িখানায় (Jelly''s Bar) ক্ষেত্রগবেষণায় শুঁড়িখানায় আসা পুরুষদের সামাজিক অবস্থান বা পদমর্যাদা বোঝায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

**(গ) নির্দিষ্ট সময়সূচি ঃ**

গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর গবেষণার সময়সূচী নির্ভরশীল থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি স্বল্প সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় কম লাগে। আবার সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিস্তৃত সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় দীর্ঘায়ত হয়ে থাকে। এ্যান্ডারসন দীর্ঘকাল ধরে তাঁর গবেষণা করে থাকেন। দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণায় নির্দিষ্ট অন্তরে ক্ষেত্রে পরিদর্শনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, স্বল্প সময়কালীন গবেষণায় নির্দিষ্ট সময় অন্তরে ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয়ে।

**(ঘ) পর্যবেক্ষণযোগ্য দিকসমূহ ঃ**

বেকারের (Baker) মতে ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণের দিকগুলি হল ঃ সাধারণ পরিবেশ (The environment), জনগোষ্ঠী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক (People and their relationships), আচরণ ও ক্রিয়া গর্ম (Behaviour, action and activities) এবং ইতিহাস (Histories)।

পরিবেশ বলতে কোনো ক্ষেত্রের শীতলতা, উষ্ণতা, গন্ধ, বস্তুগত দিক (আসবাবপত্র, সাজ-সজ্জা, গাছ-পালা ইত্যাদি) এবং দৃশ্য বহিরঙ্গকে বোঝায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশ বিভিন্ন রকম লয়ে থাকে। যদিও পরিবেশ ক্ষেত্রগবেষণায় মূল বিষয় হয় না, তবুও ক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। মানুষই ক্ষেত্রগবেষণার মূল বিষয়বস্তু। তবে, একে অপরের সাথে ভূমিকা গ্রহণকারী মানুষই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। পিতা পুত্রের সম্পর্ক, ঊর্ধ্বতনের সাথে অধস্তনের সম্পর্ক, সদস্য এবং বহিরাগতের সম্পর্ক ইত্যাদির ধরন পর্যবেক্ষণে উপযোগী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কান্টার (Kanter) ইন্ডসকো কর্পোরেশন (Indsco Corporation) সংক্রান্ত ক্ষেত্রসমীক্ষায় ব্যবস্থাপক (Manager) এবং কর্মাধ্যক্ষের (Secretary) মধ্যকার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের আঙ্গিক এবং মৌলিক এই দুই ধরনের দিকই পর্যবেক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, কোনো শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্র গবেষণায় কোন ধরনের ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তুলছে (প্রথম বেঞ্চের ছাত্র না শেষ বেঞ্চের ছাত্র), কী ভাবে উত্তর বলছে, শিক্ষক মহাশয় এক জায়গায় বসে থাকে না ছাত্রদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মূল নিবাস থেকে বর্তমান ক্ষেত্রে আগমনের সময়, কারণ, অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি

সংক্রান্ত সংবাদ কথ্য বিবরণ (Oral history) সূত্রে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করে, যেমন বাদ্যযন্ত্র, শিকারের হাতিয়ার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ২**

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?

২। ক্ষেত্র গবেষণায় সময়সূচি কিসের ওপর নির্ভর করে?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় কী ধরনের মানুষ পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়?

## ২.৩.২ ক্ষেত্রগবেষণার রূপরেখা

গবেষণার রূপরেখা সমধর্মী না হলেও, প্রতি ধরনের গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা কয়েকটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে থাকে। বেকারের (Baker) মতে ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা যে দিকগুলি নির্দেশ করে তা হল ঃ পর্যবেক্ষকের বিভিন্ন ভূমিকা, ক্ষেত্র গবেষণায় প্রস্তুতি, ক্ষেত্রে প্রবেশ, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য লিপিবদ্ধকরণ।

**(ক) ক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা ঃ**

ক্ষেত্রে গবেষককে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, রেমন্ড গোল্ড (Raymond Gold) এর মতে এই ভূমিকাগুলি হল ঃ সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী (Complete Participant), অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক (Participant Observer), পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণকারী (Observer Participant) এবং সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক (Complete Observer)। প্রথম ভূমিকায় গবেষকের সত্য পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সদস্যদের কাছে গোপন করা হয়। গবেষক যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বা স্বাভাবিকতায় অভিনয় করে সদস্যদের জীবনের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রোজেন হ্যাম (Rosen ham) মানসিক রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে গবেষণা করেন। দ্বিতীয় ভূমিকায় গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। যেমন, রেল হকারদের সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে হকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হয়। তবে, এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য জানান দেওয়া হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রের গবেষক তার পরিচয় জ্ঞাপন করে সদস্যদের পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন, কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার জন্য গবেষক ঐ আন্দোলনের নেতাদের তার পরিচয় দিয়ে পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। চতুর্থ ক্ষেত্রে গবেষক গবেষণা এককের জীবন ধারায় অংশগ্রহণ না করে এবং তাদের অজান্তে তাদের পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন, কোনো পার্কে বসে কিশোর কিশোরীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায় তাদের কিছু

অবহিত না করেই। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষকের যথার্থ ভূমিকা নির্দেশক কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক বিচার রোধের দ্বারা গবেষকের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হয়।

**(খ) ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি ঃ**

ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্বে গবেষককে ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা প্রস্তুতি নিতে হয়। এই প্রস্তুতি বলতে ক্ষেত্র সম্পর্কে আগাম অবহিতি অর্জন বোঝায়। এই অবহিতি অন্তস্থ এবং বহিস্থ সূত্রে লাভ করা যায়। বহিস্থ সূত্র বলতে মুদ্রিত রচনাবলীকে বোঝায়। এই রচনাবলী পুস্তক, পত্রিকা, নিবন্ধ-পাঠের মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়। অন্তস্থ সূত্র বলতে ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো সদস্যের দেওয়া সংবাদকে বোঝায়। এই সংবাদ ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাক অবহিতি দিয়ে থাকে। যেমন, হাসপাতাল, সমবায় সংস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোনো কর্মীর দেওয়া সংবাদ বিশেষ কার্যকরী হতে পারে।

**(গ) ক্ষেত্রে প্রবেশ**

ক্ষেত্রে প্রবেশ গবেষণার এক চরম পরীক্ষা। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্থ সদস্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ মসৃণ করলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গবেষক অপরিচিত হওয়ায় তার গ্রাহ্যতা স্থাপন কঠিন হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বা গবেষণা সংস্থার পরিচয়পত্র এই প্রবেশ পথ সুগম করতে সাহায্য করে থাকে। খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ সহজসাধ্য হলেও বিদ্যালয়, শিল্প সংস্থা ইত্যাদির বন্ধ ক্ষেত্রে পরিচয় পত্র ছাড়া প্রবেশ সম্ভব হয় না। তবে, অনেক ক্ষেত্রের ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো মধ্যবর্তী ব্যক্তির সহায়তায় এই ক্ষেত্র প্রবেশ সহজ হতে পারে। পারস্পরিক সখ্যতা (Rapport) স্থাপন এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

**(ঘ) তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যলিপিবদ্ধকরণ ঃ**

ক্ষেত্র গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে সাধারণত অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Participant observation) এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার (Un-structured interview) প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ব্যক্তিগত নথি (Personal documents) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে দীর্ঘকালব্যাপী ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করতে এবং গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সামিল হতে হয়। এইরূপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গবেষক ঐ গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারে, এবং তাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের (পরিবেশ, আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি) তথ্যসংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক জীবনের মূল সূত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনার সংবাদে নিহিত থাকে। তাই এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত দিকসমূহের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সব পর্যবেক্ষিত সংবাদ সময়মত নথিভুক্ত করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও-টেপ কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও, লিখিত নথি বা লিপি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পর্যবেক্ষককে তথ্য নথিভুক্তকরণে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য

নথিভুক্তিকরণের মধ্যে বেশি সময় ব্যবধান রাখা যায় না, কারণ স্মৃতি বিলোপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, তথ্য নথিভুক্তিকরণ একাধিক পর্যায়ে করা হয়ে থাকে। প্রথমে সংক্ষিপ্ত (Sketchy) তারপর বিশদ (Detailed) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পর্যবেক্ষণকালেই করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে বিশদ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ স্মারক এর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (Jotted Notes) সূত্রে বিশদ ক্ষেত্রলিপি (Field Notes) গঠন ক্ষেত্র গবেষণার মূল উপকরণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বিভিন্ন দিকের বিবরণ বিভিন্ন লিপিতে আলাদা করে লেখা সুবিধাজনক হয়। তাই, পর্যবেক্ষণের তথ্য নথিভুক্ত করতে বিভিন্ন লিপি—প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ লিপি, সিদ্ধান্ত লিপি, পদ্ধতি সংক্রান্ত লিপি ইত্যাদি—প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রথম ধরনের লিপি ক্ষেত্র থেকে ফিরেই প্রস্তুত করতে হয়। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উত্তরদাতাদের নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হয়। দ্বিতীয় লিপিতে সংগৃহীত তথ্যাবলী সূত্রে প্রাপ্ত ধারণা বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় লিপিতে পর্যবেক্ষণস্তরে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসৃত বিভিন্ন কলা-কৌশল উল্লেখিত থাকে। পর্যবেক্ষণ ছাড়া, সাক্ষাৎকার ক্ষেত্র গবেষণার অপর এক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি। এই সাক্ষাৎকার হয় একটি কথোপকথন প্রক্রিয়া (Conversation Process), এটা হয় অসংগঠিত (Un-structured) অনিয়ন্ত্রিত (Uncontrolled), মুক্ত প্রান্ত (Open ended) এবং অন্তঃগ্রাহী (In-depth), যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং তার মর্ম বোঝা একই সাথে ঘাটে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নাবলীর উত্তর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় খোঁজার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে উত্তরদাতাদের বক্তব্য পেশকে ব্যাহত না করে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দেওয়ায় উৎসাহিত করতে হয়। তবে, এই সাক্ষাৎকার বিভিন্ন পর্যায়ে করা হয়ে থাকে, প্রথম পর্যায়ে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল প্রশ্ন পরিহার করে সহমর্মী এবং সহানুভুতিশীল মেলামেশার মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপন করতে হয়। পরবর্তীস্তরে বন্ধুত্ব পূর্ণ সংলাপ-এর মাধ্যমে অন্তরস্থ সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এই সাক্ষাৎকার শুধু একক ব্যক্তির সাথে হয় না ব্যক্তি গোষ্ঠীর সাথেও সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে। বার্জেস (Burgess) ছাত্রদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নের উত্তর গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দিয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারে সদস্যদের মুখের কথা হুবহু নথিভুক্ত করার জন্য টেপ-রেকর্ডারের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। আবার, টেপ-রেকর্ডার কথোপকথন প্রক্রিয়ার সব প্রাসঙ্গিক দিক সংরক্ষিত করতে না পারায় সমান্তরাল হাতিয়ার হিসাবে সাক্ষাৎকার লিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এই লিপিতে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তর ছাড়াও একটি প্রারম্ভিক পত্র (Face shut) লেখা হয়ে থাকে। এই পত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, স্থান, সদস্যদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সাক্ষাৎকারের বিষয় লেখা হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Neuman) মতে এই প্রারম্ভিক সমাক্ষাৎকার লিপির অর্থ জ্ঞাপনের সহায়ক হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার ছাড়া ক্ষেত্র গবেষণার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হল ব্যক্তিগত নথি (Personal documents), আত্মজীবনী (Autobiography), চিঠি (Letters), দিনলিপি (Diaries), পারিবারিক বৃত্তান্ত (Family history) ইত্যাদি ব্যক্তিগত নথি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই সব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সহায়ক বোধ (Understanding) জ্ঞাপন করে থাকে। তবে,

এই সব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ব্যবহার করার পূর্বে এসবের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের পর ধারাবাহিক ভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করা হলে তা প্রদান করে বা সদস্যদের উদ্দেশ্যে কোনো ভোজ দিয়ে এবং গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

---

**অনুশীলনী - ৩**

১। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকের ভূমিকার পার্থক্য কী?

২। ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় সাক্ষাৎকার বলতে কী বোঝায়?

৪। সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধকরণে প্রারম্ভিক পত্র কেন প্রয়োজন?

৫। কয়েকটি ব্যক্তিগত নথির উল্লেখ করুন।

---

## ২.৩.৩ বিশ্লেষণী পদ্ধতি

ক্ষেত্র গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা গবেষকদের লেখায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, এই গবেষণার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্মাণ হওয়ায় ক্ষেত্রলিপি অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী থেকে আদর্শ রূপ (pattern) নির্ধারণ করে ঐ আদর্শ রূপ সমূহের মধ্যে সম্পর্ক সূত্রে তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

### আদর্শ রূপ (Pattern)

আদর্শ রূপ হল সামাজিক ঘটনা, আন্তঃক্রিয়া, রীতি প্রভৃতির সাধারণ রূপ। ক্ষেত্র গবেষণায় তথ্যবিশ্লেষণে গবেষক এই ধরনের আদর্শ রূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট থাকে। এই আদর্শ রূপের কিছু নির্ণায়ক (Criteria) থাকে। এই নির্ণায়কগুলি হল ঃ বিশেষ ধর্মিতা (Typicality), বিদ্যমানতা (Persistence) ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি (Transituationality) এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা (Transpersonality), বিশেষধর্মিতা বলতে বোঝায় কোনো আচরণের অনুসৃত বিশেষরূপ। যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহিত যুগলকে আশীর্বাদ করার রীতি। এক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ উপকরণ দিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদক প্রত্যেক আত্মীয় আত্মীয়া একইভাবে একই উপচারে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে থাকে। এই আচরণ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কালানুক্রমে ঘটে থাকায় আচরণটির বিদ্যমানতা বজায় থাকে। একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ আচরণ অনুসৃত হওয়ায় এর ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি দেখা যায়। আবার, সকল আশীর্বাদক আশীর্বাদ জ্ঞাপনে একই ধরনের আচরণ অনুসরণ করায় এটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। এইভাবে নির্ণায়ক সাপেক্ষে বিভিন্ন আচরণগত বিশেষ রূপ ক্ষেত্র গবেষণায় নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

## ব্যতিক্রমী রূপ (Deviant Case)

সদৃশ বিশেষ রূপ ছাড়াও ব্যতিক্রমী আচরণের নিরিখে আদর্শ ধরনটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ব্যতিক্রমী আচরণ অনুমোদিত হলে আচরণের আদর্শ রূপটি প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ব্যতিক্রমী আচরণ অননুমোদিত হলে আদর্শ রূপ আচরণটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বয়সের উর্ধ্ব-অধো ক্রমে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করাই আদর্শ আচরণ হয়ে থাকে। এই ক্রম না মেনে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করা হলে ঐ আচরণ অসদৃশ হয়, এবং আদর্শ আচরণটি প্রশ্নমূলক হয়। আবার, সর্বক্ষেত্রেই ঐ ক্রম মেনে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলে ঐ আদর্শ আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

### তত্ত্বনির্দেশ (Developing Theories)

ভূমিস্থ তত্ত্ব (Grounded theory) নির্দেশ ক্ষেত্র গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য হয়ে থাকে, ক্ষেত্রস্থ ঘটনা পরম্পরা উল্লেখ করে এক বিশেষ ধরনের সাথে অন্য এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক উল্লেখে তত্ত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে। ব্রাউন (Brown) এবং ক্যান্টার (Canter) একটি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫০টি স্তরের ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। এই ভূমিকা স্তরগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত থেকে বাড়ি কেনা প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়ে থাকে। এই সূত্রে বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত এক তাত্ত্বিক অবধারণার নির্দেশ পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন আচরণগত বিশেষ রূপ সূত্রে ক্ষেত্র গবেষণায় তাত্ত্বিক অবধারণা নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। আদর্শ রূপ বলতে কী বোঝায়?

২। আদর্শ রূপের নির্ণায়কগুলি কী কী?

৩। অসদৃশ আচরণ রূপ কী?

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় তত্ত্বনির্দেশ কীভাবে করা হয়?

## ২.৩.৪ সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা

ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা (Validity) বলতে সংগৃহীত সংবাদের গবেষণা ক্ষেত্রের যথার্থ প্রতিবিম্ব উপস্থাপনের সক্ষমতাকে বোঝায়। এই সিদ্ধতার চারটি দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে—বাস্তুবিন্যাস জনিত সিদ্ধতা (Ecological Validity), স্বাভাবিক বিবরণ (Natural history), সদস্যদের স্বকৃত সিদ্ধকরণ, (Members validation), যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ (Competent insider performance), প্রথম ধরনের সিদ্ধতা বলতে গবেষকের ক্ষেত্রগত প্রতিবেদনের সাথে ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থানের সাদৃশ্যকে বোঝায়। দ্বিতীয় ধরনের সিদ্ধতা বলতে বোঝায় গবেষকের ক্ষেত্রসংক্রান্ত অকপট ও বিশদ প্রতিবেদন অপরের কছে গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হওয়া। তৃতীয় ধরনের সিদ্ধতা হল গবেষকের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট

ক্ষেত্রের সদস্যদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া। চতুর্থ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া গেলে গবেষকের উপযুক্ত বা যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ সমর্থিত হয়, এবং সেক্ষেত্রে প্রতিবেদন সিদ্ধ হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) আভ্যন্তরীন সংগতি (Internal Consistency) এবং বাহ্যিক সংগতি (External Consistency) বিচারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ সংগতি বলতে ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সুষম বিন্যাসকে বোঝায়। অপরপক্ষে বাহ্যিক সংগতি বলতে বোঝায় সংগৃহীত তথ্যাবলী অন্যান্য সূত্রে (মুদ্রিত রচনা, গবেষণামূলক নিবন্ধ ইত্যাদি) প্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা সমর্থিত হওয়া। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্যতা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষক ক্ষেত্রস্থ উত্তরদাতাদের কথার উপর নির্ভরশীল থাকে। এই কথা বা উত্তর সবক্ষেত্রে যথার্থ ও সঠিক হয় না। ভুল সংবাদ দেওয়া, উত্তর না দেওয়া, মিথ্যা বলা ও ধৃষ্টতা হেতু তথ্যাবলী নির্ভরযোগ্য হয় না। এছাড়া ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর হওয়ায় ব্যক্তির প্রতিবেদন ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। এদিক থেকেও ক্ষেত্র গবেষণার তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে। বেকারের মতে ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করা বেশি জটিল হয়ে থাকে (Reliability, however, is more difficult to establish in field studies)।

---

**অনুশীলনী - ৫**

১। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?

২। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা কী কী সূত্রে নির্ধারিত হয়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের বাহ্যিক সংগতি কাকে বলে?

## ২.৩.৫ ক্ষেত্র গবেষণার প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র বিচার

ক্ষেত্র গবেষণা সাধারণত খেলার দল, গ্রাম, পাড়া, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির ন্যায় ছোট গোষ্ঠী বা সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, ঘটনাবলী ইত্যাদির বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Neuman) মতে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ারত গোষ্ঠীর বিবরণ ও বোধের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রুবিন এবং বেবীর (Rubin & Babbie) মতে কোনো জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে মনোভাব, ব্যবহার ইত্যাদির টুকিটাকি এবং সময়ের ব্যবধানে সামাজিক পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে। জন লোফ ল্যান্ডের (John Lof Land) মতে সংস্কৃতি, বিধি ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায়, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং জাতি ব্যবস্থায় বিভিন্ন মর্যাদা সাপেক্ষে ভূমিকা বিশ্লেষণে, এবং মাতা-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি জোড় সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে।

## ২.৪ সারাংশ

সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে কোনো জনগোষ্ঠী, সংস্থা সংগঠন ইত্যাদির অন্তঃগ্রাহী গবেষণা হল ক্ষেত্র গবেষণা। এই গবেষণায় মূলত গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। একটি সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা চালানোর জন্য গবেষককে ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাক অবহিতি নিয়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। অতঃপর ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সদস্যদের জীবনধারায় অংশীদার হয়ে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ সূত্রে মূলত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই তথ্যক্ষেত্রের পরিবেশ, সদস্যদের ভূমিকা গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ লব্ধ ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি সংবাদ মূলত পর্যবেক্ষণের অবসরে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের লিপি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ ছাড়া, তথ্য সংগ্রহের আর এক উপায় হল অসংগঠিত সাক্ষাৎকার। স্বাভাবিক কথোপকথনের সূত্রে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নগুলির উত্তর এই সাক্ষাৎকারে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় অসংগঠিত ও মুক্ত প্রশ্নমালা নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সব তথ্য সাক্ষাৎকার লিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া, ব্যক্তিগত নথি যেমন, চিঠি, আত্মজীবনী, দিনলিপি ইত্যাদি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণার এক অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভূমিস্থ তত্ত্বনির্মাণ। এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলী প্রক্রিয়াকরণ করে কিছু বিশেষ ধরন নির্দেশ করা হয়। এই বিশেষ ধরনগুলি আচরণগত, বৈশিষ্ট্যগত, আচারগত হতে পারে। এই বিশেষ ধরনগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়ে থাকে। তবে, প্রতিবেদনের সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য হয়ে থাকে। প্রতিবেদন ক্ষেত্র সম্পর্কে স্বাভাবিক এবং সংগতিপূর্ণ চিত্রায়ণ করলে এবং ঐ চিত্রায়ণ ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের কাছে গৃহীত হলে তা সিদ্ধ হয়ে থাকে। আবার, ঐ প্রতিবেদন অন্যান্য তথ্যসূত্র দ্বারা সমর্থিত হলে এবং পারস্পরিক বিন্যাসগত ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে।

## ২.৫ অনুশীলনী

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র সম্পর্কে কী ধরনের বিবরণ দেওয়া হয়?

২। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র মনোনয়নে কোন কোন দিকে নজরে রাখতে হয়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য দিকগুলি কী?

৪। ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ কীভাবে সুগম করা যায়?

৫। পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যাবলী নথিভুক্তকরণের বিভিন্ন লিপির পরিচয় দিন।

৬। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৭। ক্ষেত্র পরিত্যাগ প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিক উল্লেখ করুন।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বিচারের দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৯। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হয় কেন?

১০। ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করুন।

## ২.৬ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী -১**

১। ক্ষেত্র গবেষণা হল কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ নির্ভর অন্তঃগ্রাহী গবেষণা।

২। ক্ষেত্র গবেষণার অপর আর এক নাম হল মানব জাতির বিবরণ।

৩। ম্যালিনৌস্কির 'আর্গনাটস্ অফ দ্যা ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক' গবেষণাটি ক্ষেত্র গবেষণার পথ প্রদর্শক হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ২**

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে গবেষণা সংক্রান্ত ক্রিয়া, ঘটনা ঘটে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণার সময়সূচী গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি স্বল্প সময়কালীন হলে গবেষণায় সময় কম লাগে। আবার, সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বিস্তৃত সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় দীর্ঘায়ত হয়।

৩। ক্ষেত্র গবেষণার পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ বলতে কোনো ক্ষেত্রের শীতলতা, উষ্ণতা, গন্ধ, গাছপালা, আসবাব পত্র, সাজ-সজ্জা ইত্যাদিকে বোঝায়।

৪। একে অপরের সাথে পারস্পরিক ভূমিকাগ্রহণকারী মানুষ ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী ভূমিকায় গবেষক নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য গোপন করে ক্ষেত্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে গবেষক নিজের পরিচয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি বলতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে আগাম অবহিতির প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় সাক্ষাৎকার হল একটি স্বাভাবিক কথপোকথন প্রক্রিয়া। এটা অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অন্তঃগ্রাহী হয়ে থাকে।

৪। প্রারম্ভিক পত্র সাক্ষাৎকার লিপির অর্থ জ্ঞাপনে সহায়ক হয়ে থাকে।

৫। কয়েকটি ব্যক্তিগত নথি হল ঃ আত্মজীবনী, চিঠি, দিনলিপি ও পারিবারিক বৃত্তান্ত।

**অনুশীলনী - ৪**

১। আদর্শ রূপ হল সামাজিক ঘটনা, আন্তঃক্রিয়া, রীতি প্রভৃতির সাধারণ রূপ।

২। আদর্শ রূপের নির্ণায়কগুলি হল ঃ বিশেষ ধর্মিতা, বিদ্যমানতা, ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতা।

৩। অসদৃশ্য আচরণ রূপ হল প্রচলিত আচরণ ক্রমের ব্যতিক্রমী রূপ।

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্রস্থ ঘটনা পরম্পরা উল্লেখ করে এক বিশেষ ধরনের সাথে আর এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক উল্লেখে তত্ত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৫**

১। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বলতে সংগৃহীত সংবাদের গবেষণা ক্ষেত্রের যথার্থ চিত্র উপস্থাপনের সক্ষমতাকে বোঝায়।

২। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা আভ্যন্তরীণ সংগতি এবং বাহ্যিক সংগতি সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের বাহ্যিক সংগতি বলতে বোঝায় মুদ্রিত রচনা। গবেষণামূলক নিবন্ধ ইত্যাদি দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সমর্থন।

## সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ক্ষেত্র গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিবরণ গবেষকের বহিস্থ দৃষ্টিভঙ্গীজাত হয় না। এটা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তস্থ দৃষ্টিভঙ্গী জাত হয়ে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র মনোনয়নের যে দিকগুলির প্রতি নজর দিতে হয় তা হল ঃ যথেষ্ট তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা, তথ্যের যথার্থতা, ক্ষেত্র সম্পর্কে অপরিচিতি এবং ক্ষেত্রে প্রবেশের সাধ্যতা।

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণের দিকগুলি হল ঃ সাধারণ পরিবেশ, জনগোষ্ঠী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ ক্রিয়া-কর্ম এবং ইতিহাস।

৪। ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের সাথে সখ্যতা, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থার পরিচয়পত্র এবং ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো মধ্যবর্তী ব্যক্তির সহযোগিতা ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সুগম করে থাকে।

৫। ক্ষেত্র গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী নথিভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন লিপি প্রস্তুত করা হয়—প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপি, সিদ্ধান্ত লিপি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত লিপি। প্রথম লিপিতে পর্যবেক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উত্তরদাতার মুখের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হয়। দ্বিতীয় লিপিতে সংগৃহীত তথ্যাবলী সূত্রে

প্রাপ্ত ধারণা বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় লিপিতে ক্ষেত্র গবেষণার বিভিন্ন স্তরে অনুসৃত পদ্ধতিগত দিক লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৬। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নাবলীর উত্তর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং উত্তর লিপিবদ্ধ করা একই সাথে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। তবে, প্রথম পর্যায়ে উত্তরদাতাদের স্পর্শকাতর প্রশ্ন করা যায় না। যথেষ্ট সখ্যতা স্থাপনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের উত্তর হুবহু নথিভুক্ত করার জন্য অনেকক্ষেত্রে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার উপযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু, উত্তরদানের সবদিক টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা যায় না। তাই সমান্তরাল উপায় হিসাবে সাক্ষাৎকার লিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

৭। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র পরিত্যাগ একটি স্পর্শকাতর পর্যায়। এই পর্যায়ে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে ক্ষেত্রস্থ সদস্যরা মনক্ষুণ্ণ না হয়। এই স্তরে সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি ভোজ দেওয়া যেতে পারে। গবেষণায় সহযোগিতার বিনিময়ে কিছু উপঢৌকন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করতে হয়। এবং সর্বোপরি, সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেওয়া যেতে পারে।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা চারটি দিক থেকে দেখা হয়—বাস্তুবিন্যাস জনিত সিদ্ধতা, স্বাভাবিক বিবরণ, সদস্যদের স্বকৃত সিদ্ধকরণ এবং যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম সিদ্ধতা হল ক্ষেত্রগত প্রতিবেদনের সাথে ক্ষেত্রের প্রকৃত আস্থার সাদৃশ্য থাকা। দ্বিতীয় ধরনের সিদথতা হল গবেষকের ক্ষেত্রগত অকপট ও বিশদ বিবরণ অপরের কাছে গ্রাহ্য হওয়া। তৃতীয় ধরনের সিদ্ধতা হল গবেষকের প্রতিবেদন ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া। চতুর্থ, ক্ষেত্র সম্পর্কে বিশদ ও পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা প্রতিবেদনকে সিদ্ধ করে।

৯। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হওয়ার কিছু কারণ আছে, উত্তরদাতাদের দ্বারা ভুল সংবাদ দেওয়া, উত্তর না দেওয়া, মিথ্যাচার ও ধৃষ্টতা হেতু ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হয়ে থাকে।

১০। খেলার দল, পাড়া ইত্যাদির ন্যায় ছোট গোষ্ঠীর বা সংস্থার বৈশিষ্ট্য, ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো জনগোষ্ঠীর মনোভাব, ব্যবহার, ভূমিকাগত দিক এবং সামাজিক পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

## ২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেকার, থেরিসি, এল ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহীলস সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

২। লরেন্স, নিউম্যান ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস্—কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ানটিটেটিভ এ্যাপ্রোচ (তৃতীয় সংস্করণ) অ্যালিন এন্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৭।

৩। বেইলি, কে. ডি ঃ মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) ফ্রি প্রেস নিউইয়র্ক, ১৮৮৭।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা ২০০২।

# একক ৩ ❑ পরিসংখ্যা বণ্টন ও লেখচিত্রগঠন কৌশল

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ উপাত্ত গোষ্ঠীবন্ধকরণ

৩.৩.১ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক শতাংশ বণ্টন

৩.৪ লেখচিত্র প্রক্রিয়া

৩.৪.১ পরিসংখ্যা লেখচিত্রের বিভিন্ন রূপ

৩.৪.২ অন্যান্য লেখচিত্র

৩.৪.৩ পরিমাপের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র

৩.৪.৪ লেখচিত্রের অপব্যবহার

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ উত্তর সংকেত

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

উপাত্ত গোষ্ঠীবন্ধকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ

বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্রের গঠন কৌশল

পরিমাপের বিভিন্ন স্তরের সাথে লেখচিত্রের গঠনগত সম্পর্ক

## ৩.২ প্রস্তাবনা

পূর্বে আলোচিত যে কোনো পদ্ধতি প্রয়োগে সংগৃহীত তথ্যাবলী অবিন্যস্ত ও অজ্ঞাপনযোগ্য হয়ে থাকে। এই তথ্যাবলী স্বতোৎসারিত ভাবে কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থবহ করার জন্য তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত, সংক্ষিপ্ত এবং স্বজ্ঞাপক করার দরকার হয়। তথ্যাবলী সুবিন্যস্তকরণের জন্য উপাত্ত গোষ্ঠীবন্ধকরণের কৌশল

অবলম্বন করতে হয়। তথ্য সংক্ষেপায়নে পরিসংখ্যা বণ্টন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। তথ্য স্বজ্ঞাপনে বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এই লেখচিত্রের রূপ তথ্য পরিমাপের স্তরের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এখানে উপাত্ত গোষ্ঠীবন্ধকরণের এবং সংক্ষেপায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তথ্য স্বজ্ঞাপনের প্রক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

## ৩.৩ উপাত্ত গোষ্ঠীবন্ধকরণ

গবেষণায় কোনো লোকের (variate) প্রাপ্তাঙ্ক (Score) বেশি সংখ্যক হলে প্রাপ্তাঙ্কসমূহের গোষ্ঠীবন্ধকরণ করার প্রয়োজন হয়। এই গোষ্ঠীবন্ধকরণে কতকগুলি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। পদক্ষেপগুলি হল ঃ

১। প্রথমে প্রাপ্তাঙ্কসমূহের প্রসার (Range) নির্ণয় করতে হয়। প্রসার নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ (সর্বোচ্চ প্রাপ্তাঙ্ক – সর্বনিম্ন প্রাপ্তাঙ্ক + ১)।

১। অতঃপর গোষ্ঠীসংখ্যা বা শ্রেণী সংখ্যা (Class intervals) নির্ধারণ করতে হয়। শ্রেণী সংখ্যার একটি চলনসই নিয়ম (Rule of Thumb) হল শ্রেণী সংখ্যা ১০ থেকে ১৫'র মধ্যে থাকবে (এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতও আছে)।

৩। শ্রেণী নির্ধারণের সঙ্গে শ্রেণী পরিসর (Class width) নির্ধারণ জরুরী হয়ে থাকে। শ্রেণী পরিসর সংক্রান্ত নিয়ম হল এই পরিসর যথাসম্ভব ছোট হওয়া দরকার। শ্রেণী পরিসর ছোট হলে শ্রেণীর মধ্যম মান শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে থাকে। তবে, শ্রেণী প্রসার অযুগ্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। অযুগ্ম শ্রেণী পরিসরের মধ্যমান সর্বদাই অখণ্ড সংখ্যা হয়ে থাকে। এর সুবিধা হল দশমিক জাত সমীপন বা আসন্নমান সূত্রে গণনাগত ত্রুটি এড়ানো যায়, এবং গণনার শুদ্ধতা বজায় রাখা যায়। তবে, সব শ্রেণীর প্রসার সমান হওয়া দরকার।

৪। শ্রেণীগুলি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কোনো শ্রেণীর দুটি সীমা থাকে—নিম্নসীমা ও উচ্চসীমা। এক শ্রেণীর উচ্চসীমা (Upper limit) পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমা (Lower Limit) হবে না। এক্ষেত্রে পার্থক্য থাকবে, যেমন, প্রথম শ্রেণীর নিম্নসীমা সর্বনিম্ন প্রাপ্তাঙ্ক দিয়ে শুরু করা যায়। এই নিম্নসীমার সাথে শ্রেণী পরিসর সংখ্যা যোগ করে যোগফলকে ১ দ্বারা বিয়োগ করলে ঐ শ্রেণীর উচ্চসীমা পাওয়া যায়। আবার, পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমা হবে পূর্ববর্তী উচ্চসীমা যোগ ১ একক। এইভাবে পর পর শ্রেণীগুলি সন্নিবেশিত করতে হয় সর্বোচ্চ সংখ্যা শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত।

৫। অতঃপর প্রতি শ্রেণীতে কতগুলি প্রাপ্তাঙ্ক আছে তা অর্থাৎ পরিসংখ্যা (Frequency) নির্ণয় করে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি দেখানো যাক। ধরি একটি প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টন হল নিম্নরূপ ঃ

৫১, ৫৫, ৪৩, ৩৪, ৩৬, ৪৫, ৩৫, ৩৩, ৩৯, ৩৫, ৫১, ৪২, ৩৩, ৬১,

৫৯, ৪৭, ৪১, ৩৯, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৯, ৫৭, ৩৩, ৩৫, ৪৭, ৫১, ৩৮,

৩১, ৩৫, ৩৯, ৫৪, ৫৭, ৩৫, ৩৮, ৪৩, ৫৯, ৫০, ৪১, ৫৫, ৩৫, ৩৯,

৪৭, ৫১, ৫৯, ৩২, ৩৯, ৫৯, ৫০, ৪১

এই প্রাপ্তাঙ্কগুলির গোষ্ঠীবন্ধকরণ বা পরিসংখ্যা বণ্টন করা যাক।

এখানে প্রসার (Range) = ৬১–৩১+১= ৩১। এখন শ্রেণী পরিসর যদি ৩ (মোট অযুগ্ম সংখ্যা) নেওয়া হয় তা হলে শ্রেণী সংখ্যা (class intervals) হয় =

$$\frac{\text{প্রসার}}{\text{শ্রেণী পরিসর}} + ১ = \frac{৩১}{৩} + ১ = ১১$$

(প্রসারকে শ্রেণী পরিসর দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্ট কিছু থাকলেই ভাগফলের সাথে ১ যোগ করতে হয়)। এখানে দ্রষ্টব্য, শ্রেণী সংখ্যা ১১ পূর্বে উল্লেখিত ২ নং নিয়মের ১০ এবং ১৫ সংখ্যার মধ্যে থাকে। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণী সংখ্যা ১১ নেওয়া হল। এখন পরিসংখ্যা বণ্টনটি হয় নিম্নরূপ ঃ

পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী - ১

| শ্রেণী | মধ্যমান | খাড়া আঁক | পরিসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৩১-৩৩ | ৩২ | 𝍸 | ৫ |
| ৩৪-৩৬ | ৩৫ | 𝍸 ||| | ৮ |
| ৩৭-৩৯ | ৩৮ | 𝍸 ||| | ৮ |
| ৪০-৪২ | ৪১ | ||||| | ৬ |
| ৪৩-৪৫ | ৪৪ | ||| | ৩ |
| ৪৬-৪৮ | ৪৭ | ||| | ৩ |
| ৪৯-৫১ | ৫০ | 𝍸 || | ৭ |
| ৫২-৫৪ | ৫৩ | | | ১ |
| ৫৫-৫৭ | ৫৬ | |||| | ৪ |
| ৫৮-৬০ | ৫৯ | |||| | ৪ |
| ৬১-৬৩ | ৬২ | | | ১ |
| সমষ্টি (N) | | | ৫০ |

এক্ষেত্রে দেখা যায় সব শ্রেণী মধ্যমান (Midpoint) অখণ্ড সংখ্যা (Integer) হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, মধ্যমান নির্ণয়ের সহজ সূত্র হল ঃ (কোন শ্রেণীর নিম্নসীমা + উচ্চসীমা) ÷ ২। প্রতি শ্রেণীতে প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা প্রথমে খাড়া আঁক (Tally) দ্বারা চিহ্নিত করে তারপর ঐ চিহ্নক্রমে পরিসংখ্যা বসানো হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কোনাকুনি কাটা খাড়া-আঁকের পরিসংখ্যাগত মান হয় ৫। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রকৃত সীমা (Real boundary) নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রতি শ্রেণীর নিম্নসীমা থেকে অর্ধ একক (–.৫) বিয়োগ এবং উচ্চসীমার সাথে অর্ধ একক (.৫) যোগ করলেই প্রকৃত সীমা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রকৃত সীমা হয় ৩০.৫ – ৩৩.৫।

**অনুশীলনী - ১**

১। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রসার কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

২। কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনে শ্রেণী পরিসর কেমন হওয়া দরকার?

৩। কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনে শ্রেণীগুলি কেমন হওয়া দরকার?

৪। মধ্যমান কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

৫। প্রকৃত সীমা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

৬। কোনাকুনি কাটা খাড়া-আঁকের পরিসংখ্যাগত মান কত?

৭। পরিসংখ্যা কী?

## ৩.৩.১ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ও ক্রমযৌগিক শতাংশ বণ্টন

পরিসংখ্যা বন্টন সারণীতে পরিসংখ্যা ছাড়া অনেক সময় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সারণীটিকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (শতাংশ) সারণী বলা যেতে পারে। পূর্বে প্রদর্শিত সারণীতে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (Cumulative frequency) এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ (Cumulative frequency percentage) এই দুটি স্তম্ভ (Column) অন্তর্ভুক্ত করে সারণীটি প্রস্তুত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হল পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা ও প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যার যোগফল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণীর পূর্বে আর কোনো শ্রেণী না থাকায় ঐ শ্রেণীর পরিসংখ্যা '০' ধরে প্রথম শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ধারণ করতে হয় ঃ ০ + ৫ = ৫। এরপর পরবর্তী শ্রেণীগুলির ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হয় যথাক্রমে প্রতি শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা + সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর পরিসংখ্যা। যেমন, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর (৩৪–৩৬) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা) ৫ + (ঐ শ্রেণীর পরিসংখ্যা) ৮ = ১৩। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ (কোন শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা × ১০০) ÷ পরিসংখ্যা সমষ্টি। এক্ষেত্রে, প্রথম শ্রেণী ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ হয় ঃ ৫/৫০ × ১০০ = ১০, এইভাবে প্রতি শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ নির্ণয় করা যায়। এখন পূর্ববর্তী পরিসংখ্যা বণ্টন সারণীতে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ স্তম্ভ দুটি দেখানো হল ঃ

| ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা | ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ |
|---|---|
| ৫ | ১০ |
| ১৩ | ২৬ |
| ২১ | ৪২ |
| ২৭ | ৫৪ |
| ৩০ | ৬০ |
| ৩৩ | ৬৬ |
| ৪০ | ৮০ |
| ৪১ | ৮২ |
| ৪৫ | ৯০ |
| ৫০ | ১০০ |

প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টন অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম (Percentile rank) বা কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। এছাড়া ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (শতাংশ) চিত্র (Ogive) অঙ্কনেও প্রয়োজনীয় হয়।

**অনুশীলনী - ২**

১। প্রথম শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

২। প্রথম শ্রেণী ছাড়া যে কোনো শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

৩। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

৪। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ কোথায় ব্যবহার্য হয়?

## ৩.৪ লেখচিত্র প্রক্রিয়া

সংগৃহীত তথ্যাবলীর পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী অনেকের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষক ও অর্থবহ হয় না। তাই, তথ্যাবলী উপস্থাপনে লেখচিত্রের (Graphs) ব্যবহার অনুসৃত হয়। এই লেখচিত্র চিত্তাকর্ষক এবং সহজেই অর্থবহ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মুয়েলার এবং সুয়েজলার (Mueller & Schuessler) বলেন ঃ লেখচিত্র পরিসংখ্যা বণ্টনের দৃশ্যমানতা দান পূর্বক তার অর্থ এবং সংব্যাখ্যানের তাৎক্ষণিক ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে (The graphs gives visibility to the distribution, and can sequently is mere readily suggestive of its meaning and interpretation) রাশি তথ্যমালা বুঝতে, বিশ্লেষণ

করতে এবং এদের সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করার ক্ষেত্রে লেখচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশল (Technique) হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। লেখচিত্র গঠনে কিছু সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে ঃ

১। লেখচিত্রের জন্য দুটি অক্ষের দরকার হয়। একটি হল অনুভূমিক রেখা/অক্ষ (Horizontal axis/ abscissa) অপরটি হল উল্লম্বী রেখা বা অক্ষ (Vertical axis/ordinate) অনুভূমিক রেখা X-অক্ষ (Axix) এবং উল্লম্বী রেখা Y-অক্ষ (Y-Axis) রূপে পরিচিত হয়। এই দুটি রেখা একে অপরের সাথে ৯০° কোণে সংযুক্ত থাকে। ঐ সংযুক্তি বিন্দু (Point of origin) ‘0’ বিন্দু বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

২। অনুভূমিক অক্ষের দৈর্ঘ্যের সাথে উল্লম্বী দৈর্ঘ্যের অনুপাত হবে ৪ ঃ ৩।

৩। বীজগাণিতিক নিয়মে লেখচিত্রে ধনাত্মক (+) এবং ঋণাত্মক (–) দিক থাকে। মূলবিন্দুর (O) দক্ষিণদিক হয় X-ধনাত্মক এবং বামদিক হয় X-ঋণাত্মক। আবার, মূল বিন্দুর ওপরের দিক হল Y-ধনাত্মক এবং নীচের দিক হল Y-ঋণাত্মক।

গুণবাচক (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) তথ্য ভেদে বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী - ৩**

১। লেখচিত্রের দুটি অক্ষের নাম কী?

২। লেখচিত্রের দুই অক্ষের আনুপাতিক নিয়মটি কী?

৩। লেখচিত্রের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করুন।

---

## ৩.৪.১ পরিসংখ্যা লেখচিত্রের বিভিন্ন রূপ

সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় যে সব লেখচিত্র সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি হল স্তম্ভচিত্র (Bar graph), আয়তলেখ (Histogram), পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা লেখচিত্র (Ogive)।

**স্তম্ভচিত্র ঃ**

স্তম্ভচিত্রে গুণবাচক বর্গের পরিসংখ্যার সমানুপাতিক ভাবে একাধিক স্তম্ভ বিচ্ছিন্নভাবে ভূমির ওপর (X-Axis) অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এই স্তম্ভগুলি একে অপরের সাথে সমদূরত্বে এবং সমপ্রশস্তে অঙ্কিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনুভূমিক অক্ষে কোনো পরিমাপক (Scale) থাকে না। কিন্তু, উল্লম্বী অক্ষে বর্গের পরিসংখ্যা মাপক মাপনী (Scale) থাকে। একটি পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী থেকে স্তম্ভ চিত্র অঙ্কন করে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

কোনো একটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা হল নিম্নরূপ ঃ

| শ্রেণী | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম | অষ্টম | সমষ্টি |
|---|---|---|---|---|---|
| ছাত্রসংখ্যা | ১৫০ | ১২০ | ৮০ | ৫০ | ৪০০ |

এই পরিসংখ্যা বণ্টনটির স্তম্ভ চিত্র অঙ্কন করতে হলে প্রথমে ছক কাগজে দুটি অক্ষ অঙ্কন করতে হবে। ভূমিতে (Abscissa) শ্রেণী এবং উল্লম্বী অক্ষে (Ordinate) ছাত্রসংখ্যা দেখাতে হবে। এখন শ্রেণী সংখ্যা চারটি (৪) হওয়ায় ছক কাগজে চারটি কক্ষ দেখাতে হবে, এছাড়া, পরিসংখ্যার সর্বোচ্চমান ১৫০ হওয়ায় Y-অক্ষে ১৫০ দেখাতে হবে। X-অক্ষ এবং Y-অক্ষ অঙ্কনের ক্ষেত্রে ছক কাগজে প্রাপ্তব্য ক্ষেত্র মাথায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি হল স্তম্ভ চিত্রের ওপরে চিত্র পরিচায়ক একটি শিরোনাম (Title) দিতে হবে, চিত্রের নীচের দিকে শ্রেণীর নাম লেখার জায়গা রাখতে হবে, চিত্রের বাম দিকে Y-অক্ষের পরিমাপক (Scale) লিখতে হবে, চিত্রের ডানদিকে প্রান্তছাড় দিতে হবে, এছাড়া, চিত্রের দক্ষিণ পূর্ব দিকে একটি নির্দেশক কক্ষ (Reference Box) দিতে হবে।

চিত্র নং — ১

পঞ্চম - অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের পরিসংখ্যা প্রদর্শক স্তম্ভচিত্র

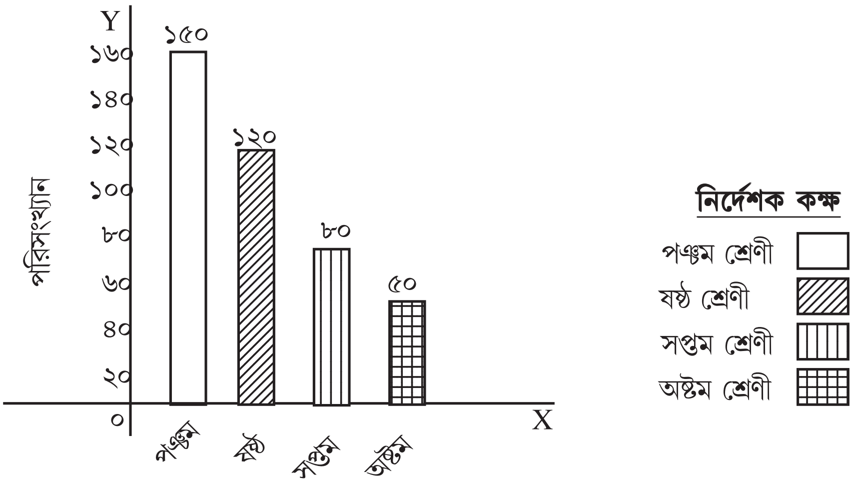


Y-অক্ষ ঃ একটি ক্ষুদ্র বর্গ ক্ষেত্র = ২ একক

এখানে চিত্রটি আঁকার জন্য ১ সেন্টিমিটারের ৯টি ঘর নেওয়া হল চারটি শ্রেণী এবং শ্রেণী ছাড় দেখানোর জন্য (X-অক্ষ)। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা ১৫০ দেখানোর জন্য Y-অক্ষে ১ সেন্টিমিটারের ২টি ঘর নেওয়া হল। প্রতি সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্র ১০ মিলিমিটারে বিভক্ত থাকে। ঐ ১০ মিলিমিটার প্রতি ২০ একক পরিসংখ্যা দেখানো হল। এখন প্রতি শ্রেণীর পরিসংখ্যার অবস্থান Y-অক্ষ সাপেক্ষে নির্ধারণ করে চারটি স্তম্ভ অঙ্কন করা হল। বোঝার সুবিধার্থে প্রতি স্তম্ভের মাথায় পরিসংখ্যা উল্লেখ করা হল। এছাড়া, প্রতিস্তম্ভকে আলাদা শ্রেণী নির্দেশক হিসাবে দেখানোর জন্য বিভিন্ন নকশায় পূরণ করা হল। নির্দেশক কক্ষ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি স্তম্ভের সংকেত উল্লেখ করা হল। এই চিত্রের স্তম্ভগুলির পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন রঙ দ্বারাও ভরা যেতে পারে। এই রূপ স্তম্ভ চিত্রে এক বর্গের

(শ্রেণী) সাথে অন্যান্য বর্গের (শ্রেণীর) তুলনা করা যায়। এছাড়া, বহুস্তম্ভ চিত্র (Poly bar) অঙ্কন করে দুই বা ততোধিক বর্গের সাথে অপর বর্গ গোষ্ঠীর তুলনা করা যেতে পারে। যেমন, কোনো এক বছরের ধান, গম ও পাট উৎপাদনের সাথে অন্য কোনো বছরের ধান, গম ও পাট উৎপাদনের (পরিমাণ) তুলনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, দুই বছরের স্তম্ভের মধ্যে একটা ফাঁক রাখতে হয় ভিন্নতা প্রদর্শনের জন্য।

আয়ত লেখ ও পরিসংখ্যা বহুভুজ ঃ

পরিমাণ বাচক অবিচ্ছিন্ন চলের উপাত্তসমূহের (Data) পরিসংখ্যা বণ্টন আয়ত লেখ ও পরিসংখ্যা বহুভুজ দ্বারা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। আয়ত লেখ (Histogram) স্তম্ভ চিত্র সদৃশ দেখতে হলেও মূলগত পার্থক্য থাকে। স্তম্ভ চিত্রে স্তম্ভগুলি একে অপর থেকে পৃথক হয়, কিন্তু আয়ত লেখতে স্তম্ভগুলি (Bar) একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত থাকে। এক্ষেত্রে X-অক্ষেও একটি পরিমাপক অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটি অক্ষই পরিমাপক অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে Y-অক্ষের দৈর্ঘ্য X-অক্ষের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রেণী সংখ্যা এবং শ্রেণী পরিসর সাপেক্ষে ছক কাগজে X-অক্ষ অঙ্কন করতে হয়। তারপর, X-অক্ষ অনুপাত Y-অক্ষ = ৪ ঃ ৩ এই নিয়মে Y-অক্ষ গঠন করতে হয়। অতঃপর X-অক্ষে শ্রেণী এবং Y-অক্ষে পরিসংখ্যা বিন্যাস করে প্রতি শ্রেণীর পরিসংখ্যা অনুযায়ী ঐ শ্রেণীর আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করতে হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রতি আয়তক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর দুই সীমার ওপর অঙ্কিত হয়। এই সূত্রে আয়তক্ষেত্রগুলি একে অপরের লাগোয়া হয়ে আয়ত লেখটি গঠিত হয়ে থাকে। এখন, একটি পরিসংখ্যা বণ্টন থেকে আয়ত লেখ অঙ্কন করা যাক।

পরিসংখ্যা বণ্টনটি হল নিম্নরূপ ঃ

## সারণী—৩

| শ্রেণী | ১০-১৯ | ২০-২৯ | ৩০-৩৯ | ৪০-৪৯ | ৫০-৫৯ | ৬০-৬৯ | ৭০-৭৯ | ৮০-৮৯ | ৯০-৯৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিসংখ্যা | ৩ | ২ | ৬ | ১১ | ১২ | ৬ | ৫ | ৪ | ২ |

এক্ষেত্রে শ্রেণী সংখ্যা হয় ৯ এবং শ্রেণী পরিসর হয় ১০, অতএব X-অক্ষে কমপক্ষে ৯ × ১০ = ৯০টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র দরকার। এছাড়া, প্রথম শ্রেণীর আগে এবং শেষ শ্রেণীর পরে একটু ফাঁক রাখার জন্য কিছু জায়গা চাই। এই হিসাবে ৯০ + ১০ + ১০ = ১১০টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নিয়ে X-অক্ষ অঙ্কন করা হল। প্রতি শ্রেণীসীমা নির্দিষ্ট করা হল। শ্রেণীগুলি লাগোয়া করার জন্য প্রতি শ্রেণীর উচ্চসীমাকে পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমার সমান করা হল। এই প্রক্রিয়ায় দশমিক জাত ভ্রম ও অসুবিধা দূর করা যায়। এখন X-অক্ষের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৯০ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র হওয়ায় ৪ ঃ ৩ অনুপাতে Y-অক্ষের দৈর্ঘ্য হয় = ৯০ × ৩/৪ = ৬৭.৫ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র। কিন্তু সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা (Frequency) ১২ হওয়ায় ৬৫.৫ এর কাছাকাছি ১২'র গুণিতক ৬০-কে গ্রহণ করে Y-অক্ষের দৈর্ঘ্য ৬০ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নেওয়া হল। এখন উল্লিখিত নিয়মে আয়ত লেখটি অঙ্কন করা হল।

চিত্র-২

প্রদত্ত পরিসংখ্যা বণ্টনের আয়তলেখ

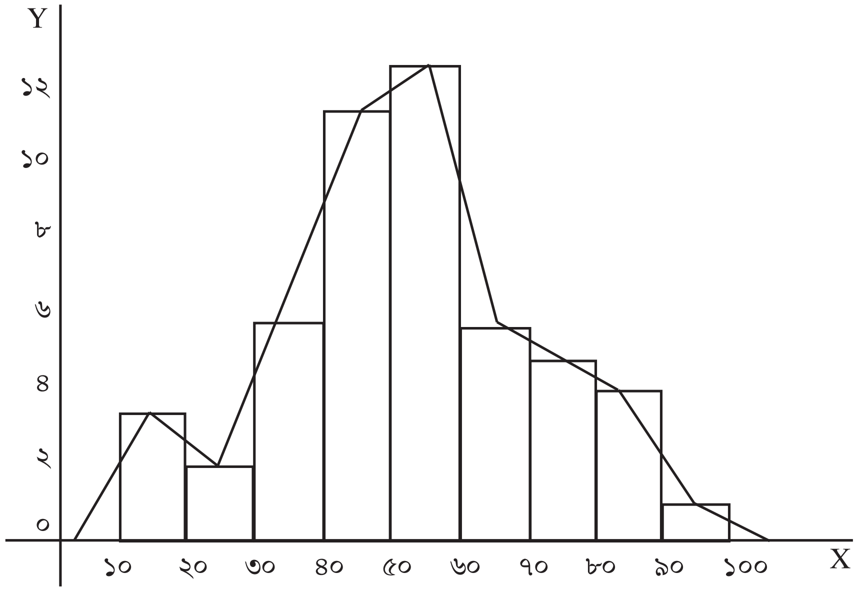


X — অক্ষ ঃ ১ একক = ১ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র

Y — অক্ষ ঃ ১ একক = ৫ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র

---

এই চিত্রে দুটি অক্ষে দুটি পরিমাপক পরিদৃষ্ট হয়। এই চিত্রের ওপর পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) অঙ্কন করা যায়। এ উদ্দেশ্যে প্রতি আয়তক্ষেত্রের শীর্ষ মধ্য বিন্দু (Mid Point) নির্দিষ্ট করে একটি স্কেল দিয়ে এক বিন্দুর সাথে অপর বিন্দু ক্রমশ যুক্ত করলেই উদ্দিষ্ট চিত্রটি পাওয়া যায়। আয়ত লেখ'র ওপর এই প্রক্রিয়ায় পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয়েছে। তবে, আয়ত লেখ অঙ্কন না করে সরাসরি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতি শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঐ শ্রেণীর মধ্য বিন্দুর ওপর চিহ্নিত করে পরিসংখ্যাগত অবস্থান নির্দেশক বিন্দুগুলি একে অপরের সাথে ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত করলে পরিসংখ্যা বহুভুজটি অঙ্কিত হয়ে থাকে। পরিসংখ্যা বহুভুজ সরাসরি অঙ্কন করলে বহুভুজটি অনুভূমিক রেখার সাথে বন্ধ হলে দেখতে ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে বহুভুজ প্রকৃত শ্রেণীর বা প্রদত্ত শ্রেণীর পূর্ব এবং পরবর্তী শ্রেণীর মধ্যবিন্দুতে ছেদ করে। দুই সমান নমুনার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনা করার জন্য এই চিত্র কার্যকরী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এক পরিসংখ্যা বহুভুজের ওপর আর এক পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করে দুই চিত্রের মধ্যে তুলনা করা হয়।

ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা লেখচিত্র ঃ

পরিমাণ বাচক অবিচ্ছিন্ন উপাত্ত লেখচিত্র দ্বারা প্রদর্শন করার আর এক উপযোগী প্রক্রিয়া হল ক্রম যৌগিক পরিসংখ্যা লেখচিত্র গঠন। আয়ত লেখ বা পরিসংখ্যা বহুভুজ গঠন প্রক্রিয়ার সাথে এই চিত্র গঠনের পার্থক্য থাকে। X-অক্ষ গঠন একই ধরনের হলেও Y-অক্ষ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে Y-অক্ষ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বা ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ অনুসারে গঠন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, আর এক বিশেষ পার্থক্য হল এই চিত্রে প্রতি শ্রেণীর উচ্চসীমায় ঐ শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) গত অবস্থান বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অতঃপর ঐ বিন্দুগুলি একে অপরের সাথে ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত করে উদ্দিষ্ট চিত্রটি গঠন করা হয়। পূর্বে প্রদর্শিত পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী-১ থেকে এই চিত্রটি অঙ্কন করা হল।

চিত্র নং—৩

ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্র

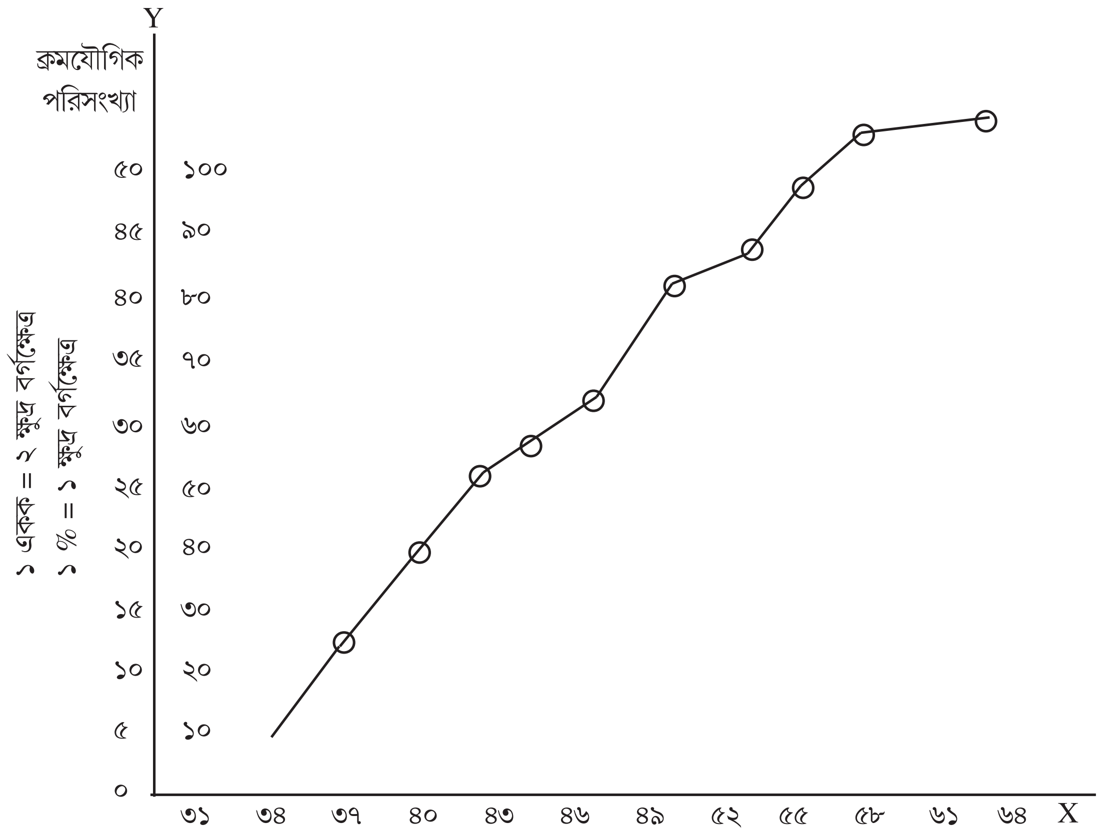


১ একক = ৪ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র

এই পরিসংখ্যা বণ্টন সারণীতে শ্রেণী সংখ্যা থাকে ১১। এবং ১১ এবং শ্রেণী পরিসর থাকে ৩, অতএব ১১ × ৩ = ৩৩টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নিয়ে X-অক্ষ দেখানো যায়। কিন্তু, সেক্ষেত্রে চিত্রটি অতি ক্ষুদ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতিক্ষুদ্র চিত্র দেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা জনক হয়। এছাড়া, ছক কাগজে যথেষ্ট জায়গা থাকায় ঘর সংখ্যা চার গুণ বাড়িয়ে ৩৩ × ৪ = ১৩২ নেওয়া হল। এছাড়া, প্রথমে এবং শেষে কিছু ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নেওয়া হল। এছাড়া, প্রথমে এবং শেষে কিছু ক্ষুদ্র বর্গ ক্ষেত্র নেওয়া হল। এক্ষণে ৪ ঃ ৩ নিয়মে Y-অক্ষ দৈর্ঘ্য হল ১৩২ × ৩/৪ = ৯৯টি ক্ষুদ্র বর্গ ক্ষেত্রে। কিন্তু, সর্বোচ্চ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ৫০ হওয়া এবং সর্বোচ্চ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ ১০০ হওয়ায় ৯৯ এর সাথে আর ১টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নিয়ে মোট ১০০টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র নেওয়া হল। এর ফলে ১ একক ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ২টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র দিয়ে দেখানো হল, এবং ১ একক ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ ১টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র দ্বারা দেখানো হল। Y-অক্ষে শ্রেণী পরিসরের নির্ণয় করে বৃত্তে প্রদর্শন করতে হয়। তবে প্রতি বৃত্তাংশে শতাংশ মান দেখানো হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রতি বৃত্তাংশকে আলাদা ভাবে দেখানোর জন্য রঙ বা নকশা দ্বারা ভরা হয়ে থাকে। এখন পূর্বে প্রদত্ত ২ নং সারণী থেকে বৃত্ত চিত্র অঙ্কন করে দেখানো হল।

ঐ সারণীতে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যার শতাংশ ও কৌণিক মান হয় নিম্নরূপ ঃ

| শ্রেণী | ছাত্রসংখ্যা | শতাংশ | কৌণিক মান |
|---|---|---|---|
| পঞ্চম | ১৫০ | ৩৭.৫ | ১৩৫° |
| ষষ্ঠ | ১২০ | ৩০.০ | ১০৮° |
| সপ্তম | ৮০ | ২০.০ | ৭২° |
| অষ্টম | ৫০ | ১২.৫ | ৪৫° |
| সমষ্টি | ৪০০ | ১০০.০ | ৩৬০° |

$$* \text{ শতাংশ} = \frac{\text{ছাত্র সংখ্যা } \times (((}{\text{সমষ্টি}}$$

** কৌণিক মান = শতাংশ বা, শতাংশ ৩.৬°

এখন পেনসিল কম্পাস দিয়ে একটা বৃত্ত অঙ্কন করে, চাঁদার সাহায্যে বৃত্তের মধ্যে উল্লিখিত কৌণিক ক্ষেত্রগুলি দেখানো হল।

**চিত্র নং—৪**

ছাত্রসংখ্যার বৃত্ত চিত্র — নির্দেশ কক্ষ

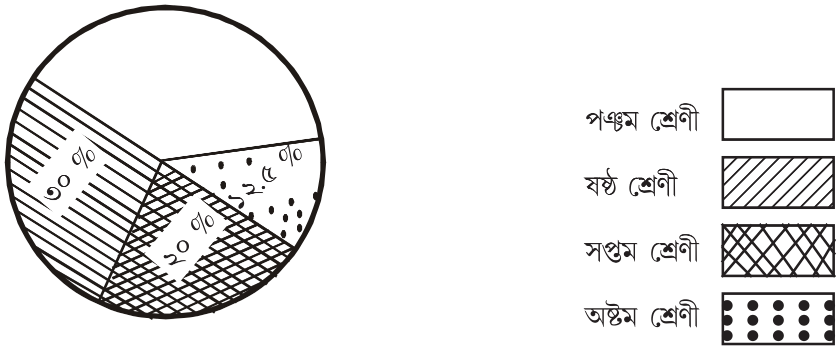


প্রতি কৌণিক ক্ষেত্রের শতাংশ মান দেখানো হয়েছে, এবং বিভিন্ন নকশার সাহায্যে প্রতি কৌণিক ক্ষেত্রকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, প্রতি নকশার অর্থবোধক নির্দেশ কক্ষ দেওয়া হয়েছে বৃত্ত চিত্রটি অতি সহজবোধ্য করার জন্য।

## প্রবণতা চিত্র ঃ

কোনো গুণবাচক বর্গের নির্দিষ্ট কালগত (Periodic) পরসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্ক বিন্যাস থেকে ঐ বর্গের একটি দিক নির্দেশ করার ক্ষেত্রে প্রবণতা চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। যেমন, পাঁচ বৎসরব্যাপী জাতীয় আয়ের পরিমাণ, দশ বৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মৎস্য চাষ, কৃষি উৎপাদন, অপরাধ সংঘটন ইত্যাদির প্রবণতা নির্দেশের জন্য এই চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে X-অক্ষে সময়কাল সন্নিবেশ করতে হয়, এবং Y-অক্ষে ১ একক ৪টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র দ্বারা দেখানো হল। অতঃপর প্রতি শ্রেণীর উচ্চসীমায় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) অনুযায়ী বিন্দু স্থাপন করা হল, এবং বিন্দুগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে উদ্দিষ্ট লেখচিত্রটি অঙ্কন করা হল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, Y-অক্ষের বামদিকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ডানদিকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ দেখানো হলেও, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ অনেক সময় X-বিন্দুর ওপর একটি লম্ব (Y-অক্ষের সমান্তরাল) টেনে ঐ রেখায় দেখানো হয়ে থাকে। এই চিত্র আকারগত দিক থেকে "S" এর মতো হওয়ায় S-চিত্র বা অজিভ (Ogive) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ অনুসারে গঠিত হলে এই চিত্র থেকে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম (Percentile rank) এবং কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক (Score) নির্দেশ করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, নিম্নসীমার ওপরেও এই চিত্র অঙ্কন করা যায়, সেক্ষেত্রে চিত্রটি দক্ষিণ পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে থাকে। তবে চিত্রদ্বয় সদৃশ হয় এবং একটা সংবাদ বহন করে থাকে। কার্যত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চসীমার ওপরেই এই চিত্রঅঙ্কন করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৪**

১। স্তম্ভচিত্র কী?

২। আয়ত লেখ কাকে বলে?

৩। আয়ত লেখ এবং পরিসংখ্যা বহুভুজের মধ্যে অঙ্কনগত পার্থক্য কী?

৪। পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনে কী সুবিধা পাওয়া যায়?

৫। আয়ত লেখ ও পরিসংখ্যা বহুভুজ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্রের মূল পার্থক্য কী?

৬। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ চিত্রের উপযোগিতা কী?

৭। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা লেখচিত্র অজিভ (Ogive) নামে পরিচিত থাকে কেন?

## ৩.৪.২ অন্যান্য লেখচিত্র

ওপরে আলোচিত লেখচিত্র ছাড়া আর যে লেখ চিত্রাবলীর ব্যবহার দেখা যায় সেগুলি হল বৃত্ত চিত্র (Pie chart) এবং প্রবণতা চিত্র (Trend chart)।

**বৃত্ত চিত্র ঃ**

গুণবাচক চলের বিভিন্ন বর্গের পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্কের আপেক্ষিক অবস্থান দেখানোর জন্য বৃত্ত চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ নির্ণয় করতে হয়। অতঃপর শতাংশকে বৃত্তের ৩৬০° কোণের সমানুপাতে দেখানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১০০%-কে ৩৬০° ধরে বিভিন্ন বর্গের শতাংশের কৌণিক মান পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্ক প্রদর্শন করতে হয়। অতঃপর প্রতি বর্গের পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্ক অনুযায়ী ঐ বর্গের অবস্থানে বিন্দু বসাতে হয়। এইভাবে প্রতি বর্গের পরিসংখ্যান গত বিন্দু স্থাপন করে বিন্দুগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত করলে উদ্দিষ্ট প্রবণতা চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। এখন একটি তথ্য সারণী থেকে প্রবণতা চিত্র অঙ্কন করে দেখানো হল।

**সারণী নং—৪**

৮টি বৎসরের কর্ম বিরতি সারণী

| বৎসর | কর্ম বিরতি সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৫০ | ৪২৪ |
| ১৯৫৫ | ৩৬৩ |
| ১৯৬০ | ২২২ |
| ১৯৬৫ | ২৬৮ |
| ১৯৭০ | ৩৮১ |
| ১৯৭৫ | ২৩৫ |
| ১৯৮০ | ১৮৭ |
| ১৯৮৫ | ৫৪ |

এক্ষেত্রে X-অক্ষে সমদূরত্বে উল্লিখিত ৮টি বৎসর দেখানো হল এবং Y অক্ষে কর্ম বিরতির সর্বোচ্চ সংখ্যা দেখানো হল। অতঃপর প্রতি বৎসরের কর্মবিরতি সংখ্যা অনুযায়ী বিন্দু স্থাপন করে বিন্দুগুলি সংযুক্ত করে উদ্দিষ্ট প্রবণতা চিত্রটি অঙ্কন করা হল।

**চিত্র নং — ৪**

**কর্মবিরতির প্রবণতা লেখচিত্র**

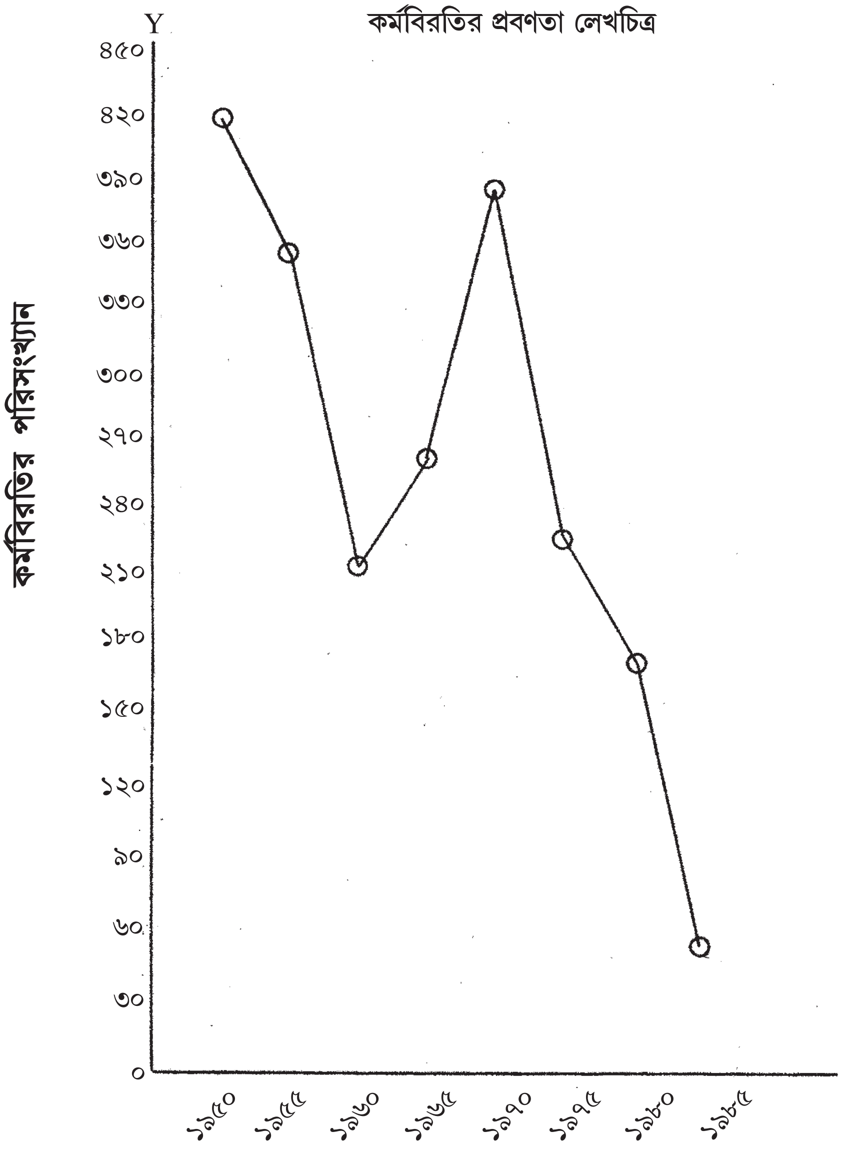


**Y-অক্ষ ঃ ১ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র = ৩ একক**

এই চিত্রে X-অক্ষে প্রতি বৎসরকে ১০টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। Y-অক্ষের প্রতি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের মাধ্যমে ৩ একক কর্মবিরতি দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫০ সাল থেকে কমতে শুরু করে ১৯৬০ সাল থেকে কর্মবিরতি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে আবার ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নিম্নমুখী হয়ে থাকে। সুতরাং কর্মবিরতির উত্থান পতন দেখা যাচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। তবে, সময়কালীন তুলনা করার ক্ষেত্রে এই চিত্রের বিশেষ ভূমিকা থাকে।

**অনুশীলনী - ৫**

১। বৃত্ত চিত্রে কৌণিক মান নির্ণয়ের সূত্র কী?

২। বৃত্ত চিত্র অঙ্কন করতে হলে কী কী জ্যামিতিক উপাদান (Instrument) প্রয়োজন হয়?

৩। প্রবণতা চিত্র কখন অঙ্কন করা হয়?

## ৩.৪.৩ পরিমাপের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র

বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিমাপ। পর্যবেক্ষিত ঘটনা তা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই পরিমাপ গুণবাচক (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) হয়ে থাকে। গুণবাচক পরিমাপ বলতে বোঝায় বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্গীকরণ (Categorization) এবং পরিমাণ গত পরিমাপ বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষিত বৈশিষ্ট্যের ওপর সংখ্যা আরোপন। এই পরিমাপ বিভিন্ন পরিমাপক (Scale) দ্বারা করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে চারটি পরিমাপকের উল্লেখ করা হয়ে থাকে— নামিক পরিমাপক (Nominal Scale), ক্রমনির্দেশক পরিমাপক (Ordinal Scale), সম প্রসারী পরিমাপক (Interval Scale) এবং সমানুপাতিক পরিমাপক (Ratio Scale)।

নামিক পরিমাপকের দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য বর্গীকরণ করা হয়ে থাকে। এই বর্গগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একে অপর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। শিক্ষা, ধর্ম, লিঙ্গ, আবাসস্থল প্রভৃতি ভেদে ব্যক্তির বর্গ ভেদ এবং পরিমাপের উদাহরণ।

ক্রম নির্দেশক পরিমাপকের দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাকে বৈশিষ্ট্য বিচারে ঊর্ধ্ব অধঃ ক্রমে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন, বিত্তশীলতার বিচারে ব্যক্তিদের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ক্রমে শ্রেণী বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর তুলনা করা যায়। সমপ্রসারী পরিমাপকে পরিমাণগত অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সমান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। এই পরিমাপক শুরু হয় একটি '০' (Zero), থেকে, যদিও এটি কোনো প্রকৃত মান হয় না। এই পরিমাপকের দ্বারা একে অপরের থেকে কত বেশি বা কম তা নির্ধারণ করা যায়। যেমন, ফারেনহাইট থার্মোমিটার ব্যবহারে উষ্ণতা হ্রাস বৃদ্ধি নির্দেশ করা যায়।

সমানুপাতিক পরিমাপক প্রকৃত শূন্য (০) দিয়ে শুরু হয়, এবং বাকীটা সমপ্রসারী পরিমাপকের ন্যায় হয়ে থাকে। এই পরিমাপক দিয়ে আয়, ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি মাপা যায়। এক্ষেত্রে একজন অপর জনের কত গুণ বেশি ভারী, কত গুণ বেশি রোজগারী ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। তথ্যাবলীর পরিমাপগত স্তর অনুযায়ী পরিসংখ্যান পদ্ধতির

প্রয়োগ নির্ধারিত হয়ে থাকে। লেখচিত্র পদ্ধতি প্রয়োগ ও উল্লিখিত পরিমাপক স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। নামিক এবং ক্রমনির্দেশক পরিমাপক অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্তম্ভ চিত্র, প্রবণতা চিত্র এবং বৃত্ত চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। আবার, সমপ্রসারী ও সমানুপাতিক পরিমাপকে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী প্রদর্শনে আয়ত লেখ পরিসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ অঙ্কন করা হয়ে থাকে। অতএব, লেখচিত্র অঙ্কনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর পরিমাপকগতদিক বিবেচ্য হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী - ৬**

১। গুণ বাচক পরিমাপ কাকে বলে?

২। পরিমাণ গত পরিমাপ কাকে বলে?

৩। স্তম্ভ চিত্র ও বৃত্ত চিত্র কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়?

৪। আয়ত লেখ এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ কোন ক্ষেত্রে অঙ্কন করা হয়?

---

## ৩.৪.৪ লেখ চিত্রের অপব্যবহার

লেখ চিত্রাবলী সংগৃহীত সংখ্যাত্মক তথ্যকে সহজে অর্থবহ এবং স্বজ্ঞাপক (Self expressive) করার সহায়ক হলেও, কিছু ক্ষেত্রে তথ্যাবলীর বিকৃত অর্থ প্রদর্শনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিকৃতি বা অপ ব্যবহার মূলত দুই সূত্রে ঘটে থাকে।

১। Y-অক্ষে ০ অবস্থান না দেখিয়ে চিত্রটির প্রকৃত উর্ধ্ববিস্তার ছোট করে দেখানো হয়ে থাকে। এর ফলে, প্রতিবেদিত ঘটনার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। সাধারণ মানুষকে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষকেও এই প্রক্রিয়ায় ঠকানো হয়ে থাকে।

২। ৪ ঃ ৩ নিয়ম না অনুসরণ করেও তথ্যের অর্থ বিকৃতি ঘটানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও Y-অক্ষকে X-অক্ষ থেকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিকৃতি ঘটানো হয়ে থাকে। যেমন, বয়স্ক শিক্ষার হারকে বেশি করে দেখানোর জন্য Y-অক্ষকে বাড়িয়ে দিয়ে লেখচিত্রের উচ্চতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার, অপরাধমূলক ঘটনার হার কমিয়ে দেখানোর জন্য Y-অক্ষকে ছোট করে অপরাধ সংক্রান্ত লেখ চিত্রের উচ্চতা ছোট করে দেখানো হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী - ৭**

১। লেখ চিত্রের Y-অক্ষে ০ উল্লেখ না করলে কী ফল হয়?

২। ৪ ঃ ৩ নিয়ম অনুসরণ না করে কীভাবে তথ্য বিকৃতি ঘটানো হয়ে তাকে।

৩। লেখ চিত্র দর্শনে সতর্কতা অবলম্বনের দিকগুলি কী?

## ৩.৫ সারাংশ

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী অর্থবহ করার জন্য তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত এবং স্বজ্ঞাপক করার দরকার হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তথ্যাবলীর গোষ্ঠীবদ্ধকরণ করা হয়ে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় তথ্যাবলীকে পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী ইত্যাদিতে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু, সংখ্যা নির্ভর সারণী সহজবোধ্য হয় না। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে সারণী দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। তাই, তথ্যাবলীকে সহজবোধ্য ও স্বজ্ঞাপক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। তথ্যাবলী পরিমাপকের স্তর অনুযায়ী এই লেখ চিত্র অঙ্কন করা হয়। নামিক এবং ক্রমনির্দেশক পরিমাপক দ্বারা পরিমেয় তথ্যাবলী প্রদর্শনের জন্য স্তম্ভচিত্র, প্রবণতা চিত্র ও বৃত্তচিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। আবার, সমপ্রসারী ও আনুপাতিক পরিমাপক দ্বারা পরিমেয় তথ্যাবলী প্রদর্শনের জন্য আয়ত লেখ, পরিসংখ্যা বহুভুজ ও অজিভ অঙ্কন করা হয়ে থাকে। তবে, লেখ চিত্র দ্বারা অনেক সময় তথ্যের অপলাপ বা প্রবঞ্চনা করা হয়ে থাকে। লেখ চিত্র গঠনে '৪ ঃ ৩ নিয়ম' না মেনে এবং Y-অক্ষে '০' অবস্থান না দেখিয়ে লেখ চিত্রের অপব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## ৩.৬ অনুশীলনী

১। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে শ্রেণী পরিসর দ্বারা কীভাবে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করা হয়?

২। লেখ চিত্র অঙ্কনের উপযোগিতা কী?

৩। স্তম্ভচিত্র ও আয়ত লেখ'র মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। নামিক ও ক্রম নির্দেশক পরিমাপকের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করুন।

৫। সম প্রসারী ও সমানুপাতিক পরিমাপকের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করুন।

৬। ৩নং সারণী থেকে সরাসরি বহুভুজ অঙ্কন করুন।

## ৩.৭ উত্তর সংকেত

১। প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তাঙ্কের থেকে সর্বনিম্ন প্রাপ্তাঙ্ক বিয়োগ করে, বিয়োগ ফলের সাথে ১ যোগ করে প্রসার নির্ণয় করা হয়।

২। কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনের শ্রেণী পরিসর অযুগ্ম এবং ছোট সংখ্যা হওয়া দরকার।

৩। কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনের শ্রেণীগুলি একে অপরের থেকে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার। অর্থাৎ, কোনো এক শ্রেণীর উচ্চসীমা ও পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমার মধ্যে পার্থক্য থাকা দরকার।

৪। কোনো শ্রেণীর উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার যোগফলকে ২ দ্বারা ভাগ করলে ঐ শ্রেণীর মধ্যমান পাওয়া যায়।

৫। কোনো শ্রেণীর নিম্নসীমার থেকে .৫ একক বিয়োগ করে এবং উচ্চসীমার সাথে .৫ একক যোগ করলে ঐ শ্রেণীর প্রকৃত সীমা পাওয়া যায়।

৬। কোনাকুনি কাটা খাড়া আঁকের পরিসংখ্যাগত মান হয় ৫।

৭। কোনো শ্রেণীতে প্রাপ্তাঙ্কের মোট সংখ্যা হল ঐ শ্রেণীর পরিসংখ্যা।

---

**অনুশীলনী — ২**

১। প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যাই ঐ শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা।

২। পূর্ব শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর পরিসংখ্যা যোগ করলে ঐ শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

৩। কোনো শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাকে পরিসংখ্যা সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ করলে ঐ শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ নির্ণীত হয়।

৪। কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম এবং কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়ে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা শতাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী — ৩**

১। লেখ চিত্রের দুটি অক্ষের নাম অনুভূমিক অক্ষ ও উল্লম্বী অক্ষ।

২। লেখ চিত্রের অনুভূমিক অক্ষের সাথে উল্লম্বী অক্ষের অনুপাত হল ৪ ঃ ৩।

৩। লেখ চিত্রে '০' অবস্থানের ডানদিক হল X-অক্ষের ধনাত্মক এবং বামদিক হল ঋণাত্মক। আবার, '০' অবস্থানের ওপর দিক হল Y-অক্ষের ধনাত্মক এবং নীচের দিক হল ঋণাত্মক।

---

**অনুশীলনী — ৪**

১। গুণবাচক বর্গের পরিসংখ্যার সমানুপাতিকভাবে ভূমির ওপর বিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কিত একাধিক স্তম্ভকে স্তম্ভ চিত্র বলে।

২। পরিমাণ বাচক অবিচ্ছিন্ন চলের উপান্তসমূহের পরিসংখ্যার সমানুপাতিক ভাবে অঙ্কিত লাগোয়া আয়ত ক্ষেত্রগুলির সমন্বিত চিত্রকে আয়ত লেখ বলে।

৩। আয়ত লেখ কোনো শ্রেণীর দুই সীমার ওপর অঙ্কন করা হয়। কিন্তু, পরিসংখ্যা বহুভুজ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর ওপর অঙ্কিত হয়।

৪। পরিসংখ্যা বহুভুজ চিত্র দ্বারা দুই সমান নমুনার কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনা দেখানো যায়।

৫। আয়ত লেখ ও পরিসংখ্যা বহুভুজ পরিসংখ্যার সমানুপাতিক ভাবে অঙ্কিত হয়। কিন্তু, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এছাড়া, আয়ত লেখ শ্রেণীর সীমাদ্বয়ের ওপর এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ শ্রেণী মধ্যবিন্দুর ওপরে অঙ্কন করা হয়। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র সাধারণত শ্রেণীর উচ্চসীমার ওপর অঙ্কন করা হয়। তবে নিম্নসীমার ওপরও অঙ্কন করা যায়।

৬। এই চিত্র থেকে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম এবং কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্ধারণ করা যায়।

৭। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র ইংরাজি 'S' এর ন্যায় দেখতে হওয়ায় চিত্রটি অজিভ (Ogive) নামে পরিচিত থাকে।

---

**অনুশীলনী — ৫**

১। বৃত্তচিত্রের কৌণিক মান নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ পরিসংখ্যা শতাংশ × ৩৬০°/১০০

২। স্কেল, চাঁদা ও পেনসিল, কম্পাস।

৩। কোনো গুণবাচক বর্গের নির্দিষ্ট কালগত পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্ক বন্টন থেকে ঐ বর্গের একটি দিক নির্দেশ করার ক্ষেত্রে প্রবণতা চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী — ৬**

১। পর্যবেক্ষিত ঘটনার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্গীকরণকে গুণবাচক পরিমাপ বলে।

২। পরিমাণগত পরিমাপ বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষিত বৈশিষ্ট্যাবলীর ওপর নিয়মানুগভাবে সংখ্যা আরোপন।

৩। নামিক এবং ক্রমনির্দেশক পরিমাপক সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী প্রদর্শনে স্তম্ভচিত্র ও বৃত্তচিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে।

৪। সমপ্রসারী এবং আনুপাতিক পরিমাপক সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী প্রদর্শনে আয়তলেখ ও পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী — ৭**

১। এক্ষেত্রে '০' উল্লেখ না করলে লেখচিত্রের ঊর্ধ্বপ্রসার কম দেখানো হয়, এবং এর ফলে চিত্রটি বিকৃত অর্থ জ্ঞাপন করে থাকে।

২। ৪ ঃ ৩ নিয়ম অনুসরণ না করে লেখচিত্র অঙ্কন করলে Y-অক্ষ মর্জিমাফিক ছোট বড় করে প্রকৃত তথ্যকে গোপন করা হয়। এর ফলে বেশিকে কম এবং কমকে বেশি দেখানো যায়।

৩। লেখ চিত্র দর্শনে সর্বদাই Y-অক্ষের '০' অবস্থান দেখা দরকার। এছাড়া, X এবং Y অক্ষ নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে কিনা তা দেখা দরকার।

**সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ**

১। যদিও শ্রেণী সংখ্যার একটি চলনসই প্রসার হয় ১০-১৫, শ্রেণী পরিসর থেকে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় যথার্থ পন্থা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে প্রাপ্তাঙ্কগুলির প্রসার নির্ণয় করতে হয়। তারপর ছোট এবং অযুগ্ম সংখ্যা (৩, ৫, ৭,......) শ্রেণী পরিসর ধরে প্রসারকে ঐ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। কোনো ভাগশেষ থাকলে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হয়। এই যোগফল যদি ১০ থেকে ১৫'র মধ্যে থাকে তাহলে ঐ সংখ্যাটি হয় উদ্দিষ্ট শ্রেণী সংখ্যা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ঐ যোগফল ১০ থেকে ১৫'র বেশি হলে শ্রেণী পরিসর পরবর্তী অযুগ্ম সংখ্যা গ্রহণ করতে হয় যাতে ঐ যোগফল ১০ থেকে ১৫'র মধ্যে থাকে। আবার, ঐ যোগফল ১০ থেকে ১৫'র কম হলে শ্রেণী পরিসর আরও ছোট নিতে হয়। এই ভাবে শ্রেণী পরিসর থেকে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

২। তথ্যাবলীর পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী অনেকের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষক এবং অর্থবহ হয় না। কিন্তু, তথ্যাবলীর লেখচিত্র চিত্তাকর্ষক এবং সহজবোধ্য হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানবিদ মুয়েলার ও সুএজলার লেখচিত্রের দৃশ্যমানতা এবং তাৎক্ষণিক অর্থ জ্ঞাপনের সক্ষমতার উল্লেখ করেন। এবম্বিধ সুবিধার জন্য লেখ চিত্র তথ্য বিশ্লেষণে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

৩। স্তম্ভচিত্র ও আয়তলেখর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্তম্ভচিত্র গুণবাচক বর্গের পরিসংখ্যা বা প্রাপ্তাঙ্ককে প্রদর্শিত করে, যখন আয়ত লেখ পরিমাণগত চলের পরিসংখ্যা চিত্রায়িত করে থাকে। স্তম্ভচিত্র নামিক ও ক্রমনির্দেশক পরিমাপক দ্বারা পরিমেয় চলের তথ্য জ্ঞাপিত করে থাকে, কিন্তু আয়তলেখ সমপ্রসারী ও সমানুপাতিক পরিমাপকে পরিমেয় চলের তথ্যাবলী প্রদর্শন করে থাকে। স্তম্ভ চিত্রে স্তম্ভগুলি একে অপরের থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে; কিন্তু আয়ত লেখতে স্তম্ভগুলি একে অপরের লাগোয়া হয়ে থাকে, স্তম্ভচিত্র বিভিন্ন চলকে প্রদর্শিত করে; আয়ত লেখ অবিচ্ছিন্ন চলকে প্রদর্শন করে।

৪। নামিক ও ক্রমনির্দেশক পরিমাপকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। সাদৃশ্য গত দিক থেকে বলা যায় এই দুই পরিমাপকই বিচ্ছিন্ন গুণবাচক বর্গের শ্রেণীবিন্যাসগত পরিমাপ করে থাকে। এছাড়া, দুই পরিমাপকই শূন্য উৎসারী থাকে না, এবং দুই ক্ষেত্রেই একক অন্তরের সমপ্রসারতা থাকে না। বৈসাদৃশ্যগত দিক থেকে বলা যায় যে নামিক পরিমাপকে বর্গগুলির মধ্যে কোনো ক্রমবিন্যাস থাকে না। কিন্তু, ক্রমনির্দেশক পরিমাপকে এই ক্রমবিন্যাস থাকে, ফলে, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর বিচার এই দ্বিতীয় পরিমাপকে করা যায়।

৫। সমপ্রসারী ও সমানুপাতিক পরিমাপকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। সাদৃশ্যগত দিক থেকে বলা যায় যে দুই পরিমাপকেই পরিমাণবাচক অবিচ্ছিন্ন চলের তথ্যাবলী পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই দুই পরিমাপকেই একক অন্তরে সমপ্রসারতা রক্ষিত হয়ে থাকে। দুই পরিমাপকই শূন্য উৎসারী হয়ে থাকে। বৈসাদৃশ্যগত দিক থেকে বলা যায় যে সমপ্রসারী পরিমাপকের '০' অবস্থান বিধিমাফিক হয় না, কিন্তু আনুপাতিক

পরিমাপকে '০' অবস্থান প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন করে থাকে। সমপ্রসারী পরিমাপকে এক প্রাপ্তাঙ্ক অপর প্রাপ্তাঙ্ক থেকে কত বেশি বা কত কম তা নির্ধারণ করা যায়। আনুপাতিক পরিমাপকে কত কম বা বেশি ছাড়াও, একটি প্রাপ্তাঙ্ক অপরটির কত গুণ বা কত ভাগ বেশি বা কম তা নির্ণয় করা যায়।

৬। সরাসরি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন

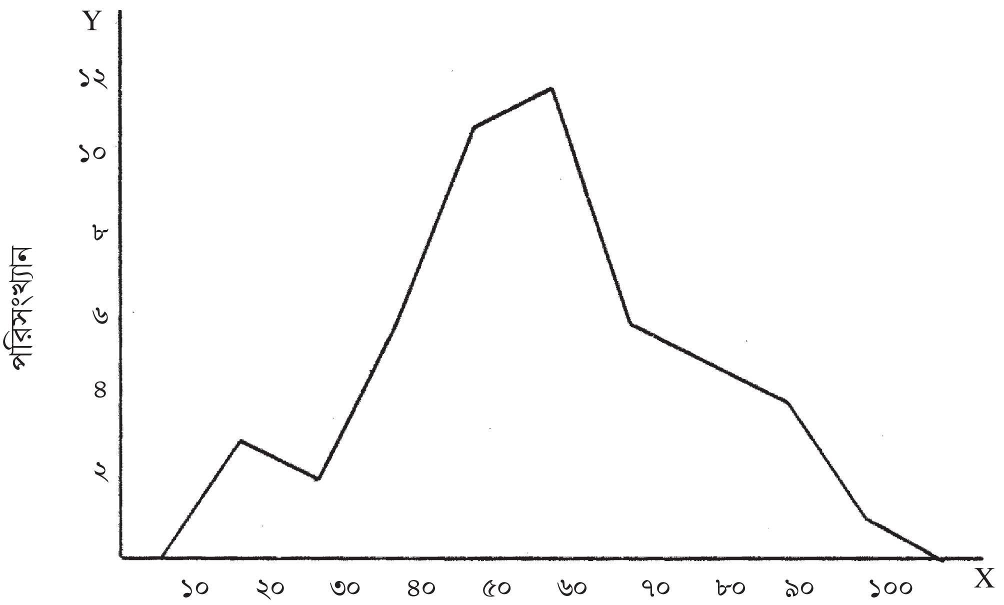


প্রাপ্তাঙ্ক

AX অক্ষ ঃ ১ একক = ১ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র

Y অক্ষ ঃ ১ একক = ৫ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র

## ৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। এলিফসন, কার্ক, রুনিয়ন ডব্ল্যু, রিচার্ড পি. এন্ড হাড্রে হেবার ঃ ফান্ডামেন্টালস অফ সোশ্যাল স্ট্যাটিসটিকস (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহীল পাবলিশিং কোম্পানি, সিঙ্গাপুর, ১৯৯০।

২। ব্ল্যালক, জুনিয়র, হ্যুবার্ট এম.; সোশ্যাল স্ট্যাটিসটিকস, ম্যাকগ্রহীল বুক কোম্পানি, সিঙ্গাপুর, ১৯৮১।

৩। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।

# একক ৪ ❑ শতাংশ বিন্দু

গঠন


৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ শতাংশ বিন্দু

৪.৩.১ ক্রমযৌগিক শতাংশ, শতাংশ ক্রম ও প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়

৪.৩.২ শতাংশ ক্রম ও উল্লেখ্য গোষ্ঠী

৪.৪ দশাংশ

৪.৫ চতুর্থাংশ

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ উত্তর সংকেত

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী


## ৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

- শতাংশ বিন্দু, এবং শতাংশ ক্রমের ধারণা ও নির্ণয় প্রক্রিয়া
- শতাংশ ক্রম থেকে প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় প্রক্রিয়া
- দশাংশ ও চতুর্থাংশের ধারণা ও নির্ণয় প্রক্রিয়া

## ৪.২ প্রস্তাবনা

পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা, একাধিক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের আপেক্ষিক পরিমাপ যেমন, শতাংশ বিন্দু, শতাংশ ক্রম, দশাংশ, চতুর্থাংশ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, দশাংশ ও চতুর্থাংশ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এদিক থেকে শতাংশ বিন্দু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে, শতাংশ ক্রমের দ্বারাই একে অপরের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে, শতাংশ ক্রম এক গুরুত্বপূর্ণ

আপেক্ষিক পরিমাপ হয়ে থাকে। শতাংশ ক্রম আবার একাধিক ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্যের বা কোনো ব্যক্তির একাধিক বৈশিষ্ট্যের প্রাপ্তাঙ্কের নিরিখে তুলনা করায় শতাংশ ক্রমের সাথে তুলনামূলক গোষ্ঠীর সম্পর্ক আলোচনা করা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। তাই এখানে শতাংশ বিন্দু শতাংশ ক্রম, তুলনামূলক গোষ্ঠী, দশাংশ ও চতুর্থাংশের আলোচনা পরম্পরা ক্রমে হল।

## ৪.৩ শতাংশ বিন্দু

শতাংশ বিন্দু বলতে বোঝায় কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের বা পরিসংখ্যা সমষ্টির ১০০ ভাগের প্রতি ভাগের ক্রমিক অবস্থানকে। এটি প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটিকে ৯৯টি ভাগে ভাগ করে থাকে। যেমন, শতাংশ$_{১}$, শতাংশ$_{২}$, শতাংশ$_{৩}$,............ শতাংশ$_{৯৯}$। প্রতিটি শতাংশ বিন্দু ঐ বিন্দুর নীচে কত শতকরা প্রাপ্তাঙ্ক থাকে তা নির্দেশ করে থাকে। যেমন, শতাংশ$_{৫০}$ এর অর্থ হল ঐ শতাংশ বিন্দুর নীচে প্রাপ্তাঙ্কের শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%) অবস্থান করে থাকে। আবার ঐ শতাংশ বিন্দু কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের নির্দিষ্ট প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ অবস্থান নির্দেশ করে থাকে। আবার ঐ শতাংশ অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক (Score) নির্ণয় করা যায়, যেমন, কোনো একটি শ্রেণীর কোনো ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর ৪০ হলে ঐ শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে প্রাপ্তাঙ্ক ৪০ এর অবস্থান শতাংশ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা যায়। আবার, কোনো ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ অবস্থান ৬০ হলে ঐ ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর ঐ শতাংশ অবস্থান থেকে নির্ণয় করা যায়।

**অনুশীলনী - ১**

১। শতাংশ বিন্দু কাকে বলে?

২। শতাংশ বিন্দুর মোট সংখ্যা কত? ১০০টি / ৯৯টি।

৩। শতাংশ বিন্দুর উপযোগিতা কী?

## ৪.৩.১ ক্রমযৌগিক শতাংশ, শতাংশ ক্রম ও প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়

ক্রমযৌগিক শতাংশ বা শতকরা ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার আলোচনা একক-৩ এর ৩.৩.১ অংশে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমযৌগিক শতকরা পরিসংখ্যা উল্লেখে শতাংশ ক্রম এবং প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হল।

**শতাংশ ক্রম ঃ**

শতাংশ ক্রম বলতে একটি প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশগত অবস্থানকে বোঝায়। প্রাপ্তাঙ্কের এই অবস্থান থেকে বণ্টনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শতাংশ অবস্থানও চিহ্নিত হয়ে থাকে। শতাংশ ক্রম গাণিতিক প্রক্রিয়ায় এবং শতকরা ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র বা অজিভ (Ogive) থেকে নির্ণয় করা যায়। প্রথমে গাণিতিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় একটি সূত্রের সাহায্যে গোষ্ঠীবদ্ধ পরিসংখ্যা বণ্টনের কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম নির্ণয় করা যায়। এই সূত্রটি হল ঃ

$$\text{শতাংশ ক্রম } (P_{২}) = \frac{\text{প্রাপ্তাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর নিম্ন বা, পূর্ব শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা} + \frac{\text{প্রাপ্তাঙ্ক} - \text{প্রাপ্তাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা}}{\text{শ্রেণী পরিসর}} \times \text{প্রাপ্তাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যা}}{\text{পরিসংখ্যা সমষ্টি (N)}}$$

একক = ৩ অন্তর্ভুক্ত ৩.৩ অংশে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বন্টন সারণী - ১ এবং ৩.৩.১ অংশে প্রদর্শিত ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা সূত্রে প্রাপ্তাঙ্ক ৫০ এর শতাংশ ক্রম নির্ণয় করা যাক।

$$\text{এক্ষেত্রে শতাংশ ক্রম} = \frac{৩৩ + \frac{৫০ - ৪৮৫}{৩} \times ৭}{৫০} \times ১০০$$

$$= \frac{৩৩ + \frac{১৫}{৩} \times ৭}{৫০} \times ১০০$$

$$= \left(৩৩ + \frac{১০.৫}{৩}\right) \times ২ = ৩৬.৫ \times ২ = ৭৩$$

প্রাপ্তাঙ্ক ৫০ এর শতাংশ ক্রম হয় ৭৩ ($\text{শতাংশ}_{৭৩}$)। এখন, একক -৩ অন্তর্ভুক্ত ৩.৪.১ অংশে প্রদত্ত চিত্র নং-৩ উল্লেখে প্রাপ্তাঙ্ক ৫০ এর শতাংশ ক্রম নির্ণয় প্রক্রিয়া দেখানো যাক। এক্ষেত্রে প্রথমে X-অক্ষে প্রাপ্তাঙ্ক ৫০-এর অবস্থান নির্ণয় করতে হয়। অতঃপর ৫০ এর অবস্থান বিন্দুর ওপর Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা বা লম্ব টানতে হয়। এই রেখা অজিভকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ বিন্দু থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল একটি লেখা টানা হল। ঐ রেখাটি Y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ ছেদবিন্দুর অবস্থানগত মান হয় ৫০ এর শতাংশক্রম। এক্ষেত্রে ঐ মান হয় ৭০ + ২ (Y অক্ষের ১ একক) = ৭২, এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গণনাকৃত মানের সাথে লেখচিত্র প্রদর্শিত মানের কিছু পার্থক্য উপস্থিত থাকে। লেখচিত্র যত শুদ্ধ হয়, এই পার্থক্য তত কমে।

চিত্র নং — ৩

ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্র

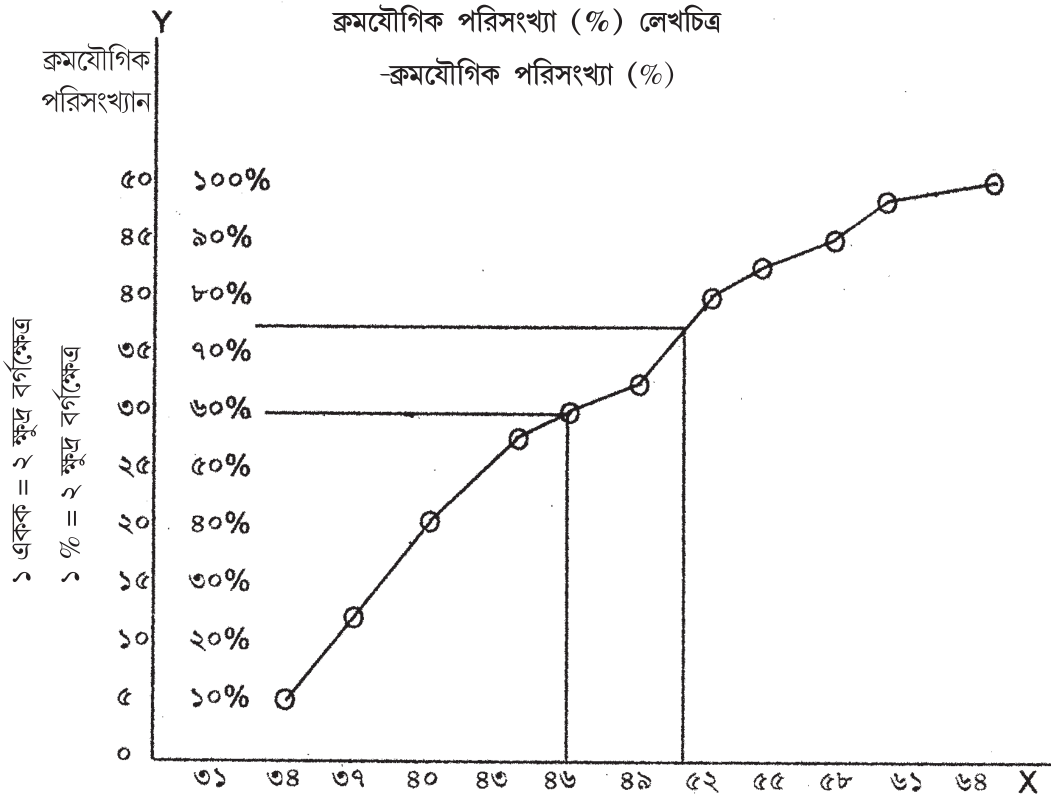


**X - অক্ষ ঃ ১ একক = ৪ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র**

**Y - অক্ষ ঃ ১ একক = ২ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র, ১% = ১ ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র**

প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় ঃ কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের শতাংশ ক্রম থেকে প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় সূত্রের সাহায্যে করা যায়, আবার ক্রম যৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র বা অজিভ থেকেও করা যায়। প্রথমে সূত্রের সাহায্যে কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় প্রক্রিয়া দেখানো যাক। ধরা যাক শতাংশ$_{৬০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে। এখন পূর্বে উল্লেখিত পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী - ১ ও ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা স্তম্ভ উল্লেখে এই প্রক্রিয়া দেখানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য শতাংশ ক্রম থেকে প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ

$$\text{প্রাপ্তাঙ্ক} = \begin{array}{c}\text{প্রাপ্তাঙ্কের ক্রমযৌগিক}\\ \text{পরিসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর}\\ \text{প্রকৃত নিম্নসীমা}\end{array} + \text{শ্রেণী প্রসার}\left(\frac{\begin{array}{c}\text{প্রাপ্তাঙ্কের ক্রমযৌগিক}\\ \text{পরিসংখ্যা}\end{array} - \begin{array}{c}\text{ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা}\\ \text{অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর}\\ \text{পূর্বশ্রেণী ক্রমযৌগিক}\\ \text{পরিসংখ্যা}\end{array}}{\text{প্রাপ্তাঙ্কের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যা}}\right)$$

এক্ষেত্রে প্রথমে প্রাপ্তাঙ্কের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে হয়, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার সূত্র হল ঃ

$$\frac{\text{প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম}}{\text{১০০}} \times \text{পরিসংখ্যা সমষ্টি}$$

$$\text{এক্ষেত্রে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হল} = \frac{\text{৬}\cancel{\text{০}}}{\text{১}\cancel{\text{০}}\cancel{\text{০}}} \times \text{৫}\cancel{\text{০}} = \text{৩০}$$

$$\therefore \text{ প্রাপ্তাঙ্ক হল} = \text{৪২.৫} + \frac{\text{৩(৩০ − ২৭)}}{\text{৩}} = \text{৪২.৫} + \frac{\cancel{\text{৩}} \times \text{৩}}{\cancel{\text{৩}}} = 45.5$$

এখন, পূর্বের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্রে শতাংশ ক্রম ৬০ এর প্রাপ্তাঙ্ক দেখানো যাক। এক্ষেত্রে Y-অক্ষে ৬০% এর অবস্থান বিন্দু থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা টানা হল যা অজিভকে ছেদ করে থাকে। অতঃপর ঐ ছেদ বিন্দু থেকে Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা X-অক্ষের ওপর টানা হল। এই রেখা X-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ ছেদবিন্দুর মানই হল উদ্দিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক। এক্ষেত্রে এই প্রাপ্তাঙ্ক হয় ৪৬। এখানেও দেখা যায় যে গণনাকৃত মান (৪৫.৫) হতে লেখচিত্র প্রদর্শিত মান কিঞ্চিৎ পার্থক্যমূলক হয়ে থাকে। তবে, দুই ক্ষেত্রেই গণনাকৃত মান শুদ্ধ হয়ে থাকে। তাই, গণনা পদ্ধতি অনুসরণই যথার্থ হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ২**

১। শতাংশ ক্রম কাকে বলে?

২। শতাংশ ক্রম নির্দেশে এবং শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্দেশে কোন লেখচিত্র সহায়ক হয়ে থাকে?

৩। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় শতাংশ ক্রম ও প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়ে যে শুদ্ধতা পাওয়া যায় লেখচিত্রের মাধ্যমে শতাংশ ক্রম ও প্রাপ্তাঙ্ক নির্দেশে সে শুদ্ধতা পাওয়া যায় না কেন?

## ৪.৩.২ শতাংশ ক্রম ও উল্লেখ্য গোষ্ঠী

শতাংশ ক্রম ব্যক্তির একক অবস্থানে অর্থবহ হয় না। একটি গোষ্ঠীর প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের নিরিখে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের তথা ঐ প্রাপ্তাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শতাংশ ক্রম নির্ধারিত হয়। এদিক থেকে শতাংশ ক্রমের সাথে ঐ গোষ্ঠীর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। এ ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের উল্লেখেই হয়ে থাকে। তাই, ঐ গোষ্ঠী উল্লেখ্য গোষ্ঠী নামে পরিচিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো শ্রেণীতে একটি ছাত্রের প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশক্রম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ছাত্রদের প্রাপ্তাঙ্কের উল্লেখেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এছাড়া, শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ছাত্রের প্রাপ্তাঙ্কের সাথে তুলনা সূত্রেই ঐ শতাংশ ক্রম অর্থবহ হয়ে থাকে। তুলনামূলক গোষ্ঠীর সার্বিক মান উন্নত হলে

শতাংশ ক্রম বেশি উল্লেখযোগ্য হয়। কোনো নামী বিদ্যালয়ের কোনো শ্রেণীর ছাত্রের উচ্চ শতাংশ ক্রম অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর কোনো ছাত্রের উচ্চ শতাংশ ক্রমের সমান হয় না। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত বিদ্যালয়ের ছাত্রের উচ্চ শতাংশ ক্রম বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৩**

১। উল্লেখ্য গোষ্ঠী কাকে বলে?

২। উল্লেখ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে শতাংশ ক্রমের সম্পর্ক কী?

## ৪.৪ দশাংশ

দশাংশ বলতে বোঝায় কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের মোট প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যার বা মোট পরিসংখ্যার ১০ ভাগের প্রতি ভাগের অবস্থান। কোনো পরিসংখ্যা সমষ্টিকে ১০ ভাগে বিভক্ত করলে মোট ৯টি দশাংশ পাওয়া যায় যেমন, দশাংশ$_{১}$, দশাংশ$_{২}$, দশাংশ$_{৩}$, .......দশাংশ$_{৯}$। কোনো বণ্টনের প্রথম দশাংশ হল সেই অবস্থান যার নীচে মোট প্রাপ্তাঙ্কের ১/১০ ভাগ এবং উপরে ৯/১০ এবং ওপরে থাকে ১/১০ ভাগ প্রাপ্তাঙ্ক। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যে কোনো দশাংশকে শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন, দশাংশ$_{১}$ = শতাংশ$_{১০}$, দশাংশ$_{৯}$ = শতাংশ$_{৯০}$। এইভাবে প্রতি দশাংশ মানকে ১০ দ্বারা গুণ করলে শতাংশ মান বা বিন্দু পাওয়া যায়। এদিক থেকে, কোনো দশাংশের প্রাপ্তাঙ্ক ঐ দশাংশের শতাংশের ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় সূত্র দ্বারাই নির্দেশ করা যায়। বিপরীত ক্রমে, কোনো প্রাপ্তাঙ্কের দশাংশ অবস্থান ও প্রাপ্তাঙ্ক থেকে শতাংশ ক্রম নির্ণয় সূত্রে জানা যায়। অজিভ চিত্র থেকেও দশাংশ মান ও তার প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

**অনুশীলনী - ৪**

১। দশাংশ অবস্থান কাকে বলে?

২। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে কটি দশাংশ থাকে? ১০টি/৯টি।

৩। দশাংশ অবস্থানকে কীভাবে শতাংশ অবস্থানে রূপান্তরিত করা হয়?

## ৪.৫ চতুর্থাংশ

চতুর্থাংশ অবস্থান বলতে বোঝায় কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা সমষ্টির ৪ ভাগের প্রতি ভাগের অবস্থান। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যে কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে ৩টি চতুর্থাংশ অবস্থান থাকে ঃ চতুর্থাংশ$_{১}$, চতুর্থাংশ$_{২}$ এবং চতুর্থাংশ$_{৩}$। এই চতুর্থাংশ অবস্থান শতাংশ ক্রমে রূপান্তরিত করা যায়। প্রতি চতুর্থাংশের অবস্থানগত মানকে ২৫ দ্বারা গুণ করলে সংশ্লিষ্ট শতাংশ ক্রম পাওয়া যায়। যেমন, চতুর্থাংশ$_{১}$ = শতাংশ$_{২৫}$, চতুর্থাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{৫০}$, চতুর্থাংশ$_{৩}$ = শতাংশ$_{৭৫}$। প্রতি চতুর্থাংশের প্রাপ্তাঙ্ক ঐ চতুর্থাংশের শতাংশ ক্রম থেকে প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় সূত্রে গণনা করা যায়। বিপরীতক্রমে, যে কোনো প্রাপ্তাঙ্কে চতুর্থাংশ অবস্থান ঐ প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ অবস্থান নির্ণয় সূত্র দ্বারা গণনা করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) চিত্র থেকেও কোনো চতুর্থাংশের প্রাপ্তাঙ্ক এবং কোনো প্রাপ্তাঙ্কের চতুর্থাংশ অবস্থান নির্দেশ করা যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রথম চতুর্থাংশের নীচের প্রাপ্তাঙ্কের ২৫%, দ্বিতীয় চতুর্থাংশের নীচে ৫০% এবং তৃতীয় চতুর্থাংশের নীচে ৭৫%।

---

**অনুশীলনী - ৫**

১। চতুর্থাংশ অবস্থান কাকে বলে?

২। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে কটি চতুর্থাংশ থাকে? ৩টি / ৪টি।

৩। চতুর্থাংশ অবস্থানকে কীভাবে শতাংশ ক্রমে রূপান্তরিত করা যায়?

## ৪.৬ সারাংশ

কোনো গোষ্ঠীতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রাপ্তাঙ্কের উল্লেখে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রাপ্তাঙ্কের অবস্থান বা, একই ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন প্রাপ্তাঙ্কের অবস্থান তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য আপেক্ষিক অবস্থান পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত কৌশল যেমন শতাংশ বিন্দু, শতাংশ ক্রম, দশাংশ, চতুর্থাংশ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের মোট প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যার ১০০ ভাগের প্রতি ভাগ ক্রমিকভাবে ৯৯টি শতাংশ বিন্দু নির্দেশ করে থাকে। কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম ঐ শতাংশ বিন্দু দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রাপ্তাঙ্কের সংখ্যা সমষ্টির ১০ ভাগের প্রতি ভাগ ক্রমানুসারে ৯টি দশাংশ নির্দেশ করে থাকে। আবার, মোট প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যার ৪ ভাগের প্রতি ভাগ ক্রমানুসারে ৩টি চতুর্থাংশ নির্দেশ করে থাকে। তবে, দশাংশ এবং চতুর্থাংশকে শতাংশে রূপান্তরিত করা যায়। এই শতাংশ ক্রম অনুসারেই প্রাপ্তাঙ্কের অবস্থানগত তুলনা করা হয়ে থাকে, কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম বা কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক গাণিতিক পদ্ধতিতে এবং ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। তবে, গাণিতিক পদ্ধতিই এক্ষেত্রে শুদ্ধ হয়ে থাকে।

## ৪.৭ অনুশীলনী

১। শতাংশ বিন্দু কী নির্দেশ করে থাকে?

২। একক ৩ অন্তর্ভুক্ত ৩.৩ অংশে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী থেকে ৩২, ৫০ ও ৬২ প্রাপ্তাঙ্কগুলির শতাংশ ক্রম নির্ণয় করুন।

৩। উল্লিখিত সারণী এবং উল্লিখিত এককের ৩.৩.১ অংশে প্রদত্ত ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) স্তম্ভ উল্লেখে শতাংশ$_{৪০}$, শতাংশ$_{৮০}$ এবং শতাংশ$_{৯৫}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় করুন।

৪। উল্লিখিত সারণী থেকে দশাংশ$_{৪}$ এবং দশাংশ$_{৮}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় করুন।

৫। উল্লিখিত সারণী থেকে চতুর্থাংশ$_{১}$ এবং চতুর্থাংশ$_{৩}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় করুন।

৬। অজিভের সাহায্যে কীভাবে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম এবং কোনো শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্দেশ করা হয়?

৭। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) চতুর্থাংশ$_{২}$ এর নীচে কতগুলি দশাংশ থাকে?

(খ) দশাংশ$_{২}$ এর নীচে কতগুলি শতাংশ বিন্দু থাকে?

(গ) শতাংশ$_{৭৫}$ এর নীচে কতগুলি চতুর্থাংশ থাকে?

(ঘ) একটি প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে চতুর্থাংশ$_{২}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ৪০ হলে শতাংশক্রম$_{৫০}$ এর প্রাপাঙ্ক কত হবে ?

(ঙ) কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে শতাংশ$_{৬০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ৫০ হলে দশাংশ$_{৬}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক কত হবে?

(চ) কোনো প্রাপ্তাঙ্কের আপেক্ষিক অবস্থান শতাংশক্রম$_{৩০}$ হলে দশাংশ অবস্থান কত হবে?

(ছ) কোনো প্রাপ্তাঙ্কের আপেক্ষিক অবস্থান চতুর্থাংশ$_{৩}$ হলে শতাংশ ক্রম কত হবে?

## ৪.৮ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী—১**

১। শতাংশ বিন্দু বলতে বোঝায় কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের বা পরিসংখ্যা সমষ্টির ১০০ ভাগের প্রতি ভাগের ক্রমিক অবস্থানকে।

২। শতাংশ বিন্দুর মোট সংখ্যা ৯৯টি।

৩। শতাংশ বিন্দু কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম নির্দেশ করে থাকে। এছাড়া, ঐ শতাংশ বিন্দু থেকে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক নির্দেশ করা যায়।

**অনুশীলনী—২**

১। শতাংশ ক্রম বলতে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ অবস্থানকে বোঝায়।

২। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্র বা অজিভ শতাংশ ক্রম নির্দেশে এবং শতাংশ ক্রমের প্রাপ্তাঙ্ক নির্দেশে সহায়ক হয়ে থাকে।

৩। লেখচিত্র গঠনে যথার্থ শুদ্ধতা না থাকায় এই চিত্রের মাধ্যমে শতাংশ ক্রম ও প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয় গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে লভ্য শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেনা।

**অনুশীলনী—৩**

১। যে গোষ্ঠীর প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের উল্লেখে কোনো ব্যক্তির প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম নির্দেশিত তথা তুলনাকৃত হয় ঐ গোষ্ঠীকে উল্লেখ্য গোষ্ঠী বলে।

২। উল্লেখ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে শতাংশ ক্রমের সম্পর্ক হল নিম্নরূপ ঃ

উল্লেখ্য গোষ্ঠীর প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের নিরিখেই শতাংশ ক্রম নির্ধারিত হয়;

শতাংশ ক্রম দ্বারা কোনো ব্যক্তির প্রাপ্তাঙ্কের তুলনা গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির প্রাপ্তাঙ্ক উল্লেখেই করা হয়ে থাকে; উল্লেখ্য গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগত উচ্চ নীচ মান শতাংশ ক্রমের তুলনাকে বিশেষ আকর্ষক করে থাকে।

**অনুশীলনী—৪**

১। দশাংশ বলতে কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বন্টনের মোট প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যার বা মোট পরিসংখ্যার ১০ ভাগের প্রতি ভাগের অবস্থানকে বোঝায়।

২। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বন্টনে দশাংশ থাকে ৯টি।

৩। দশাংশ অবস্থান মানকে ১০ দিয়ে গুণ করলে শতাংশ অবস্থান পাওয়া যায়। যেমন, দশাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{২\times১০=২০}$

**অনুশীলনী—৫**

১। চতুর্থাংশ অবস্থান বলতে কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা সমষ্টির ৪ ভাগের প্রতি ভাগের অবস্থানকে বোঝায়।

২। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের চতুর্থাংশ থাকে ৩টি।

৩। চতুর্থাংশ অবস্থানের মানকে ২৫ দ্বারা গুণ করলে শতাংশ ক্রম পাওয়া যায়। যেমন, চতুর্থাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{২\times২৫=৫০}$

**সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ**

১। প্রতিটি শতাংশ বিন্দু ঐ বিন্দুর নীচে কত শতাংশ প্রাপ্তাঙ্ক থাকে তা নির্দেশ করে।

২। ৩২ এর শতাংশ ক্রম হল ঃ $০ + \frac{৩২ - ৩০.৫}{৩} \times ৫$

$$\frac{\qquad\qquad}{৫০} \times ১০০ = \frac{১.৫}{৩} \times ৫ \times ২ = ৫$$

৫০ এর শতাংশ ক্রম হল ঃ $৩৩ + \frac{৫০ - ৪৮.৫}{৩} \times ৭$

$$\frac{\qquad\qquad}{৫০} \times ১০০ = (৩৩ + ৩.৫)\ ২ = ৭৩$$

৬২ এর শতাংশ ক্রম হল ঃ $৪৯ + \frac{৬২ - ৬০.৫}{৩} \times ৩$

$$\frac{\qquad\qquad}{৫০} \times ১০০ = (৪৯ + ০.৫)\ ২ = ৯৯$$

৩। শতাংশ$_{৪০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা = $\frac{৪\not{০}}{১০\not{০}} \times ৫\not{০} = ২০$

৩(২০ – ১৩) ২১

প্রাপ্তাঙ্ক $৩৬.৫ + \frac{}{৮} = ৩৬.৫ + \frac{}{৮} = ৩৯.১২ = ৩৯$

শতাংশ$_{৮০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা $= \frac{৮\cancel{০}}{১\cancel{০}\cancel{০}} \times ৫\cancel{০} = ৪০$

প্রাপ্তাঙ্ক $= ৪৮.৫ + \frac{৩(৪০ - ৩৩)}{৭} = ৪৮.৫ + ৩ = ৫১.৫ = ৫১$ [প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে দশমিক সংখ্যা নেই]

শতাংশ$_{৯৫}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা $= \frac{৯৫}{১০\cancel{০}} \times ৫\cancel{০} = ৯.৫ \times ৫ = ৪৭.৫$

প্রাপ্তাঙ্ক $= ৫৭.৫ + \frac{৩(৪৭.৫ - ৪৫)}{৪} = ৫৭.৫ + \frac{৭.৫}{৪} = ৫৯.৪ = ৫৯$

৪। দশাংশ$_{৪}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ এক্ষেত্রে দশাংশ$_{৪}$ = শতাংশ$_{৪\times১০=৪০}$

এখন, শতাংশ$_{৪০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক হয় = ৩৯ (৩নং উত্তর লক্ষণীয়)

দশাংশ$_{৮}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ দশাংশ$_{৮}$ = শতাংশ$_{৮\times১০=৮০}$

এখন, শতাংশ ৮০'র প্রাপ্তাঙ্ক হয় = ৫১ (৩নং উত্তর লক্ষণীয়)

৫। চতুর্থাংশ$_{১}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ চতুর্থাংশ$_{১}$ = শতাংশ$_{১\times২৫=২৫}$

এখন, শতাংশ$_{২৫}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণেয় হয়

এক্ষেত্রে নির্ণেয় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা $= \frac{২৫}{১০\cancel{০}} \times ৫\cancel{০} = ২.৫ \times ৫ = ১২.৫$

এখন, প্রাপ্তাঙ্ক $= ৩৩.৫ + \frac{৩(১২.৫ - ৫)}{৮} = ৩৩.৫ + \frac{২২.৫}{৮} = ৩৩.৫ + ২.৮ = ৩৬.৩ = ৩৫$

চতুর্থাংশ$_{৩}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক ঃ চতুর্থাংশ$_{৩}$ = শতাংশ$_{৩\times২৫=৭৫}$

এখন, শতাংশ$_{৭৫}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণেয় হয়

এক্ষেত্রে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা $= \frac{৭৫}{১০\cancel{০}} \times ৫\cancel{০} = ৭.৫ \times ৫ = ৩৭.৫$

এখন, প্রাপ্তাঙ্ক $= ৪৮.৫ + \frac{৩(৩৭.৫ - ৩৩)}{৮} = ৪৮.৫ + ১.৯ = ৫০.৪ = ৫০$

৬। অজিভ বা ক্রম যৌগিক পরিসংখ্যা (%) লেখচিত্র থেকে কোনো প্রাপ্তাঙ্কের শতাংশ ক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে X-অক্ষে ঐ প্রাপ্তাঙ্কের অবস্থান বিন্দুর ওপর Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরল রেখা বা লম্ব টানতে হয়। ঐ রেখা অজিভকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ ছেদ বিন্দু থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরল রেখা Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখা বা লম্বা টানতে হয়। ঐ রেখা অজিভকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ ছেদ বিন্দু থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখা Y-অক্ষের ওপর টানতে হয় Y-অক্ষে ঐ রেখার ছেদ বিন্দু গত শতাংশ অবস্থানই উদ্দিষ্ট শতাংশ ক্রম হয়ে থাকে।

কোনো শতাংশ ক্রম থেকে প্রাপ্তাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে Y-অক্ষে ঐ শতাংশ ক্রম অবস্থান থেকে X-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরল রেখা টানতে হয়। এই রেখা অজিভকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঐ ছেদবিন্দুতে Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরল রেখা X-অক্ষের ওপর টানতে হয়। X-অক্ষের ঐ রেখার ছেদ বিন্দুর মানই হয় উদ্দিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক।

৭। (ক) ৫টি (চতুর্থাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{৭×২৫=৫০}$ দশাংশ$_{৫০/১০=৫}$)

(খ) ২০টি (দশাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{২×১০=২০}$)

(গ) ৩টি (শতাংশ$_{৭৫}$ = চতুর্থাংশ$_{৭৫/২৫=৩}$)

(ঘ) ৪০টি (কারণ, চতুর্থাংশ$_{২}$ = শতাংশ$_{৫০}$)

(ঙ) ৬০ (কারণ, শতাংশ$_{৬০}$ = দশাংশ$_{৬০/১০০=৬}$)

(চ) ৩ (কারণ, শতাংশ$_{৩০}$ = দশাংশ$_{৩০/১০=৩}$)

(ছ) ৭৫ (কারণ, চতুর্থাংশ$_{৩}$ = শতাংশ$_{৩×২৫=৭৫}$)

## ৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। এলিফসন, কার্ক, রুনিয়ন ডব্ল্যু, রিচার্ড পি. এন্ড হাড্রে হেবার ঃ ফান্ডামেন্টালস অফ সোশ্যাল স্ট্যাটিস্‌টিক্স (দ্বিতীয় সংস্করণ), ম্যাকগ্রহিল পাবলিশিং কোম্পানি, সিঙ্গাপুর, ১৯৯০।

২। ব্যালক, জুনিয়র, হ্যুবার্ট এম্ ঃ সোশ্যাল স্ট্যাটিসটিক্স, ম্যাকগ্রহিল বুক কোম্পানি, সিঙ্গাপুর, ১৯৮১।

৩। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।

# একক ৫ ❑ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ

গঠন


৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ কেন্দ্রীয় প্রবণতা

৫.৩.১ যৌগিক গড়

৫.৩.২ মধ্যমান

৫.৩.৩ সংখ্যা গুরমান

৫.৩.৪ যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যা গুরু মানের তুলনা

৫.৪.৫ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র

৫.৪ প্রতিবৈষম্য

৫.৫ সারাংশ

৫.৬ অনুশীলনী

৫.৭ উত্তর সংকেত

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী


## ৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিচার

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র বিচার

## ৫.২ প্রস্তাবনা

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী গঠনের দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত ও সুবিন্যস্ত করে লেখ চিত্র অঙ্কনের দ্বারা সহজবোধ্য করলে কোনো সংক্ষিপ্ত একক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু, প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনে সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই প্রবণতা পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্তাঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত ও একক মান পাওয়া যায়। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলীর এই প্রবণতা সাধারণত

যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যাগুরু মান পরিমাপের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পরিমাপগুলির পরিমাপন ও প্রয়োগ ক্ষেত্র ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সুষমতা ও বিষমতার ওপর উল্লিখিত পরিমাপগুলির যথার্থ প্রয়োগ নির্ভরশীল থাকে। প্রতি বৈষম্য পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির বিষমতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এখন এই এককে কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপের পরিচয়, তুলনামূলক বিচার ও প্রতি বৈষম্য পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

## ৫.৩ কেন্দ্রীয় প্রবণতা

এলিফসন ও অন্যান্যদের (Elifson) মতে কেন্দ্রীয় প্রবণতা হল কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনের কেন্দ্রীয় অবস্থানের সূচক (Index of central location used in the description of frequency distribution)। এই সূচকটি একটি মান নির্দেশ করে যেটি এ. ফ. জে. গ্র্যাভেটার এবং এল. বি. ওয়ালনো'র (Gravetter & Wallnau) মতে ঐ বণ্টনের প্রতিনিধিত্ব মূলক হয়ে থাকে (Single most representative score for an entire distribution)। প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রকৃতি বিচারে কেন্দ্রীয় মান নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত যৌগিক গড় (Arithmetic Mean), মধ্যমান (Median) এবং সংখ্যা গুরু মান (Mode) পরিমাপ (Measure) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ১**

১। কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কী বোঝায়?

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে সাধারণত কী কী পরিমাপ প্রয়োগ করা হয়?

## ৫.৩.১ যৌগিক গড়

যৌগিক গড় বলতে সাধারণত কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্কগুলির সমষ্টিকে প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা দ্বারা ভাগ ক্রিয়ার ভাগফলকে বোঝায়। কোনো অগোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের গড় নির্ণয়ের গড় নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ $\Sigma X / N$ (যেখানে প্রাপ্তাঙ্কের একাধিক পরিসংখ্যা থাকে না) এখানে $X$ = প্রাপ্তাঙ্ক, $N$ = প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা এবং $\Sigma$ = সমষ্টি, যেমন, কোনো ক্রিকেট দলে ৬ জন খেলোয়াড়ের রান যথাক্রমে হয় ঃ ২০, ৪০, ৩৫, ১৫, ১০, ০। এক্ষেত্রে ঐ ক্রিকেটারদের গড় রান হয় =

$$\frac{\Sigma X}{N} = \frac{২০ + ৪০ + ৩৫ + ১৫ + ১০ + ০}{৬} = \frac{১২০}{৬} = ২০$$

ইহা সকল যৌগিক গড় নামে পরিচিত থাকে। কিন্তু প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা থাকলে যৌগিক গড় নির্ণয়ের সূত্র হয় ঃ $\Sigma fx/N$ অর্থাৎ, সব প্রাপ্তাঙ্কের প্রাপ্তাঙ্ক $X$ পরিসংখ্যা সমূহের সমষ্টি ÷ প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা। পরিসংখ্যা যুক্ত গড় ভার যুক্ত গড় নামেও পরিচিত থাকে।

যেমন কোনো ক্রিকেট দলে ১০ জন ক্রিকেটারের রান হয় নিম্নরূপ ঃ

| রান (X) | পরিসংখ্যা (f) | fx |
|---|---|---|
| ২১ | ২ | ৪২ |
| ২৪ | ২ | ৪৮ |
| ২৫ | ৩ | ৭৫ |
| ২৬ | ৩ | ৭৮ |
| সমষ্টি | N = ১০ | ২৪৩ |

এক্ষেত্রে রানের গড় = Σ fx/N = ২৪৩/১০ = ২৪.৩ এখানে, fx একটি স্তম্ভ গঠন করতে হল যেখানে প্রতি রান সংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা (f) গুণ করে গুণফলগুলি পরম্পরা ক্রমে বসানো হল। এই স্তম্ভটির মানগুলির সমষ্টি হল Σfx।

ভারযুক্ত গড় (Weighted Mean) গোষ্ঠীবদ্ধ পরিসংখ্যা বণ্টন থেকেও নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ Σ fx/N এখানে X = প্রতি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বা মধ্যমান। এখন একটা গোষ্ঠীবদ্ধ পরিসংখ্যা বণ্টন থেকে গড় নির্ণয় করা দেখানো যাক।

| শ্রেণী | পরিসংখ্যা | X | fx |
|---|---|---|---|
| ০ - ৪ | ৩ | ২ | ৬ |
| ৫ - ৯ | ৪ | ৭ | ২৮ |
| ১০ - ১৪ | ৫ | ১২ | ৬০ |
| ১৫ - ১৯ | ৩ | ১৭ | ৫১ |

N = ১৫ Σ fx = ১৪৫

এখানে প্রথমে প্রতি শ্রেণীর মধ্যমান বার করতে হয়। মধ্যমান নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ (শ্রেণীর উচ্চসীমা + নিম্নসীমা) ÷ ২। এই সূত্রানুসারে মধ্যমানগুলি বসানো হল। এর পর মধ্যমান ও তার পরিসংখ্যা গুণ করে fx স্তম্ভ গঠন করা হল এবং fx এর সমষ্টি নির্ণয় করা হল। এক্ষণে নির্ণেয় গড় হল = Σ fx/N = ১৪৫/১৫ = ৯.৬৭।

গোষ্ঠীবদ্ধ সারণী থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও গড় নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যে কোনো শ্রেণীর মধ্যমানকে আনুমানিক গড় হিসাবে ধরতে হয়। এক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ

$$\text{আনুমানিক গড় (A.U.)} + \frac{\Sigma fd'}{N} i.$$

এখানে i = শ্রেণী পরিসর

N = পরিসংখ্যা সমষ্টি

$$\Sigma fd' = \left(\text{প্রতি শ্রেণীর পরিসংখ্যা} \times \frac{-\text{ কল্পিত গড় } + \text{ মধ্যমান}}{\text{শ্রেণী পরিসর}}\right) \text{ এর সমষ্টি}$$

এই সূত্র প্রয়োগ করার জন্য পরিসংখ্যা বণ্টন সারণীতে d' এবং fd' এই দুটি স্তম্ভ গঠন করতে হয়। d' নির্ণয়ের ত্রুটি সহজ প্রক্রিয়া হল যে শ্রেণীর মধ্যমানকে কল্পিত গড় ধরা হয় তার d' = 0 ধরা, এই শ্রেণীর নিম্নমান বিশিষ্ট শ্রেণীগুলির d' ক্রমান্বয়ে -১, -২, -৩ ইত্যাদি।

ধরি কল্পিত গড় হয় তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান = ১২, এখন, d' এবং fd' এই দুটি হয় নিম্নরূপ ঃ

| d' | fd' |
|---|---|
| -২ | -৬ |
| -১ | -৪ |
| ০ | ০ |
| ১ | ৩ |
| | -৭ |

$$\therefore \text{ নির্ণেয় গড় হয় } = ১২ + \frac{-৭}{১৫} \times ৫ = ১২ + \frac{-৩৫}{১৫}$$

$$= ১২ - ২.৩৩ = ৯.৬৭$$

এক্ষেত্রে, উল্লেখ্য, দুই পদ্ধতিতে একই উত্তরপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

## অনুশীলনী - ২

১। সরলযৌগিক গড় কাকে বলে?

২। ভারযুক্ত গড় বলতে কী বোঝায়?

৩। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ে d' কীভাবে উল্লেখিত হয়ে থাকে?

## ৫.৩.২ মধ্যমান

কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বন্টনের মধ্যমান হল এমন একটি প্রাপ্তাঙ্ক যার ওপরে ও নীচে বণ্টনটির অর্ধাংশ পরিসংখ্যা অবস্থান করে অন্যভাবে বলা যায়, মধ্যমান হল কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের শতাংশ বিন্দু$_{৫০}$ এর প্রাপ্তাঙ্ক। অগোষ্ঠীবন্ধ এবং গোষ্ঠীবন্ধ প্রাপ্তাঙ্ক ভেদে মধ্যমান নির্ণয় পদ্ধতি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

অগোষ্ঠী প্রাপ্তাঙ্ক বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রাপ্তাঙ্কগুলিকে উর্ধ্ব বা অধঃক্রমে সাজাতে হয়।

অতঃপর মধ্যমান নির্ণয়ে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হয় ঃ

মধ্যমান $\frac{N + ১}{২}$ তম পদ। এখানে N = প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা

ধরি কোনো শ্রেণীর ৫টি ছাত্রের প্রাপ্তাঙ্ক হয় যথাক্রমে—

২০, ৩৫, ১৫, ৪০, ১০

এখন, প্রথমে একটি ক্রমে প্রাপ্তাঙ্কগুলি সাজানো হল ঃ ১০, ১৫, ২০, ৩৫, ৪০

এখন $\therefore N = 5 \quad \therefore$ মধ্যমান হয় $\frac{৫ + ১}{২} = \frac{৫}{২}$ ৩ তম পদ অর্থাৎ ২০।

এক্ষেত্রে প্রাপ্তাঙ্ক আর একটি বেশি, ধরি ৪৫ থাকলে, N হয় ৬।

সেক্ষেত্রে মধ্যমান হয় $\frac{৬ + ১}{২} = \frac{৭}{২} = ৩\frac{১}{২}$ তম পদ

এক্ষত্রে $৩\frac{১}{২}$ তম পদ হয় $= \frac{২০ + ৩৫}{২} = \frac{৫৫}{২} = ২৭.৫$

$\therefore$ মধ্যমান হয় = ২৭.৫

গোষ্ঠীবন্ধ প্রাপ্তাঙ্কের মধ্যমান নির্ণয় প্রক্রিয়া ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে মধ্যমান নির্ণয় করতে হলে প্রথমে পরিসংখ্যা বন্টন সারণীতে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা প্রদর্শক স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অতঃপর এই সূত্র প্রয়োগ করতে হয় ঃ

$$\text{মধ্যমান} = \underset{\text{শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা}}{\overset{\text{পরিসংখ্যা সমষ্টির অর্ধেক}}{\text{ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা}}} + \frac{\text{অর্ধেক পরিসংখ্যা সমষ্টি} - \text{পর্বিবর্তী শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা}}{\text{অর্ধেক পরিসংখ্যা সম্বলিত শ্রেণীর পরিসংখ্যা}} \times \text{শ্রেণী পরিসর}$$

৫.৩.১ অংশে ভারযুক্ত গড় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সারণী থেকে মধ্যমান নির্ণয় করা যাক। ঐ সারণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার স্তম্ভটি হল নিম্নরূপ ঃ

| ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা |
|---|
| ৩ |
| ৭ |
| ১২ |
| ১৫ |

এক্ষেত্রে পরিসংখ্যা সমষ্টির অর্ধেক হয় ১৫/২ = ৭.৫

এখন, ৭.৫ দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব, ঐ শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা হয় ৯.৫, পূর্বশ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হয় ৭, পরিসংখ্যা হয় ৫ এবং শ্রেণী প্রসার হয় ৫।

$$\text{এখন, মধ্যমান} = ৯.৫ + \frac{৭৫ - ৭}{৫} \times ৫ = ৯.৫ + ০.৫ = ১০$$

প্রক্ষেপ (Interpolation) প্রক্রিয়াতেও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্কের মধ্যমান নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মধ্যমানকে x ধরতে হয়। এখন ∵ N/২ বা, ১৫/২ = ৭.৫ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা স্তম্ভে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে থাকে। অতএব মধ্যমানটিও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকৃত উচ্চসীমা ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃত উচ্চসীমার মধ্যে থাকে, এক্ষেত্রে ∵ ৭.৫ পূর্বশ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা থেকে বড় এবং পরবর্তী শ্রেণীর ক্রমযৌগিক থেকে ছোট হয়, মধ্যমানটিও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকৃত উচ্চসীমা থেকে বড় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃত উচ্চসীমা থেকে ছোট হয়। এখন, এই মর্মে একটি সমীকরণ গঠন করতে হয় ঃ

$$\text{মধ্যমান} = \frac{x - ৯.৫}{১৪.৫ - x} = \frac{৭.৫ - ৭}{১২ - ৭.৫} \text{ বা, } ৪.৫x - ৪২.৭৫ = ৭.২৫ - ০.৫x$$

বা ৫x = ৫০ বা, x = ১০ ∴ মধ্যমান = ১০ হল।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, দুই প্রক্রিয়াতেই মধ্যমান একই হয়ে থাকে। অগোষ্ঠীবদ্ধ কিন্তু ভারযুক্ত বা সংখ্যাযুক্ত প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের মধ্যমান নির্ণয়ও এই প্রক্ষেপ প্রক্রিয়ায় করা যায়। তবে, প্রাপ্তাঙ্কগুলি স্বাভাবিক সংখ্যায় থাকা দরকার (১, ২, ৩, ....)। এছাড়া, শতাংশ ক্রম$_{৫০}$ এর মান নির্ণয় করেও মধ্যমান নির্ণয় করা যায়।

## অনুশীলনী - ৩

১। মধ্যমান কাকে বলে?

২। জোড়াসংখ্যক অগোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্কের মধ্যমান কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

৩। মধ্যমান নির্ণয় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার কী প্রয়োজন?

## ৫.৩.৩ সংখ্যাগুরুমান

কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সংখ্যাগুরু পরিসংখ্যা বা সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা যুক্ত প্রাপ্তাঙ্ককে সংখ্যাগুরু মান বলে। অনেক সময় সংখ্যাগুরু পরিসংখ্যা যুক্ত বর্গও (Category) কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্দেশক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা বলতে এলিফসন ও অন্যান্যদের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা ৫০%'র বেশি পরিসংখ্যা বোঝায় না। অধিকাংশ পরিসংখ্যা হলেই হবে। তবে, পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young) এর মতে স্পষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতা (distinct certral tendency) নির্দেশনা করলে সংখ্যাগুরুমানের কোনো গুরুত্ব থাকে না। সংখ্যাগুরুমান নির্ণয় অগোষ্ঠীবদ্ধ ও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের ক্ষেত্রে চোখে দেখেই সংখ্যাগুরুমান নির্ণয় করা যায়। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা যুক্ত প্রাপ্তাঙ্কটিই সংখ্যাগুরুমান হয়ে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের ক্ষেত্রে সূত্রের দ্বারা এই মান নির্ণয় করতে হয়। এই সূত্র হল ঃ

$$\text{সংখ্যা গুরুমান} = \text{সংখ্যা গুরু পরিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা} + \frac{\text{সংখ্যাগুরু পরিসংখ্যা} - \text{পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা}}{\text{দ্বিগুণ সংখ্যাগুরু পরিসংখ্যা} - \text{পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা} - \text{পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা}} \times \text{শ্রেণীর পরিসর।}$$

এখন, ৫.৩.১ অংশে প্রদত্ত গোষ্ঠীবন্ধ পরিসংখ্যা বণ্টন সারণী থেকে সংখ্যা গুরু মান নির্ণয় করা যাক। ঐ সারণীর পরিসংখ্যা স্তম্ভে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা হয় ৫, এখন, ঐ সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা হয় ৯.৫, ঐ শ্রেণীর পরিসর হয় ৫। ঐ শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা হয় ৪, এবং পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা হয় ৩।

এক্ষণে ঐ গোষ্ঠীবন্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বন্টনের সংখ্যা গুরু মান হয় $= ৯.৫ + \frac{৫ - ৪}{২x\ ৫ - ৪.৩} \times ৫$

= ৯.৫ + ৫/৩ = ৯.৫ + ১৬.৭ = ১১.১৭ আয়ত লেখ বা পরিসংখ্যা বহু ভুজের শিখর বিন্দু সংখ্যাগুরু মান জ্ঞাপক হয়ে থাকে। ঐ বিন্দু বরাবর X-অক্ষের মান সংখ্যাগুরু মান হয়ে থাকে।

---

**অনুশীলনী** - ৪

১। সংখ্যা গুরু মান কাকে বলে?

২। সংখ্যা গুরু বর্গ কী?

৩। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা বলতে কী বোঝায়?

৪। আয়ত লেখ থেকে কীভাবে সংখ্যা গুরুমান পাওয়া যায়?

৫। স্তম্ভচিত্র থেকে কী কোনো কেন্দ্রীয় প্রবণতা পাওয়া যায়?

---

## ৫.৩.৪ যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যা গুরুমানের তুলনা

বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগগত দিক থেকে যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যা গুরুমানের কিছু স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করা যায় ঃ

যৌগিক গড় (Arithmetic Mean)

(ক) প্রাপ্তাঙ্কের স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে;

(খ) এই গড়মান বণ্টনের সব প্রাপ্তাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ হয়।

(গ) এই গড় মান থেকে ওপরের এবং নীচের প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের বিচ্যুতির সমষ্টি ‘০’ হয়;

(ঘ) এই বিচ্যুতির (Deviation) বর্গ সমষ্টি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মান থেকে বিচ্যুতির বর্গ সমষ্টির কম হয়ে থাকে;

(ঙ) এই বিচ্যুতির মানগুলি প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির সংব্যাখ্যানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে;

(চ) একক সংখ্যা গুরুমান সম্পন্ন সমধর্মী কোনো সমগ্রকের একাধিক নমুনার যৌগিক গড়ের গড় সমগ্রকের গড় নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে;

(ছ) উন্নত পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষত সিদ্ধান্তমূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে যৌগিক গড় এক সোপান হয়ে থাকে;

(জ) সমপ্রসারী পরিমাণ বাচক তথ্যাবলীর কেন্দ্রীয় মান নির্ণয়ে এই পদ্ধতি যথাযথ হয়ে থাকে।

(ঝ) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণীর প্রাপ্তাঙ্কের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হয় না।

মধ্যমান (Median)

(ক) প্রতি বৈষম্যমূলক বণ্টনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে;

(খ) মধ্যমান কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের মধ্যবিন্দু হয়ে থাকে যার ওপরে ও নীচে প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের অর্ধাংশ অবস্থান করে;

(গ) ক্রমানুসারী প্রাপ্তাঙ্কের কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে;

(ঘ) উন্নত পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে মধ্যমান বিশেষ ব্যবহার্য হয় না;

(ঙ) সিদ্ধান্তমূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে এটি নির্ভরযোগ্য হয় না;

(চ) মধ্যমান থেকে প্রাপ্তাঙ্কের বিচ্যুতি পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে খুব বেশি প্রযোজ্য হয় না।

(ছ) মধ্যমান প্রান্তীয় মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

সংখ্যা গুরুমান (Mode)

(ক) সংখ্যা গুরু মান প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের তাৎক্ষণিক ও চলনসই কেন্দ্রীয় মান নির্ণয় করে থাকে;

(খ) এর ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই সীমিত;

(গ) সব ধরনের পরিমাপ স্তরের তথ্যাবলীর কেন্দ্রীয় প্রবণতা এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

(ঘ) প্রাপ্তাঙ্কের আকার ও প্রান্তীয় মান দ্বারা সংখ্যা গুরুমান প্রভাবিত হয় না।

**অনুশীলনী - ৫**

১। সঠিক উত্তরটি চয়ন করুন ঃ

(ক) প্রতি বৈষম্যমূলক বন্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপে—(যৌগিক গড় / মধ্যমান) পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে।

(খ) যৌগিক গড় প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের— (মধ্যবিন্দু / প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ) হয়ে থাকে।

(গ) সংখ্যা গুরুমান—(ক্রমানুসারী প্রাপ্তাঙ্কের / সমপ্রসারী প্রাপ্তাঙ্কের / সব ধরনের পরিমাপ স্তরের প্রাপ্তাঙ্কের) কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে ব্যবহার্য হয়ে থাকে।

(ঘ) উন্নত পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে—(যৌগিক গড় / মধ্যমান / সংখ্যা গুরুমান) এক সোপান হয়ে থাকে।

২। প্রাপ্তাঙ্কের চলনসই কেন্দ্রীয় মান কোনটি?

৩। যৌগিক গড় থেকে এর ওপরের ও নীচের প্রাপ্তাঙ্কের সমূহের পার্থক্য সমষ্টির মান কত?

## ৫.৩.৫ কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র

আগের অংশে (৫.৩.৪) কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপের যথার্থ প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই আলোচনা করা হয়েছে। এখন এই অংশে বাকী কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যাক।

(ক) আনুপাতিক স্তরের সুষম প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে যৌগিক গড় নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

(খ) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণী প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে মধ্যমান ও সংখ্যা গুরুমান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

(গ) গবেষণায় শুদ্ধতা বেশি প্রত্যাশিত না হলে এবং বৃহৎ সংখ্যা তথ্যের একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যা গুরুমান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী - ৬**

১। মুক্তপ্রাপ্ত শ্রেণীর প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপে কোন পদ্ধতি যথার্থ হয়ে থাকে?

২। গবেষণায় বেশি শুদ্ধতা প্রত্যাশিত না হলে কোন পদ্ধতি প্রয়োগে কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয়?

৩। প্রাপ্তাঙ্কের আকার এবং প্রান্তীয় মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন পরিমাপ?

## ৫.৪ প্রতিবৈষম্য

প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা বণ্টন যদি সুষম (Symmetrical) হয় অর্থাৎ নিম্নমান সম্পন্ন প্রাপ্তাঙ্ক থেকে পরিসংখ্যা যে ক্রমে বাড়ে উচ্চ মান সম্পন্ন প্রাপ্তাঙ্কের ক্ষেত্রে একই ক্রমে কমলে ঐ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের পরিসংখ্যা বহুভুজ একটি ঘণ্টাকৃতি চিত্র প্রদর্শন করে যার আড়াআড়ি দুই ভাগ একে অপরের সমান হয়ে থাকে। এই চিত্র (চিত্র-ক) স্বাভাবিক বন্টন চিত্র বলে পরিচিত থাকে। স্বাভাবিক বা সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে যৌগিক গড় (X), মধ্যমান (Md) এবং সংখ্যা গুরুমান (Mo) সমান হয়।

**চিত্র-ক**
স্বাভাবিক বণ্টন চিত্র

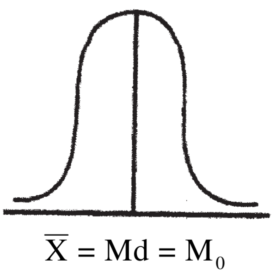


**চিত্র-খ**
ধনাত্মক প্রতিবৈষম্য চিত্র

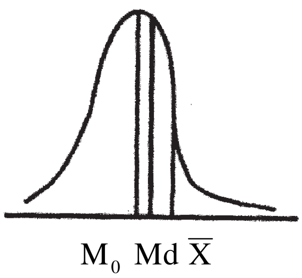


**চিত্র-গ**
ঋণাত্মক প্রতিবৈষম্য চিত্র

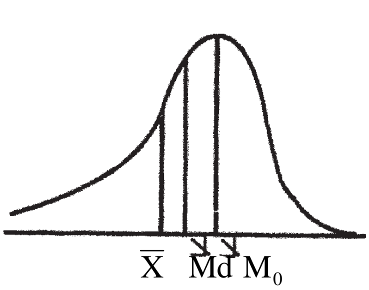


কিন্তু, বস্তুত পক্ষে প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা বণ্টন সুষম হয় না। বরং, প্রতিবৈষম্য মূলক হয়ে থাকে। এর অর্থ হল, উচ্চমান বা নিম্নমানের প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা ক্রমশ কম হয়ে থাকে। উচ্চমানের প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা কম হলে বণ্টনটি ধনাত্মক প্রতি বৈষম্যমূলক (চিত্র নং খ) হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, যৌগিক গড় > মধ্যমান > সংখ্যাগুরু মান হয়ে থাকে। আবার, নিম্নমানের প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা কম হলে বণ্টনটি ঋণাত্মক প্রতিবৈষম্যমূলক (চিত্র-গ) হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, যৌগিক গড় < মধ্যমান < সংখ্যা গুরু মান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সংখ্যা গুরুমান বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্কের ব্যাপ্তি ও প্রান্তীয়মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তবে, প্রতিবৈষম্য মধ্যম রকম হলে যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যা গুরু মানের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্দেশ করা যায়। এটি হল ঃ সংখ্যা গুরুমান = তিন গুণ মধ্যমান – দ্বিগুণ যৌগিক গড় বা, Mo = ৩Md – $2\overline{X}$। এই সম্পর্ক সূত্রে প্রতিবৈষম্য মান নির্ণয়ের একটি সূত্র উল্লেখ করা যায়, সূত্রটি হল ঃ

প্রতিবৈষম্য (sk) = ৩ (যৌগিক গড় – মধ্যমান)/সমক বিচ্যুতি। প্রতিবৈষম্য নির্ণয়ের অপর এক উল্লেখ্য সূত্র হল ঃ

$$\text{প্রতিবৈষম্য} = \frac{\text{যৌগিক গড় – সংখ্যা গুরুমান}}{\text{সমক বিচ্যুতি}}$$

তবে যৌগিক গড় এবং সংখ্যাগুরু মানের পার্থক্য সূত্রেই অনেক সময় প্রতিবৈষম্যের একটি সাধারণ বা চলন সই মান নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পার্থক্যের (যৌগিক গড় – সংখ্যাগুরু মান) গাণিতিক চিহ্ন (+) প্রতিবৈষম্যের দিক নির্দেশ করে, এবং পার্থক্য মান প্রতিবৈষম্য মান নির্দেশ করে থাকে।

**অনুশীলনী - ৭**

১। সুষম পরিসংখ্যা বণ্টন কাকে বলে?

২। প্রতিবৈষম্য মূলক বণ্টন বলতে কী বোঝায়?

৩। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের যৌগিক গড়, সংখ্যা গরু মান ও মধ্যমান যথাক্রমে ৫০, ৪০, ৪৫ হলে বণ্টনটি কী ধরনের প্রতিবৈষম্য প্রদর্শন করে?

৪। স্বাভাবিক বণ্টনের একটি বিশেষ ধর্ম কী?

## ৫.৫ সারাংশ

কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টন গোষ্ঠী বদ্ধকরণের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত ও সংক্ষেপায়িত করা সম্ভব হলেও, তথ্যাবলীর মর্ম জ্ঞাপক কোনো একক সংবাদ বা মান নির্দেশ করা যায় না। ঐ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা অর্থাৎ যে প্রাপ্তাঙ্ককে কেন্দ্র করে বেশির ভাগ প্রাপ্তাঙ্ক অবস্থান করে, পরিমাপ এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের বিন্যাস, পরিমাপ স্তর, গবেষণার শুদ্ধতা প্রভৃতি বিচারে ক্ষেত্র বিশেষে যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যা গুরুমান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যৌগিক গড় পদ্ধতিতে প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের এক প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রাপ্তাঙ্ক / মান নির্ণয় করা হয়; মধ্যমান পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের মধ্যবিন্দুর মান, অর্থাৎ যে মানের ওপরে এবং নীচে প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের অর্ধাংশ অবস্থান করে, নির্ণয় করা হয়ে থাকে, এবং সংখ্যা গুরু পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্তাঙ্কের সংখ্যা গুরু বা সর্বোচ্চ পরিসংখ্যার মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। তবে, প্রাপ্তাঙ্ক সমূহের পরিসংখ্যা বণ্টনের সুষমতা ও প্রতিবৈষম্য বিচারেও কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যা বণ্টনের সুষমতা বলতে উচ্চ ও নিম্নমানের প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যার একই ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্তিকে বোঝায়। বিষমতা বলতে উচ্চ বা নিম্ন প্রাপ্তাঙ্কের অসম হ্রাস বৃদ্ধিকে বোঝায়। পরিসংখ্যা বণ্টনের প্রতিবৈষম্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হয়ে থাকে। বিষমতার পরিমাপ সাধারণত প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের যৌগিক গড় থেকে সংখ্যাগুরু মানের পার্থক্যের পরিমাণ ও গাণিতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সুষম পরিসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে যৌগিক গড় এবং বিষম বণ্টনের ক্ষেত্রে মধ্যমান প্রক্রিয়ার দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

## ৫.৬ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রাপ্তাঙ্কগুলির মধ্যমান নির্ণয় করুন ঃ
২০, ৫০, ৩০, ৪৫, ২৫, ৩৫

২। নিম্নলিখিত শ্রেণীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের যৌগিক গড় নির্ণয় করুন ঃ

| শ্রেণী | পরিসংখ্যা |
|---|---|
| ৭৫ - ৭৯ | ৮ |

| | |
|---|---|
| ৮০ - ৮৪ | ১২ |
| ৮৫ - ৮৯ | ১৫ |
| ৯০ - ৯৪ | ১০ |
| ৯৫ - ৯৯ | ৫ |

৩। ২ নং প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত সারণীতে প্রথম শ্রেণীর নিম্নসীমা ও শেষ শ্রেণীর উচ্চসীমা যদি অনুক্ত থাকে তাহলে ঐ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের যথার্থ পদ্ধতি কোনটি? ঐ যথার্থ পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয় করুন।

৪। নীচের কয়েকটি বিভাগের ছাত্র সংখ্যা দেওয়া হল ঃ

| | |
|---|---|
| ব্যবসা পরিচালনা | ৪০০ |
| শিক্ষা তত্ত্ব | ৫০ |
| মানববিদ্যা | ১৫০ |
| বিজ্ঞান | ২৫০ |
| সামাজিক বিজ্ঞান | ২০০ |

এই ছাত্র সংখ্যা বণ্টনটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের যথার্থ পরিমাপ কোনটি?

বণ্টনটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্দেশ করুন।

৫। ২নং প্রশ্নে প্রদত্ত শ্রেণীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির প্রতিবৈষম্যের সাধারণ বা চলনসই মান নির্দেশ কর, এবং প্রতিবৈষম্যের দিক নির্দেশ কর।

৬। নিম্নলিখিত প্রাপ্তাঙ্কগুলির মধ্যমান নির্ণয় করুন।

১, ৩, ৩, ৫, ৫, ৬, ৭, ৭, ৯, ১০

---

**অনুশীলনী - ৭**

১। সুষম পরিসংখ্যা বণ্টন কাকে বলে?

---

## ৫.৭ উত্তর সংকেত

**অনুশীলনী — ১**

১। কেন্দ্রীয় প্রবণতা হল কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনের একক কেন্দ্রীয় মান যা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনটির প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে থাকে।

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ে সাধারণত যৌগিক গড়, মধ্যমান এবং সংখ্যা গুরুমান পরিমাপ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩। অনুশীলনী — ২

১। সরল যৌগিক বলতে কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্কগুলির সমষ্টিকে প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা দ্বারা ভাগ ক্রিয়ার ফলকে বোঝায়।

২। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের প্রাপ্তাঙ্কগুলি ভার যুক্ত থাকলে ঐ ভার যুক্ত প্রাপ্তাঙ্কের প্রাপ্তাঙ্ক ও ভারের (পরিসংখ্যা) গুণফলের সমষ্টিকে প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা (N) দ্বারা ভাগক্রিয়ার ফল হয় ভার যুক্ত গড়।

৩। d' হল কোনো শ্রেণীর মধ্যমান থেকে কল্পিত গড়ের পার্থক্যকে শ্রেণী পরিসর দিয়ে ভাগ ক্রিয়ার ফল।

অনুশীলনী — ৩

১। মধ্যমান হল কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের এমন একটি মান যার ওপরে এবং নীচে বণ্টনটির অর্ধাংশ পরিসংখ্যা অবস্থান করে থাকে।

২। জোড় সংখ্যা অগোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্কের মধ্যমান হল মধ্যবর্তী দুটি প্রাপ্তাঙ্কের গড়।

৩। গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের মধ্যমান নির্ণয়ে যে শ্রেণীতে মধ্যমান থাকে তা নির্ণয় করার জন্য, এবং ঐ শ্রেণীর আগের এবং পরের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা মধ্যমান নির্ণয়ের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত থাকার জন্য ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে।

অনুশীলনী — ৪

১। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তাঙ্ক হল সংখ্যাগুরু মান।

২। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা বলতে সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণীর বা প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যার তুলনামূলক বিচারে সবচাইতে বেশি পরিসংখ্যাকে বোঝায়।

৩। আয়ত লেখ'র সর্বোচ্চ স্তম্ভের মধ্য বিন্দু বরবার X-অক্ষস্থ অবস্থানগত মান সংখ্যাগুরু মান হয়ে থাকে।

৪। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ স্তম্ভ সংশ্লিষ্ট বর্গটি অন্যান্য বর্গের মধ্যে কেন্দ্রীয় বর্গ হয়ে থাকে।

অনুশীলনী — ৫

১।

(ক) মধ্যমান, (ক) প্রতিনিধিত্ব, (গ) সব ধরনের পরিমাপ স্তরের প্রাপ্তাঙ্কের, (ঘ) যৌগিক গড়।

২। সংখ্যাগুরু মান

৩। ০

**অনুশীলনী — ৬**

১। মধ্যমান ও সংখ্যাগুরু মান

২। সংখ্যাগুরু মান

৩। সংখ্যাগুরু মান

**অনুশীলনী — ৭**

১। সুষম পরিসংখ্যা বণ্টন বলতে বোঝায় কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের নিম্নমান সম্পন্ন প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা যে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় উচ্চমান সম্পন্ন প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা ঐ একই ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

২। প্রতিবৈষম্য মূলক বণ্টন বলতে বোঝায় পরিসংখ্যা বণ্টনে নিম্নমান বা উচ্চমান সম্পন্ন প্রাপ্তাঙ্কের পরিসংখ্যা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া।

৩। ধনাত্মক প্রতিবৈষম্য ($\because \bar{x} > Md > M_0$)

৪। স্বাভাবিক বণ্টনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য/ধর্ম হল এর যৌগিক গড়, মধ্যমান এবং সংখ্যাগুরু মান সমান হয়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। এক্ষেত্রে প্রথমে প্রাপ্তাঙ্কগুলিকে একটি ক্রমে সাজাতে হয়। এদিক থেকে প্রাপ্তাঙ্কগুলি হল ঃ ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪৫, ৫০ এক্ষেত্রে প্রাপ্তাঙ্ক সংখ্যা হয় ৬ (জোড় সংখ্যা)।

$\therefore$ মধ্যমান হয় $\frac{৬ + ১}{২}$ = ৩.৫ তম সংখ্যা। অতএব মধ্যমান হয় $\frac{৩০ + ৩৫}{২} = \frac{৬৫}{২}$ = ৩২.৫

২। এক্ষেত্রে প্রথমে শ্রেণীগুলির মধ্যমান নির্ণয় করা দরকার।

| মধ্যমান (x) | f | fx |
|---|---|---|
| ৭৭ | ৮ | ৭৭ × ৮ = ৬১৬ |
| ৮২ | ১২ | ৮২ × ১২ = ৯৮৪ |
| ৮৭ | ১৫ | ৮৭ × ১৫ = ১৩০৫ |
| ৯২ | ১০ | ৯২ × ১০ = ৯২০ |
| ৯৭ | ৫ | ৯৭ × ৫ = ৪৮৫ |
| | N = ৫০ | Σfx = ৪৩১০ |

এখন, $\bar{x} = \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{৪৩১\not{০}}{৫\not{০}}$ = ৮৬.২

$\therefore$ যৌগিক গড় = ৮৬.২

৩। মধ্যমান [৫০ জনের মধ্যে ১৫ জনের প্রাপ্তাঙ্ক স্পষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্দেশক হয় না তাই, সংখ্যাগুরু মানের চাইতে মধ্যমান পরিমাপ যথার্থ হয়] মধ্যমান নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ঐ শ্রেণীগুলির ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

| শ্রেণী | পরিসংখ্যা | ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা |
|---|---|---|
| ৭৯ এর নীচে | ৮ | ৮ |
| ৮০ - ৮৪ | ১২ | ২০ |
| ৮৫ - ৮৯ | ১৫ | ৩৫ |
| ৯০ - ৯৪ | ১০ | ৪৫ |
| ৯৫ এর তদূর্ধ্ব | ৫ | ৫০ |
| | N = ৫০ | |

এখানে N/২ বা ৫০/২ = ২৫, এই ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ২৫ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে থাকে, তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা হয় ৮৪.৫।

$$\text{অতএব, মধ্যমান হয়} = ৮৪.৫ + \frac{২৫ - ২০}{১৫} \times ৫ = ৮৪.৫ + \frac{৫}{১৫} \times ৫ = ৮৪.৫ + ১.৬৭ = ৮৬.১৭$$

৪। এখানে নামিক পরিমাপের বিভিন্ন বর্গের সংখ্যামান থাকায় সংখ্যা গুরুমান নির্ণয় প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুরু বর্গ নির্ণয় যথার্থ হয়ে থাকে। এখানে ব্যবসায় পরিচালনা বিষয়ে সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র থাকায় ঐ বর্গটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় বর্গ হয়ে থাকে।

৫। কোনো প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সাধারণ প্রতিবৈষম্য ঐবণ্টনের যৌগিক গড়ের থেকে সংখ্যাগুরু মানের পার্থক্য সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ২নং প্রশ্নের উত্তর ঐ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের গড় পাওয়া যায় ৮৬.২। এখন, ঐ প্রাপ্তাঙ্ক বণ্টনের সংখ্যাগুরু মান নির্ণেয় হয়।

এই বণ্টনের সর্বাধিক পরিসংখ্যা হয় ১৫। এই সংখ্যা গুরু পরিসংখ্যা যে শ্রেণীতে থাকে তার প্রকৃত নিম্নসীমা হয় ৮৪.৫। অতএব সংখ্যাগুরু মান হয় ঃ

$$৮৪.৫ + \frac{১৫ - ১২}{২ \times ১৫ - ১২ - ১০} \times ৫ = ৮৪.৫ + \frac{১৫}{৮} = ৮৪.৫ + ১.৮৮ = ৮৬.৩৮$$

অতএব, প্রতিবৈষম্য হয় = ৮৬.২০ – ৮৬.৩৮ = –.১৮

এক্ষেত্রে গাণিতিক চিহ্ন (–) থাকায় ঋণাত্মক প্রতিবৈষম্য লক্ষিত হয়ে থাকে।

৬। এক্ষেত্রে একই প্রাপ্তাঙ্ক একাধিকবার থাকায় বণ্টনটিকে ভার যুক্ত স্বাভাবিক সংখ্যা বণ্টনে রূপান্তরিত করতে হয়। এক্ষেত্রে এই রূপান্তরটি হল নিম্নরূপ ঃ

| প্রাপ্তাঙ্ক | পরিসংখ্যা | ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | ১ | ১ |
| ২ | ০ | ১ |
| ৩ | ২ | ৩ |
| ৪ | ০ | ৩ |
| ৫ | ২ | ৫ |
| ৬ | ১ | ৬ |
| ৭ | ২ | ৮ |
| ৮ | ০ | ৮ |
| ৯ | ১ | ৯ |
| ১০ | ১ | ১০ |
| | N = ১০ | |

এখানে N/২ বা ১০/২ = ৫, এই ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ৫ পঞ্চম সারিতে থাকে। এই শ্রেণীর প্রকৃত নিম্নসীমা হয় ৪.৫।

$$\text{অতএব মধ্যমান হয়} = ৪.৫ + \frac{৫ - ৩}{২} \times ১$$

$$= ৪.৫ + \frac{২}{২} = ৪.৫ + ১ = ৫.৫$$

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রক্ষেপ পদ্ধতিতেও মধ্য মানটি নির্ণয় করা যায়।

প্রক্ষেপ পদ্ধতিতে মধ্যমানটি নির্ণয় প্রক্রিয়া ঃ

$$\therefore\ Md = \frac{x - ৪.৫}{৫.৫ - x} = \frac{৫ - ৩}{৫ - ৫} \text{ বা } \frac{x - ৪.৫}{৫.৫ - x} = \frac{২}{০} \text{ বা } ১১ - ২x = ০$$

বা, ২x = ১১ বা, x = ১১/২ = ৫.৫

## ৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। এলিফসন কার্ক, রুনিয়ন ডব্ল্যু, রিচার্ড পি. এন্ড হাড্রে হেবার ঃ ফান্ডামেন্টালস অফ সোশ্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স (দ্বিতীয় সংস্করণ), ম্যাকগ্রহিল পাবলিশিং কোম্পানি, সিঙ্গাপুর, ১৯৯০।

২। মুয়েলার, জন, এইচ, সুএজলার কার্ল, এফ ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসনিং ইন সোশিওলোজি, অক্সফোর্ড এন্ড আই. বি. এইচ. পাবলিশিং কো. (ভারতীয় সংস্করণ) ১৯৬৯।

৩। ইয়ং পি. ভিঃ, সায়েন্টিফিক সোশ্যাল সার্ভে এন্ড রিসার্চ (চতুর্থ সংস্কারণ) প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।